পথহারা

অনুরূপা দেবী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

মেজর অশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ, সি, এস

অশোক !

আজ তুমি আর সেই 'ছোট্ট অশি' নেই, সব দিকেই অনেক বড় হয়ে গেছ, কিন্তু মায়ের বুকের পটে তোমার সেই ছোট্ট মুখটি এখনও তেমনি অম্লান হয়ে জেগে রয়েছে !

পথ হারাবার অনেক ঋজু-কুটিল পথ তোমার সামনে এসেছিল, কিন্তু তুমি দৃঢ়পদে সে সমস্তই অতিক্রম করে যশের মাল্য ধারণ করে তোমার মাকে ধন্যা করেছ, এর চেয়ে গৌরব মায়ের পক্ষে আর কিছুই নেই !

মা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬২

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞপ্তি

'পথহারা' যেদিন ভারতবর্ষে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া (১৩২৯ সালে) পুস্তকাকারে ছাপা হয়, সেদিনের সেই সঙ্কটময় যুগে লেখকেরা বিপ্লবকে লইয়া উপন্যাস রচনায় সাহসী হইতেন না। এই বইটি প্রকাশিত হইবার পর পুলিশ বিভাগের পরিচিত বা অপরিচিত হিতৈষীগণ আমায় পত্র দিয়া ও লোকমুখে সাবধান করিতে চাহিয়াছিলেন এবং বইটির প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া গেলেও দ্বিতীয় মুদ্রণে প্রকাশকও ভরসা করেন নাই। সেজন্য বহু-দিন যাবৎ ইহা অপ্রকাশিত ছিল। ইতিমধ্যে যদিও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু প্রেস ও কাগজের দুর্ম্মূল্যতার ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ও বহু পুস্তক এক সঙ্গেই ছাপার প্রয়োজন হইয়া পড়ায় তদ্ভিন্ন একখানিও কপি হাতে না থাকায় বইটি ছাপিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিয়া গেল। আজ স্বাধীন দেশে সাহিত্যে রাজনীতি-চর্চ্চা নিতান্তই সহজ হইয়াছে এবং এ জিনিষের মূল্যও সেজন্য নামিয়া গিয়াছে, তথাপি মনে হয় সদ্য অতীত ঘটনা-প্রবাহের স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা আজ বা কোন দিনই ফুরাইবে না : পাঠান-মোগলযুগ অবসান হইয়া গেলেও উপন্যাস-সাহিত্যে সে যুগের কথা সেদিন পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইয়াছে, আজও হইবে না, মনে হয় না।

নিবেদিকা—
লেখিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিমলেন্দুব মা তাকে পৃথিবীতে আনিযা দিয়া সেই যে শয্যা লইযাছিল, চিতাশয্যায় শুইয়া তাহা ত্যাগ কবিল। তবে সেই অল্প দিনেই নবপ্রসূতের জন্য যেটুকু কবা যায, সে বিষযে ত্রুটি করে নাই। প্রথমতঃ, খোকার সূতিকা-পূজায বিশেষ ঘটা করাইযা ছেলেব নামকবণ কবিল বিমলেন্দু। দ্বিতীযতঃ, নিজেব বাঁচিযা থাকা বিষযে সন্দিহান হইযা স্বামীকে অনুরোধ করিয়া খোকার নামে সম্পত্তিব অর্দ্ধাংশ লেখাপড়া করাইল। অবশ্য এর সবই যে তারই বুদ্ধিমত্তায ঘটিযাছিল তা নয, ঐ মৃত্যুপথাপন্নার মাতৃদেবী শ্রীমতী মঙ্গলা ঠাকুরাণী মেয়ের সেবা ও অপোগণ্ডব পালনভাব লইতে জামাতৃ-গৃহে বাস করিতেছেন, মেযের কাছে বসিযা ক্রন্দমান কণ্ঠে কহিলেন,—"হ্যাঁ দ্যাখ, মা সুষি! তুই তো বাছা আমাব গলায ঝুলিযে গেঁথে দিযে জন্মেব মতন চল্লি,—তা' জীবনটা থাকতে থাকতে ছেলের আখেবটা একটু দেখে যাস্ বাছা!—এর পর জামাই যদি বিযে করে, আব তাব সাতগণ্ডা ছেলেমেযে জন্মায়, তখন তোর ঐ গুঁড়ো রত্তি কোথায ভেসে যাবে বল্ দেখিন্? মা-খেকো ছেলে নিয়ে আমিই যাবো কার দোরে,—টোকলা সাধতে?"

একোনবিংশতিবর্ষীয়া সুহাসিনীর জ্বরতপ্ত দুই চোখে জলের উৎস উথলাইয়া উঠিল। সাধের স্বামী-সংসার,—ছেলেটিকে সে যে সবেমাত্র পাইয়াছে, বিদায়ের সুর এরই মধ্যে বাজিয়া উঠিল?

একদিন শয্যা-পার্শ্বে সেবাপরায়ণ স্বামীকে বলিল, "হ্যাঁ গা, আমি মরে গেলে তুমি কি আবার বিয়ে করবে? বল না গা?"

সুহাসিনীর স্বামীর নাম পূর্ণেন্দুপ্রকাশ। পূর্ণেন্দু স্ত্রীকে হাতপাখায় বাতাস করিতেছিলেন, ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ভেবে দেখি নি ত?"

সুহাসিনী সাগ্রহে কহিল, "তবু বলো না? ওগো, আমি মরে গেলে কি তুমি বিয়ে না করে থাকবে? আমার কথা কি তোমার মনে পড়বে আর?"

পূর্ণেন্দু পুনশ্চ সেইপ্রকার ব্যঙ্গমিশ্র অপছন্দর ভাবেই কহিলেন, "তুমিই বা মরতে যাবে কেন? আমিই বা বিয়ে করতে যাব কেন?"

একটা কাতর অপরিতৃপ্তির সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে ক্লিষ্ট বুকখানাকে শূন্য করিয়া দিয়া কান্নাভরা করুণ কণ্ঠে সুহাসিনী কহিল, "আমি কি আর বাঁচবো?"

পূর্ণেন্দু পাখা রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া একটু কঠিন কণ্ঠে বলিলেন, "ওসব কথা বল্লে আমি চলে যাব।"

হাতের পিঠে চোখ মুছিতে মুছিতে রুগ্না ব্যগ্র হইয়া কহিল, "না—না, আর বলবো না।"

স্বামীকে ছাড়িতে হইবে মনে করিয়া সে যেন অধিকতর করিয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিতেছিল।

তার পর একদিন কি ভাবে সে প্রস্তাবটা করিয়াছিল, এবং উচিত ভাবিয়াই হয় ত পূর্ণেন্দুও মরণাপন্নার শেষ অনুরোধ পালন করিয়াছিলেন। অতএব একদিকে মা হারাইয়াও বিমলেন্দু আর একদিক দিয়া মায়ের দানে বাপের বিষয়ের আধা-আধি বখরাদার হইয়া উঠিল।

বিমলেন্দুর দিদিমা কন্যাশোকাহত অন্তরে একমাত্র মেয়ের ওই-র কনিষ্ঠ শিশুকে পালন করিবার অজুহাতে গোসাইবাড়ী রহিয়া গেলেন এবং তিনি বিশেষভাবেই নিজস্ব করিয়া রাখিলেন। পত্নীহারা নিবাড় স্ত্রীর শেষ চিহ্ন ছেলেটিকে শোকাহত অন্তরের স্নিগ্ধ প্রলেপরূপে লাগ

পাইলেন না। ছেলেটিকে সুহাসিনী তাঁর জন্য আনিয়া, দিয়া গেল নিজের মাকে।

তা' বিমলেন্দুর মা হারাইয়া আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতি বড জানা গেল না। বিষণ ত পাইলই--তার উপর মায়ের হাতের শাসন দমনের বালাই না রাখিয়া পরিবর্ত্তে দিদিমার বেপরোয়া আদর উপভোগ সহজ প্রাপ্তি ত নয়। দিদিমার রাখা 'দুখে' নামটা দিদিমা আঁকড়াইয়া থাকিলেও মায়ের দেওয়া বিমলেন্দুই প্রচার রহিল।—দিদিমা তাকে তার বাপের বশ হইতে দিলেন না। বলিলেন—"দুখেকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারি নে।" তবে নিন্দুকে না কি বলে, এর মধ্যে মস্ত একটা রাজনৈতিক চাল আছে। সেটা দুখে তার দিদিমা ছাড়া অপর কারও বশে আসিলে, দিদিমার অখণ্ড প্রতাপের যদি এতটুকু খর্ব্বতা ঘটে সেই ভয়,—তা' হইবেও বা!—মোটের উপর ছেলেটি একটি আলোকলতার মত নিজের সব কিছুকে বাদ দিয়া আর একটি গাছের গায়ে উহারই রস টানিয়া বাড়িতে লাগিল, ফলে সে কাহারও হইল না।

সুহাসিনীর মৃত্যুর ঠিক বৎসর দুই পরে পূর্ণেন্দু দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া আনিলেন রাবিৎপুরের রামদয়াল সেনের কন্যা শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবীকে। ইন্দ্রাণীর বয়স পূর্ণ পঞ্চদশ, রূপ তাঁর অনন্যসাধারণ, শিক্ষিতা বলিয়া ও-অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি আছে। রামদয়াল যে ধনরত্ন-সমন্বিতা এমন মেয়েকে চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধে দোজ-বরের হাতে দিলেন, তার মধ্যে করুণার সংস্পর্শ ছিল। রামদয়াল একজন বিখ্যাত কবিরাজ, চিকিৎসা-ব্যপদেশে আসিয়া এই বরের সন্ধান পান, বর দেখিতে আসিয়া যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারিলেন বরটি সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও 'একো হি দোষো গুণরাশি নাশি'—হইয়াছে,—তার বিপত্নীকত্ব, মন অমনি সেই সুরূপ যুবার বিরুদ্ধে পিছন ফিরিতে গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি ফুটফুটে হাস্য-মুখ হাসির কিরণে মাখামাখি হইয়া তাঁহার চোখে পড়িল। শিশুটি

ফণাধরা কৃষ্ণ-সর্পের মত চুলগুলি নাড়া দিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া কলকণ্ঠ পাপিয়ার অনুকরণে ডাকিয়া উঠিল,—"দাদা!"

হয় ত সে প্রতিবেশী কোন ঠাকুরদাদার সাদৃশ্য দেখিয়া বা কোন কিছু কারণে না হইলেও অকারণেই ওই নামে ডাকিয়াছিল; কিন্তু ভগবৎলীলায় একান্ত আস্থাসম্পন্ন ভক্ত দয়াল ইহারই মধ্যে যেন ঐশী প্রেরণা দর্শন করিলেন, তাঁর সঙ্কল্প টলিয়া গেল। মনকে এই বলিয়া বুঝাইলেন, তাঁর যদি এমন ইচ্ছা না থাকিবে ত এই সব যোগাযোগ করিয়া দিল কে? এ আমায় 'দাদা' বলিয়া চিনিল কেমন করিয়া? তা হোক! এই দুধের শিশু হয় ত কোন্ পাষাণী বিমাতার হাতে পড়িয়া দুঃখ পাইবে, আমার ইন্দু-মাকে যদি এত বড় মহাব্রত হইতে বঞ্চিত করি, তবে এর চেয়ে কোন্ বড় কাজে সে লাগিবে?

মানুষ যখনই নিজেকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্থির করিয়াছে তখনি সে ঠকিয়াছে, বিজ্ঞ রামদয়ালেরও হিসাবে ভুল ঘটিয়াছিল,—তাই তিনি কুহেলিকাময় অনাগতকে নিজের আয়ত্তে আনিতে গিয়া বিষম ভাবেই প্রতারিত হইলেন। কেমন করিয়া,—সে কথা পরে বলিব।

পূর্ণেন্দুপ্রকাশ উচ্চশিক্ষিত হইয়াও চাকরীর ফাঁদে পা দেন নাই। পৈতৃক সম্পত্তি তাঁর নেহাৎ মন্দ ছিল না। কলিকাতা চৌরঙ্গী অঞ্চলে একখানা মোটা ভাড়ার বাড়ীর আয় হাতে রাখিয়া নগদ টাকাটা দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করাইবার জন্য তিনি যন্ত্রপাতি আনাইয়া সুন্দরবন অঞ্চলে সুবিধা করিয়া দু'হাজার বিঘা জমি ইজারা লইয়াছিলেন। সাথী ছিল ঐ বিষয়ের ওস্তাদ আমেরিকাফেরত একটি বন্ধু। তা' বাঙ্গালী ঘরে যার রূপ-যৌবন-ধন-উৎসাহ আছে তেমন ছেলে ও যদি বৌ মরার পর দুটি বৎসর দ্বিতীয়া-বধূ ঘরে না আনে, সেটা কি কম অশোভন? পূর্ণেন্দুরও যে দ্বিতীয় বিবাহে বিশেষ আপত্তি ছিল তা'ও না, অল্পজীবী স্ত্রীটির জীবনের সামান্য কয়টা বৎসরে তার কাছে এমন কিছু সে পায় নাই, যাহাকে সম্বল করিয়া সে মৃতার

স্মরণে বাকি জীবনটাকে উৎসর্গ করিবে। পূর্ণেন্দুর সে স্ত্রী প্রথমাবধিই রুগ্না ছিল। এই রুগ্ন-শরীরের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিয়া তাদের বিলম্বিত মরণকে সম্ভব করিয়া দেওয়াটা পূর্ণেন্দুর দুই-চক্ষের বিষ হইলেও এক্ষেত্রে তার কোন হাত ছিল না। সুহাসিনীর মা জগন্নাথের পথে পূর্ণর মায়ের পায়ে ধরিয়া সত্য করিয়া লইয়া চিরদুর্ব্বল কন্যা-রত্নটিকে এই সুস্থ সবল যুবকটির গলায় গাঁথিয়া দেওয়াইয়া ছিলেন। ভাল মানুষ পূর্ণর মা মেয়ে চোখে না দেখিয়াই মঙ্গলা দেবীর কথার ছটায় অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "নিজের বলে বলিনি, দেখবে বাংলা বেহারে অমন মেয়ে তুমি পাবে না এই বলে দিচ্ছি।"

যেহেতু যেন তেন প্রকারেণ মেয়ে পার করাই মা-বাপেদের প্রধানতম কর্ত্তব্য এবং সমাজের কর্ত্তব্য ঐখানেই চোখ পাকাইয়া থাকা। তার পর সেই রুগ্না মেয়েটির যদি অবসর ঘটে তো দুটি একটি ক্ষয়-রোগীর জন্মদানপূর্ব্বক নিজের নারীজন্মকে সার্থক করিয়া লইয়া দীর্ঘ রোগ-ভোগান্তে মহাপ্রস্থানে—স্বামী বেচারীর স্ত্রী-ভ্রষ্ট সংসারের দশা যতই মন্দ হোক, অল্পজীবিনীর গর্ভজাত বলহীন অল্পায়ুহীন সন্তানদের দ্বারা জাতীয় ধ্বংস যতই দ্রুততর হউক—উহাতে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন কি? গাছের যখন বীজ পোঁতা হয়,—কাণা, কুঁজো, অপূর্ণ-গুলাকে বাছাই করা নিয়ম আছে কিন্তু মানুষের বেলায় নাই।

আশৈশবের স্বাস্থ্যহীনতা প্রযুক্ত ভরা-যৌবনেও কোন দিন সুহাসিনীর অস্থিসার শীর্ণ দেহে যৌবন-লাবণ্য বিকশিত মাত্র হইতে পারে নাই। যদিও সে দেখিতে তেমন কিছু সুন্দরী ছিল না, তথাপি রোগের বাসা না হইয়া যদি সে সুস্থ শরীর পাইত তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইবার আবশ্যক আছে এমনও বলা যায় না,—কিন্তু আসল রূপ যা, সেটারই ছিল সবচেয়ে তার অভাব। কাজেই তাকে গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের একগাছি রৌদ্রদগ্ধ শীর্ণ লতার মতই করুণ ও ম্লান দেখাইত। তার উপরে বরং মমতা করিবার মত কিছু থাকা সম্ভব; হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ আবেগ-মধুভরা প্রণয়-নিবেদনে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দিয়া

মুখ পানে চাহিয়া থাকিবার মত কিছু ছিল না।

সুহাসিনী স্বামীকে দিবার মত একটি জিনিষ দিয়াছিল, সেটি ঐ চাঁদপানা ছেলে বিমল। কিন্তু সেটিকেও সে তাকে এমন বঞ্চনা করিয়া দিয়া গেল যে, তার সবটুকু মধু লুটিয়া লইলেন উহারই মা মঙ্গলাদেবী। সেখানেও সে বঞ্চিত। তবে আর অপগতার সকরুণ স্মৃতিটুকু কিসের জোরে মনের মধ্যে চিরদিনের পূজার বস্তু হইয়া থাকে?

দুই বৎসরকাল ভাইএর গৃহ শূন্য থাকার সংবাদে পূর্ণেন্দুর জাঠতুত বোন সারদাদিদি পুরুষের এ কলঙ্ক মোচনার্থে বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়া সহস্র বাধা ঠেলিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিলেন, কিন্তু বিবাহ হইয়া গেলে দেখা গেল, বিবাহ দেওয়াটা বরং সোজা, কিন্তু ইহার তাল সামলানোই দায়!

বর বধূ বাড়ী আসিয়া পৌছিলে—শাঁখ হয় ত বাজিয়া থাকিবে; কিন্তু সে ক্ষীণ শঙ্খধ্বনি ডুবাইয়া যে প্রবল পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল, তাহাতে নববধূর হৃদ্‌পিণ্ড তো স্তম্ভিত হইয়া গেলই; এমন কি, প্রতিবেশিবর্গের বৌ দেখার সাধে ইতি করাইয়া অনেককেই ঘরে ফিরাইয়া লইয়া গেল। মঙ্গলা ঠাকুরাণী সময়োচিত ভাষায় তাঁর মৃতা-কন্যার উদ্দেশ্যে ডাকাডাকি বাধাইয়া বোধ করি তাহার সতীন দেখিতেই তাহাকে আমন্ত্রণ করিতেছিলেন!

কোনমতে নববধূটিকে গৃহজাত করিয়া ফেলিয়া দিদি সারদা বরকনেকে কড়ি খেলাইতেছিলেন। বর অবশ্য এ কার্য্যে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিয়াও শেষটায় সম্মত হন, এমন সময় উচ্চ রোদনে ইতি করিয়া, বিমলেন্দুর দিদিমা বিমলেন্দুকে কোলে করিয়া আনিয়া ধপ করিয়া উহাকে বাপের কোলে বসাইয়া দিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওগো, অমন করে পাষাণ হয়ো না গো; ওগো একবার এই দুধের বাছার মুখটি পানে চেয়ে দেখ গো, দেখ!" ইত্যাদি।

পূর্ণেন্দু সেই চেলী-চন্দন-পরা বেশে, আদুড় গায়ে, ছেলেকে বুকে চাপিয়া

ধবিযা দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে চলিযা গেলেন ; পুরাতন স্মৃতিব দংশনে একেই তাঁহাব চিত্ত পীড়িত হইতেছিল।

দিদি পিছন হইতে ডাকিলেন, "ও পুণ্যু ! পুণ্যু ! ওবে, কড়ি খেলাটি যে কবতে হয বে,—ওবে যাস্ নি, আয।"

বিমলেন্দুব দিদিমা দাঁতে-দাঁতে ঠক্ ঠক্ কবিযা হুঙ্কাব শব্দে জামাইয়েব হইযা জবাব দিলেন, "ওগো, খেলা-ধূলো তুলে বেখে দাও গো ! পুণ্যু তো'আর কচি খোকাটি ন'ন—ছেলে কোলে নিযে খেলা কববেন আব কোন্ মুখে ?"

সাবদা নিরুত্তবে মুখ ফিরাইযা ইহাব জবাবটাকে নিজের মধ্যেই হজম কবিয়া লইলেন।

নববধূ ইন্দ্রাণী এক সমযে বিমলেন্দুকে কাছে দেখিযা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে কোলে তুলিযা লইল। বাপ শিখাইযা অবশ্য দিযাছিলেনই তদ্ভিন্ন অন্তবেব স্বাভাবিক প্রেবণাতেই সে ছোট ছেলেব সঙ্গলিপ্সু। ছেলেটিকে একান্ত নিজেব বুঝিয়াই আদবে-স্নেহে ভবিযা চুমা খাইযাছে, এমন সমযে কেমন করিয়া দেখিতে পাইযা বিমলেব দিদিমা হাঁ—হাঁ কবিযা ছুটিযা আসিয়া চিলেব মত ছোঁ মাবিযা বিমাতাব কোল হইতে ছেলে ছিনাইযা লইযা হাহাকারে ঘর-দ্বার যেন ফাটাইযা দিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"ওরে আমাব সতীরাণী সুখিব ধন আজ তোকে কে এসে ছোঁয় বে ! ওরে, এ দুটো পোড়া চোখ থাকতে এ আমি দেখতে পারবো না বে, পারবো না।"

প্রতিবেশিনীদেব মধ্যে একজন ভবসা কবিযা বলিয়াছিল, "তা বেয়ান, যখন ভগবান ওকে তোমারই কাছে এনে দিলেন তা' ওকেই তোমাব নিজে মেযেব মতন করেই কেন নাও না ! যা গেছে, সে তো আব ফিরবে না।"

মঙ্গলা দেবী কটু করিযা জবাব দিলেন,—"ওগো, আমাব মতন দশা যেন সব্বাইকার হয় গো, সব্বার যেন হয। এম্নি কবে যেন নিজের সন্তান হারিয়ে

পর-ভোলানীরে যদি পরকে নিয়ে আপন করে,-- তবেই না সুখের সুখে বলা বার হয়ে যায়।"

ভয়ে আর কেহ নূতন বধূর স্বপক্ষে কথাই বলিতে অগ্রসর হইল না। বউটি এই অদ্ভুত নূতন পরিবেশে পড়িয়া অবাক্ হইয়া গেল।

বিমলেন্দুর দিদিমার যথেষ্ট সাবধানতাপূর্ণ সতর্কতা সত্ত্বেও নতুন বৌয়ের বাঙ্গা সাড়ী, আল্তা, পায়ের উপর পাইজোরের ঘুঙুর বাজনা, সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রালঙ্কারের ঝিলিক্—শিশু বিমলকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিতেছিল, সে সুযোগ পাইবা-মাত্র বাঁকা-বাঁকা পা ফেলিয়া টলিয়া টলিয়া আসিয়া ইন্দ্রাণীর জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্রাণীও পূর্ব্বদৃশ্য বিস্মৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ যেন কি নিধি পাইয়াছে এমনি করিয়াই ছেলেটিকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তাহার কানের কাছে নত হইয়া ডাকিল, "খোকা! বিমু!"

বিমল বলিল, "উঁ!" এবং উহার নত মুখের সুবিধায় কর্ণলম্বিত মুক্তার গোছাটা ধরিয়া টান দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমা দাও।"

ইন্দ্রাণী শিশুর এইটুকু দাবীতেই যেন মাতৃত্বের পরম গৌরবে ভরা চরম অধিকার গ্রহণ করিতে পারিয়াছে—এই রকমই পুলকিত পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিয়া শিশুর হস্ত হইতে কর্ণভূষাটা ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া অপর হস্তে গলার হারটা খুলিয়া তাহার গলায় পরাইতে পরাইতে বলিতে লাগিল, "ও যে ছিঁড়ে যাবে ধন! এই হারটা তোমায় পরিয়ে দিই, এসো তো, আমার সোনা বিমুর গলায় কমন সুন্দর দেখাচ্চে—বাঃ বাঃ!"

বিমল কিন্তু ছেলে অত বোকা নয়। সে চুনি মুক্তার বৈচিত্র্য ফেলিয়া নিরেট সোনা পছন্দ করিতে পারিল না। প্রবল বেগে মাথা নাড়া দিয়া হার পরিতে একান্ত অসম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক মুক্তার গোছায় একটা হেঁচকা টান মারিল এবং নিজের স্বভাবজাত এবং সর্ব্বদা প্রশ্রয়-প্রাপ্ত জিদের বশে চেঁচাইয়া উঠিল, "না আমা ঐতে দাও,—এটা বিচ্ছি,—এ নোব না।"

আচমকা কর্ণে আকর্ষিত হওয়ায় অত্যন্ত বেদনা পাইয়া ইন্দ্রাণী নিজেরই অজ্ঞাতসারে ছেলেকে কোন্ সময় তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামাইয়া দিয়া—"বাবা রে!" বলিয়া বসিয়া পড়িল। বিমলের প্রবল আকর্ষণে কাণের ছেঁদাটা একটু চিরিয়া গিয়া কর্ণফুলের ডাঁটিটা বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কতক মুক্তা ছিঁড়িয়া ছড়াছড়ি হইয়া গিয়াছে, আর, ফুলসমেত বাকি কয়েক নর উহারই হাতের শক্ত মুঠির মধ্যে। কিন্তু বিজয়ী হইলেও ইন্দ্রাণীর ব্যবহারকে অনাদর সন্দেহ করিয়া বিমলের অনাদৃত অভিমান শতধারায় উথলিয়া উঠিল, সে প্রথমে ঠোঁট ফুলাইয়া ফুলাইয়া শেষটায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

দিদিমা আসিয়া যখন গলার চোটে আরও পাঁচজনকে জড়ো করিলেন, তখন ইন্দ্রাণী নিজের ব্যথিত কর্ণের জ্বালা ভুলিয়া ভয়-চকিত ভাবে ছেলে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অত্যন্ত আবদারে বিমলকে সে শান্ত করিতে পারিতেছিল না। দিদিমা প্রমুখ সকলকে দেখিয়া বিমলের কান্না চারগুণ বাড়িয়া উঠিল এবং দিদিমা আসিয়া বাঘবাঘিনীর মত তাহাকে আশ্রয় দিয়া যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বাছাকে কে কি করেচে রে?"—অমনি সে কাঁদিতে কাঁদিতে জবাব করিল, "দিদা! বৌ মেরেচে।"

শুনিয়া একজন মনরাখা প্রতিবেশিনী ঘাড় কাৎ করিয়া বলিলেন, "ও মা সত্যি! এরই মধ্যেই ছেলের গায়ে হাত তুল্লে! হাঁ, বৌ!" এবং মঙ্গলা ঠাকুরাণী প্রায় লাফাইয়া ইন্দ্রাণীর টুঁটি ছিঁড়িয়া লইবার ধরণটাই করিয়া—এমন কথা সংসারে নাই, যা তিনি সেই সদ্য-সমাগতা ভদ্রকন্যাকে বলিতে বাকি রাখিলেন। তার পর দশে-ধর্ম্মের দোহাই পাড়িয়া একচোট, মরা মেয়েকে ডাকা-ডাকি করিয়া একচোট, মতিচ্ছন্ন-ধরা জামাইএর উদ্দেশ্যে আর একচোট—এমনি এমনি অনেক দফাতেই তিনি রোদনের উচ্ছ্বাস বহাইয়া দিয়া তার পর দমকলে নেবা আগুনের মত কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইতে পারিয়া দোক্তা-পোড়ার গুল ঠোঁটের পাশে টিপিয়া দিলেন এবং বিমলেন্দুকে কোলে করিয়া সারা বাড়ীটা ঘুরিয়া

পর-ড়াইতে বেড়াইতে নূতন বধূর কীর্ত্তি-কথা সুপ্রচারিত করিতে থাকিলেন।—এ ভিন্ন আর তো তাঁর কোন কাজও ছিল না।

আর ইন্দ্রাণী? সে নিজের বেদনা-প্রাপ্ত রক্তঝরা কানটাকে কাপড়ে ঢাকিয়া লোকসান হওয়া গহনাটার দিকে ফিরিয়াও না চাহিয়া কেমন যেন একটা অভিভূত আচ্ছন্নবৎ হইয়া বসিয়া রহিল। নূতন জীবন যে তাকে এমন মূর্ত্তিতে দেখা দিবে এ যেন তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রাণীর মা দিদি প্রভৃতি কোন স্ত্রীলোক অভিভাবিকা না থাকা সত্ত্বেও ফুলশয্যার তত্ত্বে বামদয়াল সবটি নিখুঁত ভাবে এমন সাজাইয়া গুছাইয়া পাঠাইয়া-ছিলেন যে সে রকম সুব্যবস্থিত ও সুপ্রচুর আয়োজনপূর্ণ তত্ত্ব পাঠানো এই অঞ্চলের কেহ কখন দেখিয়াছে বলিয়া অন্ততঃ নিজের মনের কাছেও স্বীকার করিতে পারিল না। মেয়ের জন্য তাহার রূপের সঙ্গে মানান করিয়া চূর্ণেহলুদ বেনারসীর সেট, রাঙ্গা ঢাকাইএর জরিদার পাড়ের বাস্ত্রিবাস, বরের ঢাকাই ধুতী, সিল্কের পাঞ্জাবি আর খুঁটিনাটির সমস্তটুকুই।

প্রতিবেশিনীরা মুখে স্পষ্ট করিয়া না বলিতে পারিলেও ভাবখানা ঠিক্ এম্‌নি দেখাইল,—যার সরল অর্থে বলা যায় যে,—"ভাগ্যবানের বউ মরে।"—অর্থাৎ কি না, ভাগ্যে ভাগ্যে পূর্ণেন্দুর রুগ্না শ্রীহীনা এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে প্রথমাটি গত হইয়াছিল, তাই না আজ তাঁর সুন্দরী দ্বিতীয়া পত্নীর সঙ্গে এমন একটি শ্বশুর জুটিল!

পাঁচজনের মুখে তত্ত্বের সুখ্যাতি শুনিয়া বিমলেন্দুর দিদিমা বিমলেন্দু-কোলে দুম্ দুম্ পা ফেলিয়া রঙ্গভূমে দর্শন দিয়াই একবার কুটুম্ববাড়ীর লোকজনদের বুকের রক্ত জল করিয়া দিয়া সুহাসিনীর বিরহশোক উচ্চ চীৎকারে সকলকে জ্ঞাপন করিয়া লইলেন। তারপর তাদেরই সাম্‌নে লোভে-চঞ্চল বিমলের হাতে বাছিয়া বাছিয়া কয়টা দামী দামী এসেন্সের শিশি ও রূপার চুল আঁচড়াইবার চিরুণীখানা তুলিয়া দিয়া একখানা আস্ত চন্দ্রপুলী উহার মুখে টিপিয়া টিপিয়া গুঁজিয়া ছেলে কোলে চলিয়া গেলেন। কুটুমবাড়ীর লোকগুলাকে সারদা কোনমতে জোগাড়-যন্ত্র করিয়া বিদায়ের টাকা ও বাজারের খাবার আনাইয়া দিয়া বিদায় করিল। বিবাহের কর্ত্রী হইয়া এ বাড়ীতে ঢুকিয়া সে যেমন বিড়ম্বনায় পড়িয়াছিল, তেমন নূতন বউও বুঝি পড়ে নাই!

সারদার মেয়ে মায়ের সঙ্গে আসিয়াছিল। সম্পর্কে ছোট হইলেও বয়সের গুণে সেই ইন্দ্রাণীর প্রসাধনের ভার পাইয়াছিল। ফুলশয্যার তত্ত্বের সঙ্গে এক-ডালা বাংতা জড়ানো ফুলের গহনা আসিয়াছিল, সেই সব তাবিজ বাজু চিক চন্দ্রহার কপালের সিঁথিপাটী ইন্দ্রাণীকে যা মানাইল, তাহা দেখিয়া পাড়ার ছোট মেয়ে বউএর দল মঙ্গলা দেবীর গালাগালির ভয় ভুলিয়া মুক্তকণ্ঠেই যত্রতত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, বউ যদি আনিতে হয় তো অমনি!—ফুল যদি কোথাও সাজে তো ঐ নূতন বউএর গায়েই!

দু-একবার আপত্তি জানাইয়া শেষে একটু কুণ্ঠার সহিত দিদির মৃদু ভর্ৎসনায় নূতন শ্বশুরের দেওয়া ঢাকাই প্রভৃতিতে সাজিয়া ঈষৎ অপরাধী ভাবে পূর্ণেন্দু ফুলশয্যার নিয়মকৃত্য সম্পন্ন করিতে বসিয়াছিল। বধূর মৃণাল বিনিন্দিত হাতখানির হল্‌দে সূতার বাঁধনেই যেন কত শোভা! অনন্য-সহায়ে পূর্ব্বাভ্যস্ত পদ্ধতি-ক্রমে সেই হাতের সূতা খুলিতে খুলিতে পূর্ণেন্দুর মনের চোখে পূর্ব্বস্মৃতি যেন সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিল। শুভদৃষ্টিতে বউএর মুখ দেখিয়া সেবারে তাহার মুখে আষাঢ়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। ফুলশয্যার এমনি সময়টাতে মায়ের

পীড়াপীড়িতে বউএর হাত ধরিয়াই সে চমকাইয়া উঠে। রোগাটে হাতখানা তখন জ্বরে পুড়িয়া একখণ্ড জলন্ত কাষ্ঠের মত হইয়া রহিয়াছে! রাত্রে বর এবং বধূ এক ঘরে শুইলেও পূর্ণেন্দুর মা পৃথক বিছানায় সেই ঘরেই শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার খাটুনির দেহ শয়নমাত্রে ঘুমে এলাইয়া পড়িল। সারারাত জাগিয়া নিজের নব-প্রাপ্ত অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল পূর্ণেন্দু নিজেই। তখন আর নববধূর অঙ্গের রূপহীনতার জন্য তাহার নব-যৌবনের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাভরা চিত্ত এতটুকুও পীড়িত হইতেছিল না, তাহার গায়ের অসহ্য উত্তাপকে সহজাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্যই তাহার মধ্যে মমতাময় মানবত্ব সকরুণ আগ্রহে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব পুরাতন কথা স্মরণে আসিয়া পূর্ণেন্দুর কণ্ঠমধ্য হইতে ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উত্থিত হইল। নিজের পক্ষে সঙ্কোচে ও লজ্জায় বেদনা-ব্যথিত অতীতের স্মৃতি হইতে বর্ত্তমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছায় সচেষ্টায় মনকে সহজ করিয়া লইয়া ভাগিনেয়ী সুরথকুমারীকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বিমল ঘুমিয়েচে তো?"

সুরথকুমারীর মন দিদিমার উপরে যথেষ্ট পরিমাণেই অসন্তোষে ভরা ছিল। সে মামার প্রশ্নের উত্তরে তাহারই খানিকটা ঢালিয়া দিয়া বিরক্তি-বিরসকণ্ঠে জবাব দিল, "ঘুমিয়েচে না কচু করেচে! সন্ধ্যেবেলা অবধি তাকে নিয়ে গিন্নি শুয়ে শুয়ে ঘুমুবেন, আবার এরই মধ্যে ঘুমুতে পাবরে কেন? কুম্ভকর্ণ তো নয়।"

সুরথের মুখের কথা কি ভাগ্য যে শেষ হইয়াছিল—বিমলেন্দুর দিদিমা বিমলেন্দুকে কোলে করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে যেন আচম্‌কাই এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের মাঝখানে দৈবপ্রেরিত হইয়াই আসিয়া পড়িয়াছেন,—এম্‌নি করিয়াই খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া, তার পর নামিয়া পড়িবার জন্য চেষ্টিত বিমলেন্দুকে ধপ্‌ করিয়া নামাইয়া দিয়া ঠিক পাশের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িয়া,—"ওরে রাণি আমার। আজ তুই কোথায় রৈলি রে?" বলিয়া উচ্চ রোলে কাঁদিয়া উঠিলেন। এদিকে দিদিমার কঠিন কবলমুক্ত বিমল হুড়াহুড়ি

করিয়া ঘরে ঢুকিয়া ছুটিয়া গিয়া বাপের গলা হইতে মোটা গোড়ে মালাগাছা ছোঁ মারিয়া ছিঁড়িয়া লইল। সেই ছেঁড়া মালাটা নিজের গলায় ঝুলাইয়া হাসিয়া বলিল, "বাবা 'বল্' না, আমি 'বল্'।"—তার পর ইন্দ্রাণীর ঘোমটার মধ্যে মুখটা ঢুকাইয়া মিষ্ট স্বরে কহিয়া উঠিল, "বৌ টু!"—এবং উভয়ের মাঝখানে ধুপুস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া খুব হাসিতে হাসিতে একবার ইহার একবার উহার বাটি হইতে ক্ষীর মুড়কার ফলার খাইতে লাগিয়া গেল।

পূর্ণেন্দু ব্যথিত কুণ্ঠিত ভাবে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। গভীর রাত্রে পরিজনগণ সকলেই যখন নিদ্রামগ্ন, তেমন সময় চুপি চুপি অভিসারের ভাবে নিজের অন্ধকার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সন্তর্পণে বাতি দেশালাইএর সাহায্যে আলো জ্বালাইলেন। খাটের উপর সেই এক গা ফুলের গহনা-পরা ইন্দ্রাণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাশের বিছানায় তাঁহার নিজের স্থান খালি। আলোটা এমন করিয়া রাখা হইল যাহাতে তার সব আলোটা নিদ্রিতার মুখের উপর পড়ে, তার পর কাছে আসিয়া পূর্ণেন্দু ঘুমন্ত স্ত্রীকে একটুখানি নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "ইন্দ্রাণি! ইন্দু!"

ইন্দ্রাণী জাগিয়া উঠিয়া বসিল।

পূর্ণেন্দু মিনতি-ভরা স্বরে কহিল, "একবার তোমার মুখ আমায় ভাল করে দেখতে দেবে কি ইন্দ্রাণী?—বেশ ভাল করে?"

ইন্দ্রাণী নিদ্রাজড়িত চক্ষু মুছিয়া অবগুণ্ঠনের অন্তরালে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। বয়সে নিতান্ত বালিকা নয়, বিশেষ সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। স্বামীর পারিবারিক অবস্থাটা যে বেশ সুখের নয়, সেটুকু এই দেড়দিনের মধ্যে বুঝিতে তাহার বাকি ছিল না। স্বামীর সংশয়ান্দোলিত করুণ কণ্ঠ এবং একান্ত বিনম্র মিনতি তার নারীচিত্তের করুণা-উৎস স্বতঃই উহার প্রতি উৎসারিত করিয়া দিল। এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি তার ছিল, এই যে প্রথম মিলনের মুহূর্ত্তে চিরজীবনের পরিচয়ক্ষণে সর্ব্বপ্রথম আবেদন তিনি তার কাছে জানাইলেন,

ইহাতে আব যাই থাক্, ইহা প্রেমিকেব প্রেমোচ্ছ্বাস পবিপূর্ণ প্রণয়-নিবেদন নহে। এ যেন তাব চেযেও অনেক বেশি,—অনেক দূবেব জিনিষ,—এ যেন সমুদ্রে-দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকেব ধ্রুবতাবা দেখিয়া পথ নির্দ্ধাবণেব প্রাণপণ চেষ্টা!

ইন্দ্রাণী অসঙ্কোচে গুণ্ঠনবস্ত্র অপসাবিত কবিয়া, সহানুভূতিপূর্ণ চক্ষে স্বামীব পানে চাহিল।

এই মুখখানাব অস্পষ্ট ছবি শুভদৃষ্টিব মুহূর্ত্তে পূর্ণেন্দুব দৃষ্টিকে আশ্বস্ত কবিয়াছিল,—তাহাব দ্বিপত্নীকত্বেব কুণ্ঠিত লজ্জাকে গোপনে সান্ত্বনাও সে দিতে ছাড়ে নাই, কিন্তু এই যে মুখ আজ সে দেখিল, ওই যে আধফোটা ফুলেব কলিব মত আধনত মধুব দৃষ্টিটুকুব বসমাধুর্য্য সে ক্ষণিকেব জন্য পান কবিতে পাইল, তাঁহাতেই যেন তাহাব সকল ব্যথাব-কণ্টক ঝবিয়া পড়িয়া মনেব মধ্যে তৃপ্তিব আনন্দ গোলাপেব মত রূপে বসে গন্ধে ভবপুব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ভবিষ্যতেব বঙীন ছবি ওই মুখখানাব চাবি পাশ ঘেবিয়া যেন চন্দ্রমণ্ডলেব মতই উজ্জ্বল ও সুন্দব হইয়া দেখা দিল। সে মুখে আশ্চর্য্য কিছু ছিল! তুলির টানে টানিযাও যা আঁকা যায় না, শুধু সেই নাক চোখই নয়;—তা' ছাড়া আবও কিছু, অনৈসর্গিক কোন কিছু—যেখানে হৃদয, মন প্রাণ সমস্তই একমুহূর্ত্তে লুটাইয়া পড়িয়া সান্ত্বনাও পায় এবং শান্তিও লাভ কবিতে পাবে।

দেখিযা দেখিয়া দেখিযা যখন সেই দৃষ্টি-ক্ষুধা মিটাইয়া লইবার আশাটা একান্তই দুবাশা বলিয়া ধবা পড়িল, তখন বুভুক্ষিত দৃষ্টিব দুষ্ট-ক্ষুধাকে জোব কবিযা দমনে বাখিয়া সে ইন্দ্রাণীর খুব কাছে,—একান্ত সান্নিধ্যে সরিয়া আসিল। দুই ব্যগ্র কবে টানিয়া আনিয়া সেই মুখখানাকে সহসা সে তার নিজেব বুকেব উপর জোর কবিযা চাপিয়া ধরিল,—যেন এম্‌নি কবিযাই, সে মুখেব ছাপ্‌টাকে নিজেব বুকেব ফলকে তুলিতে পারিলেই, তার সব অতৃপ্তি পবিতৃপ্ত ও সার্থক হইয়া যাইতে পাবিবে। জলমগ্নের মত উর্দ্ধদিকে শ্বাস লইয়া, আগ্রহ-মথিত আনন্দে সে কহিয়া উঠিল, "ইন্দু [illegible] ইন্দু! তুমি আমার বল

দিও,—আমায—আমায সাহায্য কোবো,—করবে তো ?”

মাথা হেলাইযা ইন্দ্রাণী জবাব দিল, “হ্যাঁ।”

বৌ-ভাতেব দিনে মঙ্গলা ঠাকুবাণীব সম্পূর্ণ চেষ্টাকে পবাভূত কবিয়া পূর্ণেন্দুর জ্ঞাতি খুডা প্রভৃতিব বিশেষ যত্নে জ্ঞাতি গোষ্ঠি কুটুম্ব ভোজনেব ব্যবস্থা হইযাছিল। মঙ্গলা যজ্ঞ পণ্ড কবিবাব আর কোন পথ না পাইযা নিজেব ভাঁডাবে চাবি দিযা বিমলেন্দুকে কোলে লইযা এঘব-ওঘব ঘুবিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেক ছুতাব-নাতাব যাব সঙ্গে না তার সঙ্গে ঝগডা বাধাইতে চেষ্টিত হইলেন। নিজেব উক্ত কার্য্যেব ব্যাখ্যায বলিলেন যে, “যজ্ঞবাডীতে—কি বিচাব থাকে। যে-সে যা-তা পাবে আমাব ভাঁডাব ঘবকে যে এক কববে সে আমি দেখতে পাববো না,—তাব চাইতে না হয স্পষ্ট কবেই বলুক যে, ‘তুমি বাডী ছেডে চলে যাও,’—সেও আমাব পক্ষে সহজ হবে। আমি বাপু সোজা কথাব মানুষ—ঘোব-প্যাঁচ ভালবাসিনে।”

যা’ হোক কবিযা হাট বাজাবে ভাণ্ডাব বাখিযা কোনমতে পাঁচজনে মিলিয়া লোক খাওযানোব বন্দোবস্তটুকু কবিযা তুলিলেন। দিদিমা যখন শুনিলেন তাঁহাব স্থবিব বৌ-ভাতে ইহাব দশগুণ লোক খাইযাছিল, এবং সে খাওযানোরই বা আযোজন কত,—তখন তাঁহাব ধ্বসিযা-পডা বুকটা যেন একটুখানি আলের আটকাল পাইল! ছেলে কোলে লইযা বান্নাঘবের দবজায যেখানে পূর্ণেন্দুর জ্ঞাতি খুডি পিসি প্রভৃতি কাজকর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত সেইখানে আসিযা একজনকে লক্ষ্য করিয়া একটুখানি মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিলেন, “কাল যদি আসতে বে’ন। তাহলে যাহোক একটা নাটক দেখা হযে যেত তোমাব! আমার তো ভাই এই পোডার দশা,—তবু যা’ বলো, একচোখে কেঁদে, এক চোখ দিয়ে হেসেচি। সেই যে কথায় বলে, ‘হেসে নাহি বাঁচি, ব্যাঙ ছেড়ে কেঁচে হলেন

ব্যাঙাচি'—আমাব জামাইএব যেন ঠিক হয়েচে তাই! আমাব অবিখ্যি বল্‌তে সম্বন্ধে বাধে, বলা অবিখ্যি তুষ্মু দেখায়,—এই ঢাকাই ধুতি ফিন্ ফিন্ করতেছে, এই পাঞ্জাবি উড়্‌তে লেগেছে, গলায বেড়ালের ল্যাজেব মতন্‌ এই মোট্টা গোড়ে, এসেনের গন্ধে মনে হচ্ছে যেন ঘবেব মধ্যে সাতটা ছুঁচো চবে গেছে, ওসব কি এখন ভাল দেখায়, নাকি বল?"

পূর্ণেন্দুর খুড়িমা সম্বন্ধের এক মুখবা নাবী সহিয়া থাকিতে না পারিয়া কটু করিয়া বলিযা ফেলিলেন, "তা বে'ন! পববে না কেন? পূর্ণব আমাদের এই যেটের সাতাশ কি আটাশ বছব বযেস—এ বয়েসে তো কত ছেলেব প্রথম বিয়েই হয়ে ওঠে না,—ওব একটু সকাল সকাল হয়েছিল বলেই না—"

মুখখানাকে কোন বাত্রিচব প্রাণিবিশেষেব ভঙ্গীতে ঘুবাইযা লইযা বিমলেন্দুব দিদিমা ফব্‌কাইযা চলিযা গেলেন। নিজেব অনিবার্য্য পরাজয়কে চাপা দিবার চেষ্টায় শুধু এই টিট্‌কাবীটুকু দিযা গেলেন, "বেশ গো ভাই, তাই বেশ! পূণ্যু তোমাব কচি খোকাটি!"

বৌভাতে বৌযেব হাতে যে অন্ন-বস্ত্র তুলিয়া দিতে হয়, তাব বস্ত্রখানি ভদ্র গৃহস্থেব ঘরে প্রায় একখানি বেনাবসী সাড়ী দেওয়ারই ব্যবস্থা আছে। সারদা ভাইকে বলা কহা কবিয়া বৌএব জন্য একখানি সাড়ী,—এবং এক কুচা সোনা পর্য্যন্ত বধূব অঙ্গে না দিলে বৌএব বাপেব বাড়ীব লোকেরা কি বলিবে, এই ভয় দেখাইযা আদায় করিয়াছিলেন—সিঁথিতে ঝুলাইবার ললাটিকা বা চলিত কথায যাহাকে টিকা বলে তাহাই একটি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেই টকটকে লাল ও কটকটে মোটা জবিজ্যাবড়া বেনারসী সাড়ীখানা ও সেই সস্তা দামের সিঁথিব টিকাটুকু পবিয়াই ইন্দ্রাণীকে এত সুন্দব মানাইল যে, দর্শকদলের মধ্যে একজন ভাবমুগ্ধ বৃদ্ধ তাহাব তলা-পর্য্যন্ত আলতা-মাখা পাযেব উপর মা! মা! বলিতে বলিতে প্রায লুটাইযা পড়িবার যোগাড় করিযা ভাব-বিভোর চিত্তে গাহিয়া উঠিয়াছিল—

"আ—য় জবা আনি,—নৈলে কি—দিব পায় ?
সো—না সাজে না—বে,—মা—য়ের রাঙা পা—য়।"

মুখে মুখে এই আলোচনাটা অনেক দূরেই ছড়াইয়া পড়িল। শুনিয়া অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে ও পূর্ণ-বিদ্বেষে জ্বলিয়া উঠিয়া মঙ্গলাদেবী বিমলেন্দুকে কোলে টিপিয়া যেখানে বৌ-ভাতের বউকে সাজাইয়া বসানো হইয়াছে তাহারই একপ্রান্তে আসিয়া উঁকি মারিলেন। তাঁহার ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের মন্দ হাস্য সহসা মিলাইয়া গিয়া অজগরের এক ঝলক বিষোদ্গীরণের মতই একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস বুকটাকে ঠেলিয়া ফুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে বিষবায়ুর খানিকটা যদি ছুটিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীর ওই রাঙ্গা সাড়ী-মোড়া হর্ষেলের বর্ণটাকেও অন্ততঃ ঐ জাতীয়ের দংশন-বিষে উচ্চৈঃশ্রবার ধবল মূর্ত্তিকে কালোয় পরিণত করার মত্তই ঝাঁসা কালি মাড়িয়া দিতেও পারিত তো হয় ত বা কন্যাশোকাতুরা মঙ্গলা ঠাকুরাণীর অন্তঃস্তলের দাহজ্বালা কথঞ্চিৎ বা প্রশমিত হইত,—কিন্তু না, সেরূপ কিছুই হইল না, দিবালোকের সবখানি উজ্জ্বল ছটা যেন যড় করিয়া তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা সাধিতেই তাঁহার ওই দুটি চক্ষের শূলবেদনা-স্বরূপা মেয়েটির কাঁচা সোনার রংয়ের উপর পড়িয়া অঞ্জলিভরা হীরার গুঁড়ার মত তাহাকে আরও বেশী করিয়া ঝলকাইয়া তুলিল। আকাশের লালে, কাপড়ের লালে, সিঁদূরের লালে, আল্‌তার লালে সমস্তই রক্তিম, সমস্তই যেন স্বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে।—তবে, এ কি চোখে দেখা যায় ? এ কি মেয়ে-হারানো মায়ের প্রাণে সহ্য হয় ?

আত্মবিস্মৃতা দিদিমায়ের শিথিল আবেষ্টন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বিমলেন্দু ছুটিয়া আসিয়া ইন্দ্রাণীকে ঢিপ্‌ করিয়া একটা প্রণাম করিল, উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "থাতুল!"

ইন্দ্রাণী নিজের বধূত্বের সমস্ত নিয়মাবলী বিস্মৃত হইয়া গিয়া তখনি ব্যগ্র স্নেহে শিশুকে নিজের কাছে—একেবারে কোলের উপরে টানিয়া আনিল। তার ফুলো ফুলো গাল দুটি আদরে একটু টিপিয়া দিয়া মুখে একটি চুমা খাইয়া

ব্যাঙানির কাছে মুখ আনিয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ঠাকুর না, মা।"

শিশু গোপালে তার গহনাপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে, ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথা নাড়া দিয়া আগ্রহের সহিত তাহারই কথার পুনরুক্তি করিল—"থাক্কুর ন, মা।—মা।"—বলিয়া হাসি হাসি মুখখানা তার ঘোমটার সামনে উঁচু করিয়া তুলিল।

ইন্দ্রাণীর সমস্ত হৃদয় প্রাণ বিমথিত করিয়া কি যেন এক অপূর্ব্ব পুলকের স্রোত সুখের ও গৌরবের তরঙ্গে লহরে লহরে নাচিয়া উঠিল,—মা।—তার প্রতি লোমকূপের মুখে মুখে সে পুলকোচ্ছ্বাস যেন আবেশে কণ্টকিত হইয়া রহিল, তার শরীরের প্রতি শিরা উপশিরায় সে অননুভূত আনন্দের আবেগ যেন হিল্লোল তুলিয়া বহিয়া গেল, তার এমন অনুভব হইল, যেন ঠিক এই মা নামকরণের প্রথম মুহূর্ত্তেই তার আসনখানি গৌরবের সিংহাসন রূপে পৃথিবীর মাটির চাইতে একটুখানি উর্দ্ধে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। সম্পূর্ণ সেই সুখের প্লাবনে ভাসিয়া গিয়া প্রফুল্লিত শিশুটিকে বুকের ভিতর টিপিয়া ধরিল, আবেগ ভরা আনন্দে চুম্বনে চুম্বনে উহাকে ভরাইয়া দিবার ইচ্ছা করিতে থাকিলেও, স্থান কাল বুঝিয়া সে উচ্ছ্বাস সে দমন করিয়া শুধু একটি ক্ষুদ্র চুম্বন দিয়া আদরের মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "বিমু! বিমু! বিমল!"

এমনি সময় বাচ্চা হারানো—বাঘিনীর মত আগুনজ্বালা চোখের দৃষ্টিতে এক নিমেষে স্বর্গ-রাজ্যের পরিকল্পনা শূন্যে মিলাইয়া দিয়া বিমলেন্দুর দিদিমা প্রায় ছুটিয়া আসিয়া বিমলকে কঠিন হস্তে টানিয়া নিজের কুক্ষিজাত করিলেন। এতক্ষণকার সবটুকু গায়ের জ্বালার ঝাঁজ মিশাইয়া তীব্র কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখ বৌ। ওকে যে থেকে থেকে লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে অস্তুর-টিপুনি দেবে, সেটি হবে না বাছা। আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ ওকে তুমি রেহাই দিও।—এই গলায় বস্তর দিয়ে, যোড় হাত করে তোমার কাছ থেকে আমি

ভিক্ষে চেয়ে নিচ্ছি"—বলিতে বলিতে আকস্মিক বন্ধন-দশায় পড়িয়া;—যাইতে একান্ত অনিচ্ছুক উচ্চ-চীৎকার-পরায়ণ বিমলেন্দুকে জোর করিয়া টিপিয়া ধরিয়া তিনি মিলিটারী ধরণে ঠিক যেন 'কুইক্ মার্চ' করিয়া প্রস্থিত হইলেন। —এর পর অনেকক্ষণ অবধি বিমলেন্দুর—মা,—মা, শব্দে চীৎকার ও কান্না এবং বিমলেন্দুর দিদিমার তার চাইতেও উঁচু গলা, "ওরে, কি পাষাণী বাণী আমার শ্মশানবাসিনী হলেন রে।—ওরে,—আমার 'চখে' যে আজ থেকে চখের সাগরে ভাসালো রে। ওরে, আর কি ও কেউ মুখ চাবে রে।" ইত্যাদি ছড়া কাটা কাটালো-কাটানো শব্দ-বাণ মারা কর্ম্মবাড়ীকে ত্রস্ত ব্যস্ত করিয়া রাখিল।

রাত্রের শয়ন-মন্দিরে নিভৃতে কথা কহিয়া ইন্দ্রাণী সসঙ্কোচে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করলে আমি ওকে একটি খানিও খুসী করতে পারি, আপনি আমায় বলে দিন না?"

শুনিয়া প্রথমটা ব্যঙ্গচ্ছলে ঈষৎ হাস্য করিয়া পূর্ণেন্দু - অবশ্য সত্য কথাই বলিয়াছিলেন,—"সে যদি আপনি কোন কিছু নূতন আবিষ্কার করে নিতে পারেন, তো বরং চেষ্টা দেখুন,—আমার সমস্ত প্ল্যানই ভেসে গেছে।"—তার পর স্ত্রীর ঔৎসুক্যপূর্ণ চোখের পানে চাহিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িয়া নিতান্ত দুঃখিতের ভাবে কহিলেন, "সে আর তুমি পেরেছ ইন্দু! দেখছি, তোমায় বিয়ে করে এনে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ করে ফেলেছি।"—এই বলিয়া জটিল হিন্দুবিবাহে চির-সম্বন্ধ বর অনুশোচনার বেদনায় পরিপূর্ণ একটা তপ্ত শ্বাস মোচন করিলেন। যা, হইয়া গিয়াছে, তাহার তো আর চারা নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর সাত-আট মাস ইন্দ্রাণী বাপের বাড়ীতেই ছিল। পূর্ণেন্দু কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় ও এদিকে সেদিকে যায়, সেই ফাঁকে সে বারে বারে আসিয়া সুন্দরী ও তরুণী বধূর সহিত ভাব করিয়া গেল। বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু সত্যকথা গোপনও থাকে না,—পূর্ণেন্দু পাঁচ-বৎসর বিবাহ-করা স্ত্রী সুহা-সিনীর চাইতে স্বল্পদিনের বিবাহিতা দ্বিতীয়া পত্নীকেই যেন অত্যধিক ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। সুহাসিনী স্বামীকে ভালবাসিত, কিন্তু সে ভালবাসার দায়ে পূর্ণেন্দুকে বিশেষ বিপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। নব বিবাহিত স্বামী স্ত্রীকে যেমন করিয়া চায় এবং তেমন করিয়া না পাইলে অভিমানে সংসার বিষময় দেখে,—পূর্ণেন্দুর প্রথমা-স্ত্রী সেই ভাবে তার সুরূপ স্বামীটিকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া, নিজের দুর্ব্বল বাহুপাশে বদ্ধ করিতে চাহিত। নিজের শরীরে রূপ বড় একটা ছিল না বলিয়াই বোধকরি স্বামীর নিজের আয়ত্তের বাহিরে একটি পাও সরিয়া থাকা সহ্য করিতে পারিত না। স্বামীর সুন্দর মুখ দুচোখ ভরিয়া দেখা তার বিশেষ লোভের বস্তু। কিন্তু স্বামী বেচারা তার কৃশ দেহে লাবণ্য-পরিশূন্য মুখে এবং ততোধিক অশিক্ষিত মনোবৃত্তির মধ্যে এমন কিছুই খুঁজিয়া পায় নাই যাহার লোভে রাত্রি দিন উহাতেই তন্ময় থাকিতে পারে। ফাঁক পাইলেই সে বন্ধু-বান্ধবের উদ্দেশ্যে উড়িয়া পলায়,—এবং সুহাসিনীর আহত-প্রেম, দুর্জ্জয় অভি-মানের আগুনে পরিণত হইয়া, অশান্তির দাহ আনে!—এই তো সেই ব্যর্থতার ইতিহাস!—কিন্তু এবারে চক্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ণেন্দুর যে মানসিক তৃষ্ণা সুহাসিনীর দ্বারা মিটিতে [illegible] ইন্দ্রাণীতে তার সেই অতৃপ্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করিতেছিল। [illegible] রূপজ মোহ,—মানুষের

মনকে টানিয়া লইতে সে বড় কম করে না। দ্বিতীয়তঃ, স্বভাবের মাধুর্য্য ;—সেইতো আকর্ষিত চিত্তকে চির-বন্ধনে বাঁধিবার সহায়। তা এ দুই-ই সে তার নবীনা বধূর নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রাণী শুধুই সুন্দরী নহে, তার মুখে চোখ রাখিয়া শুধু সৌন্দর্য্যের পীযূষ-ধারা পান করিবার প্রয়োজন হয় না ;—কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি সকল বিষয়েই তাহার সহিত অল্প বিস্তর আলোচনা করা চলে। পরিণত-বয়স্ক একজন শিক্ষিত যুবার পক্ষে এ বড় কম সুযোগ নয়। পূর্ণেন্দু সামান্য দিনের যাতায়াতেই এই উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়েটির একান্ত নিরাড়ম্বর সরল এবং শিক্ষা-মার্জ্জিত অন্তঃকরণের পরিচয় প্রাপ্তে পুলকিত এবং বিষাদিতও হইল। বিষণ্ণ হইল সে নিজের ঘরের জটিলতার কথা ভাবিয়া। ইহাকে সে ইহার যোগ্য কি দিতে পারিবে ?

সে দেখে ইন্দ্রাণী বাপের কাছে সকালবেলা সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর পাঠ লয়। কুমার-সম্ভবের পদ্যানুবাদ তাঁহাকে শুনায়, তার পর ঝি না থাকিলে উনান ধরায় ভাত রাঁধে। রামদয়ালবাবু মাহিনা করা পাচকের অন্ন গ্রহণের বিরোধী। তাঁর বিশ্বাস আত্মজন ব্যতীত যথার্থ শুচিতার সহিত পরে কখন পরের জন্য কাজ করিতে পারে না, এবং তা না পারিলে—শুদ্ধ স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলেও উহা সুপাচ্য নয়। বলা উচিত তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু; এবং ব্যবসায়ে বৈদ্যজাতির জাতি-ধর্ম্মানুসারে কবিরাজ। তা ইন্দ্রাণীর রান্নায় লবণের আধিক্য বা অভাব ঘটে না, পানের চূণে গাল পোড়ে না, আবার তার 'কুমার' ও 'ভট্টির' বেশ অনুবাদ-কবিতাও সুললিত হয়। টেনিসন ও বায়রনের কবিতা কয়েকটা তার পড়া ছিল। ইংরেজী গদ্য গ্রন্থ মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রের সংবাদ—আবশ্যক মত বাপকে পড়িয়া শোনানো তার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে। পূর্ণেন্দুর মুগ্ধ চিত্ত যতই দেখিল ততই এই বিদুষী তরুণীকে বেষ্টন করিয়া করিয়া ধরিল,—ততই তাহার হৃদয় একটা অননুভূতপূর্ব্ব আরামে শীতল হইয়া আসিল। এমন একটি [illegible] যে কোন মূল্য দিয়াই গ্রহণযোগ্য !

বধূ ঘরে আনিবার জন্য তার বরের ছাড়া আর কাহারও মনে ত্বরা ছিল না, বরং আনিবার জন্য ঘোর আপত্তিই বিমলেন্দুর দিদিমার মনে ছিল। পূর্ণেন্দু নিজের 'মনোবৃত্তানুসারিণী' 'মনোরমা' ভার্যাটিকে সর্ব্বতোভাবে নিজের করিয়া পাইবার জন্য—উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আনিতে পিতা ও শ্বশুরের সাক্ষাতে মুখ ফুটিয়া আবেদন জানাইতে পারিল না। এ পক্ষে বিধাতা তার জন্য আর একটা শাশুড়ী রাখা আবশ্যক বোধ করেন নাই,—শ্যালিকার মধুর সম্পর্কে দু-পক্ষেই সে বঞ্চিত। এবার একটিমাত্র শ্যালক লাভ হইলে কি হয়, তার পাঠ্যাবস্থা,—গৃহ হইতে সে নির্ব্বাসিত, কিন্তু অন্নদামা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। একদিন জামাই আনিলে কুশল প্রশ্নকালে 'খোকা'র অসুখের খবরে রামদয়াল কহিলেন, "ওর তো সর্বদাই পেটের অসুখ শুনতে পাই,—আচ্ছা, খাওয়ানো দাওয়ানো কি বেশ নিয়মে হয় না?" পূর্ণেন্দু কহিল, "'বেশ' ছেড়ে একটুও নিয়মে হয় না। ওর দিদিমার বিশ্বাস ছেলেকে যত বেশী খাওয়াবেন ততই ওর স্বাস্থ্যোন্নতি হবে। এইজন্যই ওকে রোগে ভুগতে হয়।" রামদয়াল দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকে সাধারণতঃ এই ভুলগুলি করে থাকেন। তা তাঁদেরই শুধু দোষ দিই কেন,—পুরুষমানুষ আমরাই সকল সময়ে আমাদের শরীর বুঝে আহার বিহার করতে পারি না, আর তার ফলে অজীর্ণ রোগে ভুগে অকালে জরাগ্রস্ত হই। তুমি এক কাজ করো না কেন পূর্ণ! তাঁকে কোন ডাক্তারি বা বৈদ্য গ্রন্থ থেকে শিশুপালন সম্বন্ধে একটু পড়েও তো শোনাতে পার। ওদের যে বয়স অনুসারে দুই থেকে পুরো তিনটি ঘণ্টা বাদ দিয়ে দিয়ে খাওয়াতে হয়,—আর পেটের এক কোণ খালি রেখে আহার দিতে হয় সে আহার্য্য কিরূপ বিশুদ্ধ ভাবে তৈরি করা উচিত, ঢেকে রাখা উচিত—এ সমস্তই আমাদের মায়েদের জানা বিশেষ দরকার। সেকেলে মায়েরা জিনিষের পবিত্রতা হিসাবে স্বাস্থ্যের একটা দিকও তবু দেখতেন,—একালের মায়েরা আবার সেটুকুও দেখেন না, ঝির হাতে তাঁদের খোকার খাদ্য তৈরি হয়। এ সব বড়

দুঃখের কথা, বুঝলে পূর্ণ।—বড় দুঃখের বিষয় বাবা! ছেলে বংশধর;—সে যদি আমাদের নিজেদের অজ্ঞতার ফলে রুগ্ন অল্পজীবী হলো—তার চাইতে আর কষ্ট কি আছে।"

পূর্ণেন্দু বুঝিল কি হইবে, এ সম্বন্ধে তার কোনই হাত ছিল না, ইহা সে বুঝিত। বলিল, "তিনি কারু কথা কানে তোলবার লোক ন'ন। এক দিন বিনুর জ্বরের উপর ওকে গজা খেতে দিয়েছিলেন,—আমি বারণ করায় সাত দিন আমার সঙ্গে কথাই কননি—একটা দিন তো উপোসীই রইলেন, কিন্তু ছেলেকে লুকিয়ে খাওয়ানো ছাড়লেন না, রাগের উপরেও সে চললো।"

বামনদাস কহিলেন, "তাই। তবে তো বড় দুঃখের কথা।" এই বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে, হঠাৎ কি যেন একটা মস্ত উপায় ঠাওরাইয়া ফেলিয়া পরম আশস্ত ও পুলকিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "দেখ বাবা। তাহ'লে একটি কাজ না হয় করো, ইন্দু ওসব খুব ভাল রকমই জানে। মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্য-তত্ত্বটা খুব উত্তমরূপে শেখানো আমি উচিত বোধ করি,—আর সেইটেই আমি বিশেষ ভাবেই ওকে শিখিয়েছি। ভেবে দেখ, অ্যানাটমির নোট মুখস্থ করে বাঙ্গলার মেয়ের ভবিষ্যৎ-জীবনে তার ফল অল্পই ফলবে। রান্না, গৃহকার্য্য, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, শিল্প এবং কাব্য সাহিত্য,—এর উপর সামান্য ভাবের কিছু অঙ্ক, কিছু ইতিহাস, ভূগোল দখল হলেই সেই মেয়েকে আমি শিক্ষিতা বলি। ওঁদের জীবনে এইগুলিই ফলপ্রদ হবে। যা হোক, ইন্দুকে তুমি বাড়ী নিয়ে গেলে সেই তার ছেলেটির খাওয়া দাওয়া দেখবে। যাতে এই শৈশবকাল থেকেই তার শরীরটির সঙ্গে মনের বৃত্তিগুলির সম্যক্ ভাবে স্ফুরণ হয়, যাতে করে উচিতের দিকে ধর্ম্মের দিকে সেগুলির গতি হয়—সেই সব বিষয়ে খুব সাবধান হয়ে এই সময় হতে লক্ষ্য রেখে যাওয়া দরকার। ইংরেজীতে বলে 'শিশুই ভবিষ্য মানবের পিতা'। এ বড় ঠিক কথা বাবা। এই ছোট্ট বেলা থেকেই ওদের মানুষ হ'বার পথ তৈরি করে দিতে হয়। ইন্দু আশা হয় এসব

পারবে। আমি দেখেছি, তার এ সম্বন্ধে বেশ একটুখানি নৈসর্গিক ক্ষমতাও আছে। দু একটি ছোট ভাই-বোন তার জন্মেছিল কি না,—তাদের সে-ই পালন করেছিল।"

পূর্ণেন্দু লোভের আতিশয্যে এমনি অভিভূত হইয়া গেল যে, এক্ষেত্রে যে ইন্দ্রাণীর শক্তি অনৈসর্গিক হইলেও তাহা কাজে লাগা কত কঠিন, তৎসম্বন্ধে সে একটি কথাও আলোচনা করিল না। ছেলের মানুষ হওয়া সম্বন্ধে সে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু নিজে অন্ততঃ দু-দিন মনুষ্য-জন্মটা সফল করিয়াও তো লইতে পারিবে! ঘরে তার জন্য কি সঞ্চিত আছে যে এ মায়ায় সে পড়িবে না?

ইন্দ্রাণী ঘর করিতে আসিল। গৃহে স্ত্রীলোক না থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে ঘর-বসতের সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিষপত্র রামদয়াল নিজেই গুছাইয়া দিয়াছিলেন। ধামাভরা ফেনি-বাতাসা, হাঁড়ি ভরা ভরা মশলা, মিষ্টান্ন, নমস্কারী সাড়ী বাসন-বিছানা সমস্ত। এ ছাড়া বিমলেন্দুর জন্য একটি ছোট টিনের বাক্সে এক বাক্স খেলনা, একটি জরির কাজকরা দামী পোষাক এবং খানকয়েক শিশুরঞ্জন বাসন-পত্র স্বতন্ত্র আসিয়াছিল। বিমলেন্দুর দিদিমা খুব খানিক উচ্চ চীৎকারে পাড়ার লোককে খবর দিয়া ফেলিয়াই উহারা আসিয়া পৌঁছিলে পাছে সমাগত দ্রব্য-জাতের মধ্যে ভাগ বসায় সেই ভয়ে হঠাৎ কান্না চাপা দিয়া জিনিষপত্র ঘরে তুলিতে তুলিতে উহাদের অথবা বধূকে, কাহাকে কে জানে—শুনাইয়া শুনাইয়া ঝঙ্কার ঝাড়িয়া উঠিলেন, "ওমা, বোগনো দিয়েছ কেন গা! মেয়ে হবিষ্যি করবে না কি? মিন্‌ষের আক্কেল তো খুব!"

শুনিয়া ঘোমটার মধ্যে ইন্দ্রাণীর দু'চোখ জলে ছল-ছলিয়া আসিল; কিন্তু সে-অশ্রু সে রোধ করিল।

প্রতিবেশিনী জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, "বালাই ষাট্! বেয়ান, তুমি বলো কি? বেটাছেলে অত কি জানে,—ঐ যা দিয়েছে দেখে তো আমরা অবাক্

হচ্চি ! বলি, আমরা মেয়েমানুষ হযেও তো এমনটি গোছাতে পারি নে। ঐ ছোট আলমারিটায কি ? বই বুঝি ?"

বিমলেন্দুর দিদিমা মুখটা বাঁকাইযা জবাব দিলেন, "হুঁ, মেযের পাশ কর্ব্বার বইপত্তর।"

আর একজন প্রতিবেশিনী আসিযা বিমলেন্দুর জন্য প্রদত্ত সামগ্রী[illegible] দিযা নাড়িযা চাড়িযা প্রশংসার সহিত কহিযা উঠিলেন, "তা যাই বলো বিমুর দিদিমা, নতুন-বৌযের বাপের মতন অমন আক্কেলটি বাবু খুব কম লোকেরই থাকে। পূজার তত্ত্বে তোমার নাতিকে একটা পঞ্চাশ টাকা দামের পোষাক দিযেছিল,—আবার এই এত দামের আর একটা দিযেছে। তা'ছাড়া, কত সবই তো দিচ্ছেন, তার ঠিকানা নেই। লোকের নিজের দাদামশাই.বা এত কোথায দেয গা ?"

বিমলের দিদিমা মুখখানা ঠিক হাঁড়ির মত করিযা হাঁড়ির ভিতর দিয়া কথা কহিলে যেমন শুনায তেমনি স্বরে জবাব দিলেন, "তবে আর দুখের আমার মা-মরার দুঃখ রইল না ! মা থাকলে তো আর ওর ভাগ্যে পাতালে-বড লোক মাতামো'র দেওযা মখমলের পোষাক অঙ্গে উঠতো না।—ওরে, বাছার আমার সকল দুঃখ ঘুচে গেল রে !"—এই কথা বলিয়াই সব তোলাপাড়া বন্ধ করিযা দিযা দুম্‌দাম্ শব্দে হাঁড়িকুড়িগুলা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার শব্দে কাঁদিতে লাগিযা গেলেন,—"ওরে আমার সুষিরে, ওরে তুই মরে আজ সবারই সুখ ধরে না রে। ওরে মা রে আমার ! জামাই তো নিশ্চিন্দি হয়ে নতুন-বৌ নিযে মেতে উঠেছেন, দশজনের নোলা দিযে তত্ত্ব খাবার সুখে জল ঝরছে, এইবার তোর ছেলেটাকে আমার বুক থেকে ছিঁড়ে নিতে পারলেই ডাইনি-রাক্ষুসীদের মনস্কামনা সিদ্ধি হয় রে মা ! এসব সেই উদ্দেশ্যে ফাঁদ পাতা রে সুষিমণি আমার !…"

প্রতিবেশিনীরা অবাক্ হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁদের 'নোলায়' যতই জল

ঝকক, তবু বিপদ তাঁদের নয়, সে কেবল ইন্দ্রাণীরই সব। সে যে কি করে, কি বলে—কিছুই ভাবিয়া কূলকিনারা পায় না। বিবাহকালেই সে ইহার পরিচয় জানিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এতই যে বিপন্ন হইতে হইবে, সেটা ঠিক বুঝিতে পারার সুবিধা তখনও হয় নাই। সে-বার সারদা, তার মেয়ে প্রভৃতি থাকায় সর্ব্বতোভাবেই তাহাকে ইহার অধীন হইতে হয় নাই। সকল বিষয়েই এখন একমাত্র ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে দেখিয়া ভয়ে তার অর্দ্ধেক প্রাণ শুকাইয়া গেল।

বিমলেন্দু কয় মাস নিয়তই দিদিমার মুখেমুখে পাখী-পড়ার মত শুনিতেছে,—তার মা না, যে আসিয়াছিল সে 'বৌ', সে বড় দুষ্ট সে উহাকে মারিবে, তার কাছে যেন ও যায় না, তাকে লাঠি দিয়া দমদম করে মারিতে হয় ইত্যাদি।—সেদিন ঝির সঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া সে দেখিল তার জন্য অনেক জিনিষপত্র আসিয়াছে এবং দিদিমার রোদনের ফাঁকে সে তাঁর কূটনীতি বিস্মৃত হইয়া ইন্দ্রাণীর সাদর আহ্বান গ্রহণ করিয়া সেইগুলি সযত্নে সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেল। পূর্ণেন্দু ইন্দ্রাণীকে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া কি একটা বিশেষ কাজে কোথায় গিয়াছিলেন। ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন ব্যাপার বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে বাসন বিছানার স্তূপের মধ্যে ইন্দ্রাণী তখনও পর্য্যন্ত একাকিনী বসিয়া,- আর ঘরের মধ্য হইতে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর চীৎকার শুনা যাইতেছে, "ওরে আমার স্বর্ণমণি কোথায় গেলি রে! ওরে আর যে সহ্য হয় না রে, তোর রাজ্যপাটে ভূতের নৃত্য আর যে দেখতে পারিনে মা।"—তবে স্বরটা কিছু খাদে নামিয়াছে এই পর্য্যন্ত।—পূর্ণেন্দু অত্যন্ত রাগত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "বিমল!"

বিমলেন্দু অদূরে বসিয়া নিজের সদ্য লব্ধ বস্তুজাতের প্রদর্শনী খুলিয়াছিল,—বাপের আহ্বানে সে সকল ছাড়িয়া উঠিতে তাহার চিত্ত সায় দিল না,—সেই-খানে থাকিয়াই সে সাড়া দিল,—"অ্যাঁ?"

রাগে তখন পূর্ণেন্দুর ব্রহ্মরন্ধ্র জলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধের যে উপলক্ষ্য তাহাকে এতটুকু কিছু বলিবার উপায় নাই! কাজেই সেই নিরুপায় ক্রোধের জ্বালা সবটাই নিজের ছেলের উপর বর্ষণ করিয়া সে অসহায় ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, "পাজি! রাস্কেল! ডাকচি তা গ্রাহ্যই হচ্চে না! তুমি ভয়ানক বেয়াদব হয়ে যাচ্চ! আজ যদি না মারের চোটে তোমার আমি সায়েস্তা করি, তাহলে—কি বলেচি—" বলিতে বলিতে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া আসিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া ছেলেকে টানিয়া তুলিতেই সে অত্যন্ত ভয় পাইয়া—"দিদা গো" বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণী আসিয়া পিতার হস্ত মুক্ত করিয়া শিশুকে নিজের বক্ষে তুলিয়া লইয়া পিছন ফিরিয়া দাড়াইল। শিশু তখন গলা জড়াইয়া মুখটাকে খুব জোরে তাহার বুকের ভিতর গুঁজিয়া দিল। —ছোট ছেলেরা ভয় পাইলে আত্মরক্ষার চেষ্টায় শশক-জাতীয় জীবের মত এরূপই করে। পূর্ণেন্দু উহাকে টানিয়া লইতে উদ্যত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "না,—না, ওকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়।—শাসন কর্বার বিশেষ দরকার হয়েচে,—দেখতে পাচ্চো না?"

স্ত্রী এক হাতে ছেলেকে আগলাইয়া অপর হস্তে স্বামীর প্রহারোদ্যত হাত ধরিয়া—বর এবং অভয় প্রদানান্তর শান্ত মধুর স্বরে কহিল, "ওকে কেন মিথ্যে মারতে যাচ্চো? কচি ছেলে ও, ওর কি বুদ্ধি! শাসনে কি ছেলে ভাল করা যায়?"—ততক্ষণে [illegible] বাঘিনার মত দুই চোখ পাকাইয়া বিমলেন্দুর দিদিমা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তীব্র গম্ভীর স্বরে ডাক দিলেন, "দুখে!"

বিমলেন্দু দিদিমার সাড়া পাইয়াই ধড়মড়িয়া মার কোল হইতে নামিয়া পড়িল; এবং ছুটিয়া দিদিমার কোলে উঠিতে গিয়া অস্ফুট ভীত স্বরে বলিল, "বাবা মাল্‌বে—দিদা! পাইনে চ' পাইনে চ'।"

দিদিমা অদূরবর্ত্তী দম্পতির উপরে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিষ-বাষ্পের মত নিঃশ্বাস মোচনপূর্ব্বক কহিলেন,—"ফেলুক, মেরে ফেলুক! যে পথে

তোমার মা গ্যাছে, সেই পথে তুমি গেলেই সব্বাই নিষ্কণ্টক হয়ে রাম-রাজত্ব ভোগ করে, তাই করুক তাই—ঈশ্বর আছেন—" এই বলিয়া কম্পিত অধরে স্খলিত পদে ঘরের দিকে ফিরিলেন।—"বলি হ্যাঁগা! দুটো দিন না হয় দেরিই হতো, —ও তো যেতেই বসেছে, বাঁচবে না, যাবেই,—তবে আমার সাক্ষাতে হাতে করে না মারলে কি আর তোমাদের সুখ পূণ্য হবে না?"

"দেখুন আমি—"

পূর্ণেন্দুর দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে কি একটা কঠিন কথা বলিতে যাইতেই ইন্দ্রাণীর দিক হইতে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে ফিরিয়া দেখিল, ইন্দ্রাণী অস্থির হইয়া উঠিয়া তার ডাগর চোখে প্রবল মিনতি ভরিয়া ব্যাকুল কাতরভাবে দুই হাত যোড় করিল। তার ব্যবহারে পূর্ণেন্দু নিজের আকস্মিক অসংযততায় লজ্জা বোধ করিয়া বাক্য নিরোধ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃই অত্যধিক শান্তি-প্রিয়। মাত্রাতিক্রম না করিলে দাসদাসীর প্রতি কখনো রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করেন না। তবে এই নব-আগন্তুকার এ সংসারে পা দিয়াই এতবড় শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্যেই আজ তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছিল। এখন মনে হইল তাঁর এই অসহিষ্ণুতা এ সংসারে ইহাকে বড় বেশী সাহায্য করিতে পারিবে না, তাঁর মধ্যে সে কর্ত্তৃত্বশক্তি নাই যাহাতে সংসার তরণীর কর্ণ ধারণ করা যায়। যা পারিবে সে এ নিজেই পারিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রাণী স্বামীর ঘর করিতে লাগিল। স-সর্প গৃহে বাস করিতে মানুষ যেমন সশঙ্ক হইয়া থাকে, তেমনি করিয়াই এই তরুণী সদা শঙ্কিত থাকিত, কোন্ সময় তার কোন্ ত্রুটিতে কি'না-জানি ঘটিয়া যায়। দেব-তুষ্টির জন্য মানুষ যদি এমন করিয়া সচেষ্ট থাকে, দেবতা নিশ্চয়ই খুসী হ'ন, কিন্তু মানুষ তো দেবতা নয়, তাই এ অসাধ্য সাধন ইন্দ্রাণীর বহু আরাধনাতেও ঘটিল না— বিমলেন্দুর দিদিমার বিমুখ চিত্ত তাঁর প্রতি এক নিমেষের জন্য উন্মুখ হইল না, তবে প্রথম দিনের ব্যাপারে এইটুকু পরিবর্ত্তন তাঁর ঘটিয়াছিল, ইদানীং তিনি জামাইয়ের সাক্ষাতে চেঁচামেচি কান্নাকাটি বড় একটা করিতেন না,—সম্ভব মত উঁহাকে এড়াইয়াই চলিতেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম নূতন বধূই করিতেন, তবে কি না ভাণ্ডারের এবং সংসারের যা কিছু চাবিতালার ভার সেটা তো বাড়ীর গিন্নীর হাতে থাকাই নিয়ম; তাই ছিল, প্রাণ গেলেও তিনি ওদের হস্তান্তর করিতেন না। একদিন বিমলেন্দুর দিদিমার কোমরে বেদনা হওয়ায় শয্যাগত ছিলেন,—সেদিন বাজার হইতে উঠনা আনিয়া রান্না খাওয়া হইল। রান্না ইন্দ্রাণীই করে,—কিন্তু বিমলের ভাত খাওয়ানো রহিল তার দিদিমার হাতে। বয়সের পক্ষে তার খাদ্যের পরিমাণ ও গুরুপাচ্যতা ইন্দ্রাণীর বিবেককে পীড়া দিতে থাকিলেও প্রতিকার চেষ্টা তার সাধ্যাতীত রহিয়া গেল। একদিন এ সম্বন্ধে মুখ খুলিতে এমন তাড়া খাইল যে, আর কিছু বলিবার বা করিবার ভরসা তার হইল না।—"ওর পেটটা ভাল নেই, ওকে আজ লুচিটা না দিলে হয় না মা?" এই কথার জবাবে বিমলেন্দুর দিদিমা দুই চোখ পাকাইয়া পরুষ কণ্ঠে হাঁক দিলেন, "কোথায় ওর পেট খারাপ হয়েছে বৌ? তুমি তো চব্বিশটি ঘণ্টা

ওর খাওয়া টেঁক্‌চো,—ত্বখানার ওপোর তিনখানা লুচি চাইলেই চম্‌কে ওঠো,—মনে করো আপদটা তোমার সোয়ামীর ধন বুঝি সবই গিলে ফেল্লে! তা, ওরও এতে ভাগ আছে গো,—বিষয় অর্দ্ধেক ওরই নামে লেখাপড়া করা। তবে যদি কানে গুরুমন্তর দিয়ে দিয়ে আদায় করে নাও, সে অবিশ্যি আলাদা।"

শুনিয়া ইন্দ্রাণীর ডাগর দুটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল, আর কোন দিন বিমলের খাওয়ার প্রতিবাদ সে করে নাই। তবে যথাসাধ্য গোপনে গোপনে শিশুর খাদ্যে গুরুপাচ্যতা যতটা কম ঘটে বা বিশুদ্ধ হয়, এ দিকে সে দৃষ্টি না দিয়া পারিত না।

বিমলেন্দু মা জানে না,—দিদিমার কাছে সে ঋণী হইলেও সে ঋণ মাতৃঋণ নয়,—সেখান হইতে সে যা পায় তাহাকে মাতৃস্নেহ বলা যায় না। দিদিমা মঙ্গলাদেবী অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। এক একজন লোক ভালো কথাটাকেও মন্দ করিয়া বলে, হাসিলেও মনে হয় রাগ করিয়াছে,—বিমলের দিদিমার সেই প্রকৃতি। ইন্দ্রাণীকে তিনি না হয় দেখিতে পারেন না, কিন্তু বিমলকে তো খুবই পারেন, অথচ তার বিরাগ এবং অনুরাগ এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝা খুব কঠিন। ইন্দ্রাণীকে তিনি উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে চোখা চোখা বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিয়া রাখেন—সে তার প্রতি বিদ্বেষে,—আবার বিমলের ভাগ্যে শুধু বাক্যবাণই নয়, গাল টেপা কিল চড় ভাল ভাবেই লাভ হয়, সে তার একমাত্র আপন জন এই অজুহাতে। যে সব ক্রোধ পরের উপর মিটানো যায় না, সেই বিদ্বেষের জ্বালা তার উপর দিয়া অগত্যাই মিটাইতে হয়। এর পরিমাণটাও নেহাৎ কম না থাকায় শাস্তির মাপটাও সামান্য হইত না। কিন্তু—'তার নিজের ছাগল তিনি যদি ল্যাজের দিক দিয়াই কাটেন'—অন্যের পক্ষে তাই বলিয়া বিমলকে তুমি ভিন্ন তুই বলিবারও উপায় নাই। পূর্ণেন্দু তো ওর নাগালই পান না, পাছে—বাপের বশ হইয়া দিদিমাকে অপ্রয়োজনীয় বোধ করে, এই ভয়ে বিমলেন্দুর বাপের কোলের অধিকার কোন

দিনই ছিল না। আজও ইন্দ্রাণীকে লইয়া সেই লড়াই-ই চলিতেছে,—অথচ বাহিরে—এমন কি বিমলেন্দুর দিদিমার নিজের কাছেও বাপের নির্লিপ্ততা এবং বিমাতার নির্ম্মমতাই ছেলের পক্ষে তাঁর আশ্রয় গ্রহণের একমাত্র হেতু,—এই কথাই প্রচারিত। অপরকে এবং মধ্যে মধ্যে আর কেহ না থাকিলে হয়ত বা ঘরের দেওয়ালগুলাকেও অন্ততঃ শুনাইয়া-শুনাইয়া বিনাইয়া-বিনাইয়া কান্নার সুরে বলিতে থাকেন, "মা ছুঁড়ি মরে গেল,—বাপ একটি দিনের তরেও চক্ষু মেলে চেয়ে দেখ্লে না,—না এলো, না দেখে,—কি করি বলো! বলি যে, থাক্লে তো আমারই সুখির নামটুকু বজায় থাক্বে, আর কার কি, এই '[illegible]' যে মর্তে মর্তে চব্বিশটা ঘণ্টা ছেলে ধর্ছি,—তা যদি ওর কেউ মাসি পিসি যত্ন করবার কোথাও একটা থাকত। তাহলে কি আর এই বাতের ব্যথায় অষ্টাবক্র মুনি হয়ে এমন করে খেটে মরি—কে' ওর আছে, কা'কেই-বা ওকে দিই,—মরবারও আমার উপায় নেই।"

অথচ ইন্দ্রাণী এই কথায় অপ্রতিভের একশেষ হইয়া রান্না বা কুটনা কোটা ফেলিয়া, ছুটিয়া ছেলে লইতে আসিলে ভীমরুলের চাকের মত মুখ করিয়া বিনুর-দিদিমা ঝঙ্কার তোলেন, "যাও গো যাও,—ঢের দেখেছি—আর দেখাতে হবে না। বলে,—'যেচে সোহাগ, আর'·········সে বেশিক্ষণ চলে না গো! বাছা চলে না। হুঁঃ।"

বিমলের কাপড় পরানো, স্নান করানো, তার কান্না আব্দারের সকল তালই ক্রমে ইন্দ্রাণীর ঘাড়ে পড়িল। খাওয়ানো তাকে সহজ কাণ্ড নয়,—কান্না, রাগ,—ভাত ছড়াইয়া ফেলা, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া উচ্চ চীৎকার,—খাইতে বসিয়া এম্‌নি সব উপদ্রবে সে ত্রস্তব্যস্ত করিয়া তোলে। বিমলেন্দুর দিদিমা, যতক্ষণ ধৈর্য্য থাকে তোষামোদ করিয়া শেষে যখন কিছুতেই রাগ মানাইতে পারেন না, তখন চড় কিল চালাইয়া ছেলেকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়া যান।—তার পরেও বহুক্ষণ দিদিমা-নাতির যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইন্দ্রাণী প্রবল

ইচ্ছা দমন পূর্ব্বক আড়ষ্ট হইয়া থাকে,—এদের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না!

সেদিন দু-বেলাই এম্‌নি হইল। সারাদিনে বিমলেন্দুর পেটে এতটুকু খাদ্য গেল না, আব্দার সহিয়া এবং সহাইয়া ছেলের দিদিমা উহার ইহকালটি ঝরঝরে করিয়া তুলিতেছিলেন, এখন নিজের সৃষ্টি-করা, দুর্দ্দান্ত শিশু লইয়া নিজেই ফাঁপরে পড়িয়াছেন,—আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। সেদিন সাহসে ভর করিয়া ইন্দ্রাণী আসিয়া বলিল, "আমি একবার দেখ্‌বো মা?"

বিমলেন্দুর দিদিমা অসহায় ভাবে রাগিয়া ছিলেন,—উপায় পাইয়া অগ্নিবৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তোমার সে দেখ্‌বার ফুরসুৎ কোথায় যে দেখ্‌বে বাছা! ঐ'ত আর কপালে টিপ কেটে ঠোঁটে রং মেখে আমার ভ্যাড়াকান্ত জামাইয়ের কাছে-সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করা নয়!"—ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের রংটাই আলতা-মাখার মত লাল, কিন্তু মঙ্গলাদেবী সে-কথা আদৌ বিশ্বাস করেন না, তাঁর বিশ্বাস, সৌখীন মেয়ে ইন্দ্রাণী স্বামীকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য চুপি চুপি ঠোঁটে রং লাগাইয়া রাখে। এরা কত রকমই জানে!

ইন্দ্রাণী ডাগর চোখ নত করিয়া একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর বিমলেন্দুর কাছে বসিয়া পড়িয়া শান্ত মিষ্ট স্বরে তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। মুখে হাতে বুকে পেটে সর্ব্বত্র ভাত মাখা। দিদিমার গালে পিঠে সেই ভাত মাখানো হাতে যত পারিয়াছে চড়াইয়া দিয়া নিজের স্নাত অঙ্গে এখন যতদূর সম্ভব ধূলি মাখাইতেছে। ইন্দ্রাণী তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিতে গেলে হিংস্র জন্তুর মত ক্রোধে গর্জ্জিয়া সে তাহাকে আক্রমণ করিল। দুই হাতে তার চুলের মুঠি ধরিয়া দাঁত দিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া নখ দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, "দুষ্টু ছেলে! তুই দূর হ'য়ে চলে যা'— পাজি ছেলে! তুই পালিয়ে যা', তুই চলে-যা' না, তুই যা' না!"

ইন্দ্রাণী নিজেকে তার আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টামাত্র না করিয়া, তার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিযা বলিতে লাগিল, "আচ্ছা, আমি পালিযে যাচ্চি, তুমি চুপ করে লক্ষ্মী হ'য়ে ভাত খাও,—ধন আমাব! গোপাল আমার! দেখ্ দেখি,—জামা-কাপড সব নোংরা হ'য়ে গেল, এক্ষণি ওবাড়ীর বিশু মণি সব্বাই এসে দেখতে পাবে, নিন্দে কববে,—ছিঃ, অমন করে কি!"

বিমলেন্দু পাগলেব মত চোখ বুজিযা দু হাতে কিল চড বর্ষণ করিতে কবিতে, দুই পাযে দমাদম লাথি ছুঁডিতে ছুঁডিতে, পূর্ব্বেব মতই এলোমেলো চীৎকাব কবিতে লাগিল, "তুই চলে যা, তুই চলে যা,—তুই আমায মার্ব্বি, আমায় কাম্‌লাবি, তুই রাক্ষসী, তুই চলে যা! তুই যা না।"

রান্নাঘবেব ঝি ক্ষেন্তি ধোযা বাসন দেওযালেব গাযে কাৎ কবিযা রাখিতেছিল। জিভ্ কাটিযা বলিযা উঠিল, "ওকি গো খোকা বাবু! অমন কথা কি মুখে এনো নি। উনি তোমাব মা হচ্চেন—মাকে কি বাক্ষসী বল্‌তে আছে?"

বিমলেন্দু আবও জোবে গর্জ্জিযা উঠিল, "মা, না, রাক্ষুসী, রাক্ষুসী,—ও আমায আঁচলাবে, কামলাবে,—"

বিমলেন্দুব দিদিমা সর্ব্বাঙ্গে 'সখ্‌ড়ি' মাখিতে হওযায নাতিব উপরে ভীষণ ভাবে চটিযাছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাণীব দুববস্থা তাঁহাকেও অতিক্রম কবান এক্ষণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইযা উঠিযাছেন, বিশেষতঃ বিমলেন্দুব শেষ মন্তব্যটা তাঁহাকে এতই প্রীত করিল যে ততটা হর্ষোচ্ছ্বাস দমিত বাখা তাঁব পক্ষে সম্ভব ছিল না। হি হি কবিযা হাসিয়া, তিনি নিজেব আনন্দে নিজেই গড়াইয়া পড়িলেন। হাসিতে বেদম হইযা বলিতে লাগিলেন, "ওমা, ছেলেব একবার কথা শোন! বলে কি না 'ওকে কামডাবে!' হ্যাঁ বে, ও কি কুকুর না বাঁদর, যে আঁচডাবে, কামড়াবে তোকে? হ্যাঁ বে, ও কি তোকে কোনদিন কামড়েছে না কি রে? কি যে তুই বলিস্ বিমু! হাসিয়ে হাসিয়ে পেটেব নাড়িভুঁড়ি পর্য্যন্ত ছিঁড়ে দিস্!—"

ইন্দ্রাণী বিপর্য্যস্ত হইযা উঠিযা কি কবিবে কুলকিনাবা পাইতেছিল না; না উহাকে ছাডিযা যাইতে পারে, না পাবে কিছু কবিতে। বিমলেন্দু সমান উন্মত্ত ঝোঁকে লাথি ও গালি বর্ষণ কবিযা চলিযাছে, আব তাব দিদিমা পবম পবিতোষের হাস্যে একেবাবে ভাঙ্গিযা ভাঙ্গিযা পডিতেছেন,—"ওমা, ছেলেব কথা শোন। বলে কি না, 'তুই বাঁদল, তুই কুকুল, তুই যা, তুই আমায মেলে ফেল্‌বি,'—ওমা কি ছেলে গো! কেউ তো বাবু শেখাযনি,—এ সব ও জান্‌লে কোত্থেকে? ওমা, কি বুদ্ধি দেখ। ...."

পিছনে কখন জুতা-পাযেব শব্দ হইযাছিল,—দিদিমা নাতিব হাসি কান্নার দাপটে উহা কাহাবও শ্রুতিগোচব হয নাই, একেবাবে ঠিক পিঠেব কাছেই গম্ভীব ধ্বনি শুনা গেল, "শেখাস বই কি,—না শেখালে এত বড হতভাগা ও জ্যাঠা হ'যে উঠ্‌তো না।"

ইন্দ্রাণী চমকিযা ঘোমটা টানিল। মঙ্গলা ঠাকুবাণী ধনুকেব ছিলাব মতন ছিটকাইয়া উঠিযা জামাইযেব দিকে ফিবিলেন, "তা' হ'লে আমিই তোমার ছেলেকে খাবাপ কবে দিচ্চি, কেমন না?"

পূর্ণেন্দু অত্যন্ত বাগিযাছিলেন—ভূমি হইতে ছেলেকে কঠিন হস্তে টানিযা তুলিতে তুলিতে পরুষ কণ্ঠে কহিলেন, "নাই বা বলি কি করে?"—এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলের পিঠে প্রবল চপেটাঘাত কবিলেন—"পাজি ছেলে! ও বাঁদব, ও কুকুর, ও তোমায মেবে ফেল্‌বে, না? বার কর্‌ছি বেযাদবি,—বদমাসেব ধাড়ি হচ্চেন দিনকেব দিন।"

বিমল পৃথিবীব মধ্যে বাপকেই যা একটুখানি ভয করে, কিন্তু যখন সে ক্ষেপিযা উঠে তখন ভয় ডব তাব মধ্যে কিছুই থাকে না, মার খাইয়া নিজের খেয়ালেই চেঁচাইতে লাগিল, "হ্যাঁ ও লাক্কুসী,—ও লাক্কুসী, ও মা নয, ও লাক্কুসী,—দিদা বলেচে, ও দাইনী—ও—"

বিমলেন্দুর দিদিমা বলিলেন, "তা' হ'লে তো আমার আর এখানে না

থাকাই উচিত! তোমাদেব মন্দ কর্‌বার জন্যে তোমাদেরই অন্ন ধ্বংস করে তো তা' হ'লে আমার থাকা সঙ্গত নয়।"

ইন্দ্রাণীব দিকে মুখ ফিবাইযা বলিলেন, "তোমার ঘব-সংসার দেখে শুনে নিযে আমায ছুটী দিযে দাওসে' বাছা,—আমি আজই বাণাঘাট চলে যাই। কারুব লোকসান আমি কর্‌তে চাইনে, আমাব সে স্বভাব নয।"

প্রচণ্ড বাগেব মাথায় জন্মেব মধ্যে এই একবাবটি মাত্র মঙ্গলা ঠাকুবাণী তাঁর পরলোকগতা কন্যাব ঘব-সংসাবকে ইন্দ্রাণীব বলিযা স্বীকাব কবিযা ফেলিলেন,—অবশ্য ইহাব পব বাবান্তবে আব কখনই এমন ভুল তিনি করেন নাই,—এই বলিযা, সিপাহীরা যেমন চালে পা ফেলিযা 'মার্চ্চ' কবিযা যায, তেমনি কাবয়া লম্বা লম্বা,—অথচ পিছনে কি মন্তব্য হয শোনাব আগ্রহে বিলম্বিত চবণ-ক্ষেপে—তিনি ঘবেব মধ্যে চলিযা গেলে, ইন্দ্রাণী স্বামীব কাছে সরিয়া আসিয়া সভয়ে কহিযা উঠিল, "ভাল কর্‌লে না, যদি উনি চলে যান—"

পূর্ণেন্দু ছেলেকে লইযা ধস্তাধস্তি কবিতেছিলেন। মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ,—কড়া স্থবে জবাব দিলে, "যান যাবেন, ভযটা কিসেব শুনি?"

ইন্দ্রাণী জিভ কাটিযা বলিল, "ছিঃ! অমন কথা বলো না, আমাদেব গুরুজন, এতদিন ধবে বিমুকে আমাদেব মানুষ কবেছেন,—ওঁবই বা এ সংসারে কে আছে?"

"মানুষ না ছাই কবেছেন, বাঁদব তৈবি করেছেন ছেলেকে। বিমল! শীগ্‌গিব চুপ করো, না হ'লে আজ তোমায আমি মেবেই ফেল্‌বো।"

ইতঃমধ্যে ঘবেব মধ্য হইতে উচ্চ রোদন রোল উঠিল, "ও—স্থষি মা রে আমাব! আজ তুই কোথায বে মা! তুই যে পায়ে ধবে মাকে এনে ছেলে দিযে গেছ্‌লি বে মা। সেই ছেলে ডাইনী এসে আমাব বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে গো মা! ওমা, এ ভালখাকি ডাইনীর হাতে তোব সর্ব্বস্ব ধন সঁপে দিয়ে আজ আমি উদাসী হ'যে ফিরে চল্লুম বে, মা!"—ইত্যাদি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রাণী আসিযা একান্ত মিনতি ভরে কহিল, "দেখ, তুমি একবাবটি ওঁকে নিজে গিযে বলো।"

পূর্ণেন্দু স্থিবকণ্ঠে জবাব দিলেন, "আমি বল্‌বো না।"

ইন্দ্রাণী কহিল, "দেখ, এতে বড অপরাধ হবে আমাদের।"

পূর্ণেন্দু কহিলেন, "আমার তা' মনে হয না।"

ইন্দ্রাণী বিস্মযেব সহিত কহিল, "বলো কি? গুরুজন যদি এমন কবে চোখেব জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বাডী ছেডে চলে যান, তা'হলেও কি—"

পূর্ণেন্দু সংযত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "গুরুজনকে তো কেউ চলে যেতে বলে নি, তিনি যদি ভালতে মন্দ টেনে আনেন, সে অপবাধেব ভাগী আমি হবো কিজন্যে?"

ইন্দ্রাণী তথাপি বুঝিতে চাহে না, কহিল, "তিনি তো তাই মনে করেই অভিমান করছেন।"

"তিনি তো অনেক বকম অদ্ভুত কল্পনা কবেই থাকেন। তাঁব 'মনে করা'ব সঙ্গে যদি তাল দিয়ে চল্‌তে হয, তাহ'লে তাঁব বদলে আমিই না হয বাডী ছাড়ি?"

ইন্দ্রাণী অগত্যা নিঃশব্দে সরিযা গেল; কিন্তু আবার তখনি আসিযা বলিল, "দেখ, উনি বাক্স-টাক্স সব গুছোচ্ছেন,—সত্যিই হয ত চলে যাবেন,—এখনও তুমি একবার—লক্ষ্মীটি! দুটি পাযে পড়ি, একটিবার গিযে,—প্রণাম করে বলো,—'রাগেব মাথায অন্যায় করে ফেলেছি,—আপনি মা,'—দেখ, লক্ষ্মীটি! না—না, রেগে উঠো না। তা'তে দোষ কি? সত্যিই তো উনি

মা,—ওঁর মনে কি কষ্ট দিতে আছে? এ বল্‌তে দোষ কি?"

পূর্ণেন্দু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল একদিকে চাহিয়া থাকিলেন। পরে সংযত হইয়া স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। পায়ের গোড়ায় নতজানু স্ত্রীর মাথাটা নিজের জানুর উপর চাপিয়া ধরিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি তোমায় বুদ্ধিমতী বলেই জানতুম, কিন্তু দেখ্‌চি তুমি একেবারেই বোকা।"—বলিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

ইন্দ্রাণীকে যে এ বাড়ীতে আসিয়া কতখানি সহিতে হয় তাহা উঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

ইন্দ্রাণী স্বামীর মন নরম হইয়াছে বুঝিয়া স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক মন্দ-মধুর হাস্য করিয়া কহিল, "তা হোক—আমি যেন বোকাই থাকি,—তুমি চলো।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর হাত ধরিয়া টানিল।

পূর্ণেন্দু তখনও চিত্ত স্থির করিতে পারেন নাই, হাত ছাড়াইয়া লইয়া সংশয়ের সহিত কহিলেন, "তুমি বুঝতে পারচো না; উনি কিন্তু গেলেই ভাল হতো ইন্দু!"

ইন্দ্রাণী শিহরিয়া জিভ কাটিয়া জবাব দিল, "ছিঃ। নাঃ!"

"তোমার আমার ভালর কথা আমি বল্‌ছিনে, সে না হয় চুলোয় যাক,—বিমলের পক্ষেই ভাল হতো,—সেই কথাই আমি বল্‌চি। উনি থাক্‌তে ওর মানুষ হবার বিন্দুমাত্র ভরসা নেই—সে কি তুমি সত্যিই বোঝ না ইন্দ্রা?"

ইন্দ্রাণী মাটির পানে চোখ করিয়া নীরব রহিল। স্বামীর চোখের দিকে চাহিতে সে কিছুক্ষণ সাহস পাইল না; যেহেতু, যুক্তি তার যে অকাট্য ইহা অনস্বীকার্য্য। কিছুক্ষণ অতীত হইয়া গেলে, তার পর আবার মনে একটু বল সংগ্রহ করিয়া বলিতে চেষ্টা করিল, "কিন্তু—"

পূর্ণেন্দু বাধা দিলেন; কহিলেন, "হুঁ, আমি জানি সে 'কিন্তু' কি! —বেশ, যার ভাগ্যে যা' আছে, হয় তো 'তা' কেউ খণ্ডাতে পারে না। ওঁকে

আমি থাকতেই অনুবোধ কববো। আব তা' না করলেই যে উনি চলে যেতেন,—এমনও আমাব আশা ছিল না। অত ভয় তুমি না করলেও পারতে।"

এমনি কবিয়াই দিন কাটিতে লাগিল। মঙ্গলা-ঠাকুবাণী জামাইএব অনুরোধ বক্ষার্থ এই যে বহিয়া গেলেন, এব পব তাঁব অবস্থানসঙ্কট সকলকেই আবও একটু ভাল কবিয়াই ভোগ কবিতে হইতে লাগিল। তাঁব এই থাকাব মধ্যেব সমুদায়টাই যে পবার্থ--ইহা তো তাঁব এ বাটীতে প্রবেশেব পব হইতে গৃহবাসী এবং প্রতিবেশী উঠিতে বসিতে শুনিতেছিল,—এখন আবার তাবও উপর আবও একটু পবার্থ-পবতাব প্রলেপ পড়ায় সে এক বিষম ব্যাপাব হইল।

বিশেষ কবিয়া ইন্দ্রাণীব উপবই ইহাব সমস্ত তালটি পড়িতে লাগিল, তাঁকে যে তাঁব পূর্ব্ব-জামাতা স্বেচ্ছায় থাকিতে বলে নাই এবং যেটুকু তাঁব মুখ দিয়া বাহিব হইযাছিল তাহা বাহিব করাইবাব জন্য তাঁব শত্রু-সম্বন্ধীযা ঐ মেযেটিকে যে কতখানি বেগ পাইতে হইযাছিল, তাহাব খানিকটা নিজেব তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তির সাহায্যে ও কতকটা মানব-চবিত্রে অভিজ্ঞতাব বলে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিযাছিলেন। বুঝিতে পাবিয়াছিলেন বলিযাই উহাব প্রতি বিদ্বেষেব মাত্রা আবও একটু বাড়িযা গিযাছিল। মন বিদ্বেষের আগুনে তাতিযা লাল হইযা উঠিযা এই কথা বলিতেছিল "আহা, কি আমাব পাদবী সাহেব! অতবড় জোয়ান-মর্দ্দটা রেগে অজ্ঞান হযে রযেছে, প্রাণে এতটুকু ভয ডবও নেই, সামনে এগোয কেমন কবে?"—এবং উহারই কৃপা লইযা থাকিতে হওয়ায় সেটাকে 'ব্যাংএব লাথিব' তুলনা স্বতঃই মনে আসিতে থাকায উহাব উপরে অত্যন্ত কড়া ব্যবহাবে এই প্রমাণ করিতে হইতে লাগিল যে, বাস্তবিক তিনি উহার চাইতে ছোট নহেন এবং এ বাড়ীতে উহার চেয়ে তাঁহারই প্রয়োজনীয়তা অধিক।

বিমলেন্দুকে কোন দিনই বাপের সংসর্গে আসিতে দেওয়া হয় নাই বরং বিশেষ সাবধানতা সহকারেই বাপের সান্নিধ্য হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহার ভিতর যে কূট-নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্রাণীকেও ঐ একই উদ্দেশ্যে দূরে ঠেলিয়া রাখা হয়, কিন্তু বাপকে ঠেলা দিতেই তিনি যেমন দূরে সরিয়া গিয়াছেন, ইহাকে ঠিক তেমন করিয়া সরান গেল না। মঙ্গলাদেবী কর্ম্মিষ্ঠা নহেন, তার উপর বয়সও হইয়াছে, কাজেই ইন্দ্রাণী যখন তাঁর পোষ্যটির সকল কাজ করিয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, তাড়াইলেও বিদায় হয় না তখন অগত্যা অনেকটাই তাঁর হস্ত স্খলিত হইয়া উহার হাতে আসিয়া পড়া অনিবার্য্য হইল। শিশুর উপর তাঁর অখণ্ড অধিকার খর্ব্ব হইতেছে বুঝিতে পারিলেও কতকটা আলস্যে এবং অনেকটা এই লজ্জা-পিত্তবিহীনা বেহায়া মেয়েটার প্রকৃতি চিনিয়া লইয়া তিনি ইদানীং আর কড়াক্কড়ির ফাঁসটাতে খুব বেশি টান দিলেন না। বিশেষতঃ তাঁর কূট-নৈতিক মন বলিল,—যদি ছেলেটাকে শিখাইয়া পড়াইয়া তার মনটাকে নিজের দিকে টানিয়া রাখা যায় অথচ তার জন্য যেকিছু খাটুনি সেটা সৎমার ঘাড় দিয়া আদায় হয় ত, সে মন্দ কি?

একদিন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয় হয়,—মঙ্গলা ঠাকুরাণী পদ্মবীজের মালায় বার কয়েক ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া উহা ভাণ্ডার-ঘরের হুকে টাঙ্গাইয়া দিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়া—বোধ করি গোটা কয়েক সন্দেশই খাইতেছিলেন। সন্ধ্যার পর একটু জল খাওয়া তাঁর অভ্যাস, কিন্তু এ বয়সে এমন সময়ে খাওয়াটাকে তিনি একটু লজ্জাকর বলিয়াই মনে করিতেন, অথবা অন্য কি কারণ ছিল বলা যায় না,—এ কার্য্যটাকে তিনি গোপনীয়ের মধ্যেই ফেলিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাণীও এ খবর জানিত, কিন্তু সকলেই না জানার ভান করিয়া চলিত।— না চলিলে অবশ্য রক্ষা ছিল না।—ক্ষ্যান্ত দু-একদিন ইন্দ্রাণীর কাছে এ লইয়া

দু-একটা হাসি তামাসা করিতে গিয়া ভৎর্সিত হইয়া নিরুৎসাহে নীরব হইয়া গিয়াছে।

আজ ইন্দ্রাণীর বাপের বাড়ী হইতে রথের তত্ত্ব আসিয়াছিল। বড় বড় গুপো সন্দেশ কয়েকখানাই তখন বিমলেন্দুর দিদিমার হাতে। মুখের মধ্যেও প্রায় পুরাপুরি একখানা প্রবিষ্ট হইয়াছে, এমন সময় বিমলেন্দু ঝির সহিত বেড়াইয়া ফিরিল এবং ছুটিয়া ভাঁড়ার-ঘরের দ্বারের কাছে যাইয়া হাঁকিল, "দিদা! দিদা!—দিদা গো!"

"কি?" বলিয়া যে উত্তর দিবেন, দিদিমার এখন সে ক্ষমতাও নাই। বিমলের বাড়ী ফেরার সাড়া পাইয়াই তিনি বিশেষ একটু তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে মনোযোগী হইয়াছেন, মুখের গহ্বরটা সমস্তই সন্দেশে পূর্ণ,—এমন ছেলে সে নয়,—এখনই হয়ত ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে এবং তাঁর দুরবস্থা বুঝিতেও তার বাকি থাকিবে না।—এম্‌নি বেফাঁস প্রশ্ন করিতে থাকিবে সে সব অন্যের কানে গেলেও যাইতে পারে, আর নাও যদি যায়,—তাঁর নিজের কানও ইহার মুখ হইতে সে সব কথা শুনিতে রাজী নয়! কিন্তু 'হুঁ হুঁ' ধ্বনিতে তাড়না করা সত্ত্বেও সে সেই ধূলামাখা জুতা-পা সুদ্ধ ছুটিয়া ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং দিদিমার 'হুঁ হুঁ হুঁ,'—ও 'হাঁ হাঁ হাঁ,' রূপ তীব্র নিষেধ আপত্তি না মানিয়াই তাঁর বস্ত্রাবৃত হাতখানা চট্ করিয়া টানিয়া লইয়া হস্তধৃত সন্দেশের প্রতি নজর পড়িতেই চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল,—"তুমি অত বল বল তন্দেত. কাও, আল আমায় এত্তুকু দিলে ক্যান?" বলিতে বলিতে হাত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া খানিকটা মুখে পুরিয়া দিল।

মঙ্গলাদেবী ততক্ষণে মুখের সন্দেশটাকে কতকটা 'জব্দ'র মধ্যে আনিয়াছেন নাতির মন্তব্যে ও কাণ্ডে একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষণ হুঙ্কারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"মালা জপ্‌চি,—বেড়ান কাপড়ে ছেলে এসে ছুঁয়ে দিলে, ওকে দেখবার কি কেউ কোত্থাও নেই রে? সব্বাই কি মরে গ্যাচে?"

ঠিক এমন সময় ক্ষ্যান্ত-ঝি দোরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড কল্পনা করিয়াই বিমলেন্দুকে ডাক দিয়া বলিল, "খোকাবাবু! এসো দাদা! বর যাচ্ছে দেখে আসিগে,—চট্ করে এসো বাবু! এক্ষণি চলে যাবে।"

বিমলেন্দু দারুণ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল, "যাঃ,—আমি এখন দিদার থঙ্গে তন্দেত্ খাত্তি। দিদা! তুমি আল্ কেঁও না,—ওতাও আমায় দিয়ে দাও।"

বিমলেন্দুর দিদিমা যদি না অমন ভীষণ ভাবে রাগিয়া উঠিতেন, তাহা হইলে এটাকে পরিহাসের হিসাবেও ধরিয়া লইয়া নিজের সাফাই গাওয়া চলিত, কিন্তু তখন তিনি ধরা পড়িয়া নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন,—বিশেষ ক্ষ্যান্ত অমন নিঃশব্দে আসিয়া সামনে দাঁড়ানোয় রাগটা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁর মুখ হয় ত তখনও একটু একটু নড়িতেছিল,—"কি,—কি!" গর্জ্জিয়া উঠিয়া তিনি নির্দ্দয়ভাবে বিমলের গাল টিপিয়া দিলেন—"পোড়ারমুখো ছেলের চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শুন্‌লে সর্ব্বশরীরে যেন বিষ ছড়িয়ে দ্যায়! কখন আমায় সন্দেশ খেতে দেখলি রে, অলুক্ষুণে? এই তো সবে মালাটি রেখেছি, বলি কি, বলি কি, যে—"

বিমলও রাগিয়াছিল,—রাগিলে সেও দিদিমার মতই ভীষণ হইয়া উঠে, শাসিত হইয়াও সে কাঁদিল না, কেশর-ফুলান সিংহশিশুর মত ফুলিতে ফুলিতে তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল,—"কাচ্চিলে তো! দুতো তিনতে এতো তন্দেত্ কাচ্চিলে না,—হাঁ কলো তো—"

ক্ষ্যান্তর তখন বেদম হাসি পাইয়াছে। কোন মতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে ছাড়াছাড়া ভাবে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "ঐ বর চলে গেল! কত বাজনা, কত বাজি, কত রোস্‌নি করে যাচ্ছে,—এসো না তোমায় দেখিয়ে আনি, বাবু—"

বিমলেন্দু প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "যা মিত্যে কতা! বল্

তো বাদনা নেই কেন? কই, আছে? শুনতে পাচ্চি না? দিদা, আমাণ
তোমাল ঐ তন্দেত একৃতা দাও? আমি কাবো, খুব ভাযো তন্দেত!"

ইন্দ্রাণী সেদিন এদিকে ছিল না,—উনান তখনও ধবে নাই দেখিযা সে উপবে চলিযা গিযাছিল। একখানা চওডা লালপাড সাডী ও ছেঁডা সাডীব লালপাড বসান হাত-কাটা একটি জ্যাকেট পবিযা একদিন স্বামীব নিকট একটু-খানি উপবি আদব পাইযাছিল।—ঐ সাজটিব জন্যই বিশেষ কবিযা যে সৌন্দর্য্যটুকু সে দিন সেই রূপ-মুগ্ধেব নেত্রে মোহন স্বপ্ন বচনা কবিযাছিল,—তাহাবই উদ্বোধন। আজ প্রায় দুই সপ্তাহ পবে পূর্ণেন্দু ঘবে ফিবিবেন, ইন্দ্রাণীব দিন-গনেবব বুভুক্ষিত মন তাই বুঝি পাওনাব অতিবিক্ত আবও একটা উপবি-পাওনাব লোভে ভিতবে ভিতবে লুব্ধ হইযা উঠিযাছিল। তাই আজ বৈকালেব বেশ-ভূষায গোপনে গোপনে একটুখানি আডম্বব না কবিযা সে যেন থাকিতে পাবে নাই। এসব ছোট খাট জিনিষ এ বাডীতে আদৌ উপেক্ষিত হইবাব নয, এ কথা ইন্দ্রাণীব যেমন জানা আছে, আবাব এই বকমেবই এতটুকু একটু-খানি খুঁটি-নাটীতেই সেই এক স্বপ্ন-মুগ্ধেব তরুণ হৃদযে সুখ-নন্দন বচনা কবা যায এ খববটাও তাব তেমনই কবিযাই যে জানা! ঐ গৃহ-সুখহীন লোকটিব পক্ষে মমতা কবিবাব এত বেশী কাবণ বর্ত্তমান যে, নিজেকে অনেকখানি দুঃখ দিযাও তাঁব এতটুকু তৃপ্তিকে উপেক্ষা কবা তাব সাধ্যাতীত।

আজ স্বামীব আগমন প্রতীক্ষায তাঁব প্রিয সাজটিতে নিজেকে সাজাইযা আরসীর সামনে গৌব ললাট সিন্দুব-বিন্দুতে শোভিত করিতেছিল, এমন সময নীচে বিমলেন্দুব কান্না ও তস্ত-দিদিমাব তর্জ্জন শব্দে প্রসাধন ফেলিযা দ্রুত নামিযা আসিল।

ক্ষ্যান্ত-ঝি হাসিতে হাসিতে গলিযা পডিযা যখন তাহাকে ব্যাপারটা বলিতেছিল,—লজ্জায ভয়ে ইন্দ্রাণীব বুকের মধ্যে সে সময়ে সমুদ্র-মন্থন চলিতেছে বোধ হইল। ভযটা নিজের জন্য এবং লজ্জাটা উহার দুর্ব্বলতায,—

দাসী-চাকরেরাও এ লইয়া আড়ালে হাসাহাসি করে। সে ক্ষ্যান্তকে ক্ষান্ত করিবার জন্য বারংবার মৃদু আপত্তিও তুলিয়াছিল; কিন্তু এমন মুখ-রোচক আলোচনা ত্যাগ করিতে ক্ষ্যান্ত কেন সম্মত হইবে? সে রান্নাঘরের দরজা চাপিয়া বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া অথচ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে বলিতে লাগিল, "ও মা! হেঁই মা!—কি বল্‌বো তোমায় মা!—সে মুখের মধ্যের অগস্তব গরাস—সে কি গিলবো বল্লেই গেলা যায়! আমি ভয়ে মরি মা—বলি কি, সাঁজ-সন্ধেবেলা ভদ্দলোকের মেয়ে বুঝি সন্দেশ বুকে বেধে শ্রী-হত্যেই বা হয়ে যান! আর ছেলেকেও বলি বাবু বলিহারী! সে সেই মুঠো-ধরা সন্দেশ-শুদ্ধ হাত না চেপে ধরে, কি কাণ্ডই যে বাধিয়ে দিলে, বলে 'তুমি কত খাবে? আর খেও না,—আমায় দাও'। তা' মা তোমায় বল্‌বো কি,—মাগীর যা' রাগ,—রাগে মাথার ঠিক পর্য্যন্ত নেই। সন্দেশের তালটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিলে,—তা'পর—'বৌকে খেতে দেবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলুম! হতভাগা ছেলের কথা শুন্‌লে লোকে মনেই বা করবে কি? মাগো, কি রাক্ষস ছেলেই সৃষির হলো'!—আরও কত কথাই হাউ-মাউ করে বল্‌তে বল্‌তে ঘর থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে গেল। আমিও বাঁচলুম মা!—খোকা বাবুকে কোলে নিয়ে ছুটে বাইরে চলে গিয়ে হেঁসে হেঁসে আর বাঁচি নে!"

বলিতে বলিতে আবার সে বেদম হইয়া হাসিতে লাগিল। ইন্দ্রাণী নিষেধ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে পিছন ফিরিয়া বসিল।

"হ্যাঁ লা! সন্ধেবেলা অত হাসি কি জন্য? আ মর্ মাগি! বলি-পোড়া মুখে কেউ একটু আগুন ধরিয়ে দিতে পারে না?"—বলিয়া দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া মঙ্গলাদেবী চোখের দৃষ্টিতেই বোধ করি 'আগুন দেওয়ার' কাজটা সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন।

মুহূর্ত্তে ভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিয়া ক্ষ্যান্তর সমস্ত হাসি খুসী চলিয়া গিয়াছিল,

কিন্তু হাসি জিনিসটা যেন ঝরণার জলের মত,—ঝরিতে আরম্ভ করিলে সহজে তাকে থামান যায় না, সে হাসি চাপিতে গিযা পুনশ্চ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিযা কৈফিযতের হিসাবে যা' না' তা' কিছু একটা টানিযা আনিযা দাখিল কবিল ; বলিল,—"বাবামশাই আজ ঘরে আস্‌বেন কি না,—তাই মা ঠাক্‌রুণের সাজ দেখে হাঁসতিছি দিদিমা ! বলি,—আহা, দেখ দেখি কেমনটি সেজেছে ! কথায় বলে 'এ' না চন্নন কে'না পবে, কপাল গুণে চন্নন ঝলমল করে' !" ইহাতে যে হাসির কি থাকা সম্ভব,—তাহা কেহ বুঝুক না বুঝুক, সে তো অবাধে হাস্যেব উৎস উৎসাবিত কবিযা দিযা বাঁচিল।

দিদিমার তো সে সাজ দেখিতে বডই গবজ পডিযাছে ! ক্ষ্যেন্তি যে এতক্ষণ তাঁহাবই কথা লইযা এই নতুন বৌযেব সঙ্গে হাসাহাসি করিতেছিল, এতটুকু মোটা কথা বুঝিতে পাবাব চাইতে তাঁব বুদ্ধি ঢেব বেশী ধাবালো। তীব্র অপাঙ্গ দৃষ্টিব একটামাত্র তীর হানিযাই তিনি গুরুপদক্ষেপে স্থান ত্যাগ কবিযা গেলেন, "ডাইনী-বিদ্যে কেমন কবে ছাডতে হয, সে যে উনি ভাল কবেই জানেন, সে আমাব জানা আছে গো, জানা আছে।—আমায় আর দেখাতে হবে না,—ও দেখলে অঙ্গ আমার জল হয়ে যাবে না।"

পিছনে ক্ষ্যেন্তিব হাসিব শব্দ ধ্বনিযা উঠিতে দাঁত কিডমিড় করিয়া কহিলেন, "আ মর্ মব মাগি !"

পূর্ণেন্দু আসিয়াই সাম্‌নে দেখিলেন, বিমলেন্দুকে কোলে করিযা তাঁর শাশুডী কোন অদৃশ্য আততাযীব উদ্দেশ্যে ছডা কাটাইয়া বীতিমত গালিবর্ষণ করিতেছেন। বিমলেন্দু বোধ হয ইতঃপূর্ব্বে কাঁদিতেছিল—গণ্ডে এখনও তার অশ্রুচিহ্ন বিদ্যমান ; তবে এক্ষণে দিদিমাব লম্ফে-ঝম্ফে হতভম্ব হইযা গিযা হয় ত বা নিজেব অজ্ঞাতেই চুপ কবিযা থাকিবে। কযদিন পরে বাড়ী ঢুকিয়াই এইরূপে অভ্যর্থিত হইযা পূর্ণেন্দুবও মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। আক্রমণের পাত্রী ইন্দ্রাণীকে মনে কবিতেই তাঁরও চিত্ত জলিয়া উঠিল ; স্বর উচ্চ করিয়া

তিনি হাঁকিলেন, "বিমু! কি হয়েছে?"

বিমল কয়দিন অনুপস্থিত বাপের আহ্বান পাইয়া আনন্দ-চকিত হইল না,—বাপকে সে ভয় ভিন্ন ভক্তি করে না—করিবার বিশেষ কোন সঙ্গত কারণও নাই। তার দিদিমার বিশেষ চেষ্টা এবং পূর্ণেন্দুর অনাগ্রহ দুয়ে মিলিয়া মাতৃহীন শিশুর পিতৃ-আকর্ষণ ঘটাইতে পারে নাই। শাসনসম্পর্ক-বিবর্জিত আদরে ছেলের বাপের হাতে কিছু কিছু শাসন ইদানীং থাকায় বাপকে দেখিলেই সে পলাইয়া যায়। বাপের সাড়া পাইয়া দিদিমার মুখে হাত চাপা দিয়া চুপ বলিল—"দিদা! দিদা! বাবা।"

মঙ্গলাদেবী নিজেরই একতরফা কলহের কোলাহলে জামাতার আগমন জানিতে পারেন নাই, সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া শ্লথ বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া লইলেন। নাতিকে কোল হইতে না নামাইয়া, লুপ্তপ্রায় অশ্রুচিহ্ন এতক্ষণের পর মুছাইবার কথা স্মরণ হওয়ায়, তৎ-কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়া, অনুপস্থিত শত্রুসম্বন্ধীয়ের সম্বন্ধে আর একতরফা—জামাতা সান্নিধ্য বলিয়া ঈষৎ অনুচ্চস্বরে এবং সংযত ভাষায়—গালি বর্ষণারম্ভ করিলেন।

পূর্ণেন্দুর বিরক্তি ক্রোধে পর্য্যবসিত হইতেছিল,—তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিলেন, "ক্ষান্তি!"

ঝি আসিয়া জবাব দিল, "বাবু"! তার গলা ধরা-ধরা,—বোধ করি সেও কোনও খানে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ব্যাপারটা অনুমানে কতক বুঝিতেই পূর্ণেন্দুর বর্দ্ধিত রোষ পুনশ্চ বিরক্তির সীমায় নামিয়া আসিল; প্রশ্ন করিলেন, "হয়েছে কি?"

ক্ষান্তি কাঁদিয়া ফেলিয়া উত্তর করিল, "আমায় এক্ষণি জবাব দিয়ে দিন বাবু!—আমি নিজের ঘরে চলে যাই। গরীব দুঃখী লোক আমরা—একমুঠো ভাতের জন্যেই না গতর খাটাতে এইচি। তার জন্যে এত অপমান বরদাস্ত করা যায় না। আপনিই বলুন, গরীব কি মানুষ নয়? মিনি অপরাধে যা' না

তাই বলে গাল দেবেন।" বলিতে বলিতে ক্ষ্যান্তর চোখ দিযা বড় বড ফোঁটায় জল ঝরিতে লাগিল।

"হারামজাদি বেটি! আমার নামে তুই আমার মুখের উপর লাগাতে এযেছিস্। লাগা না,—লাগিযে আমার কি করতে পারিস্,—তাই না হয় কর! ছোটলোক মাগী, বজ্জাত মাগী···ঝেঁটিযে বিষ ঝেড়ে দেবো না।"

বিমলেন্দু আজন্ম এই ঝড-তুফানের মধ্যেই মানুষ হইতেছে,—ইহাতে সে অভ্যস্ত হইযা গেলেও বাপের সামনে দিদিমার পুনশ্চ এরূপ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি তাহাকে একটু ভীত করিল। দিদিমার গলা ধরিযা তাঁহাকে শান্ত করিতে চাহিযা বলিতে লাগিল, "চুপ কল্ দিদা, ক্ষেন্তি কাঁদ্‌চে, বাবা তোকে মাল্‌বে।"—কিন্তু দিদিমার কানে এসব ছোট কথা প্রবেশ করিবার পথ পাইল না।

পূর্ণেন্দু পথের শ্রম ইত্যাদিতে কিছু ক্লান্ত ছিলেন। বিশেষতঃ তরুণী পত্নীর অদর্শনে তাঁর তরুণ চিত্ত বিরহ-বেদনায ব্যাকুল, কাজকর্ম্ম ভাল লাগে না, অথচ ফেলিযা আসিবারও উপায় নাই। তাই যত শীঘ্র সম্ভব কাজ সারিযা অত্যধিক পরিশ্রম করিযা যতটা ফেলিযা রাখা চলে ফেলিযা রাখিযা, প্রতীক্ষাব্যাকুল দুটি কালো চোখের দৃষ্টি ও একটি লজ্জামিশ্র সানন্দ মুখ দেখিবার প্রত্যাশায ছুটিযা আসিযাছেন। এখন এই অভিনযের মধ্যে পড়া যে কি শাস্তি সে কথা সমব্যথী ব্যতীত কে বুঝিবে? মঙ্গলা ঠাকুরাণী ও ক্ষ্যান্ত দাসী এদের বুঝিবার সম্ভাবনাই নাই! ক্ষ্যান্ত ফুঁপাইতেছিল—এবার ফোঁস করিয়া উঠিল—"কিসের জন্য ঝেঁটিয়ে দেবে শুনি? গতর খাটিযে খাব, যেখানে যাব ভাত দুটো মিল্‌বে। এমন চাকরি করতে চাইনে,—দিন বাবু, আমার মাইনে চুকিযে দিন,—আমি এক্ষুণি চলে যাব।"

পূর্ণেন্দু রাগত হইযা বলিলেন, "কি, তোমাদের কাণ্ডটা কি, তাই না হয় শুনি?"

ক্ষ্যান্ত সত্য সত্যই রাগিযাছে—সে ফস্ করিয়া জবাব দিল,—"কাণ্ড আবাব কিসের? করেই না ইনি কা'কে কোন অকথাটাই বা না বলচেন? তা, আমবা তো আর বাপু ভদ্দব নোকেব ঘবেব বউ নই, যে, বাপ তুলে গাল দিলেও মুখটি বুজে সইবো,—আবার সেই পাযেই তেল ডল্‌বো! আমাদের অত গবজ্জ কিসের? গতব বজায থাকলে এক দুযোব বন্ধ হবে, তো সাত দুযোব খোলা থাকবে। কেউ তো আব বসিযে খেতে দেয না, যে, ভযে মরে যাব।"

মঙ্গলা ঠাকুবাণী বিমলকে নামাইযা দিয়া দুই হাতেব আঙ্গুল মটকাইযা মটকাইযা বলিতে লাগিলেন, "হে হবি! হে মা কালি! স্থানে থেকে কানে শুনো মা! যে গতবেব অত গুমোব, সেই গতবে যেন শুঁযোপোকাব বাসা হয, যেন দুটি চোখেব মাথা খেযে—"

ক্ষ্যেন্তি এবাব গর্জ্জিযা উঠিল, "কেন বল তো? সাঁজ সন্ধে বেলায় চুবি করে গবগবিযে সন্দেশ গিলছিলে দেখে ফেলে ছিলুম বলে, তাই আমাব দুটি চক্ষের মাথা খাচ্চো? সেই রাগে সেই অবধি ছটফটিযে বেডাচ্ছিলে,—খামকা একটা ছুতো বাব করে এই যাচ্ছেতাইটা কবলে! ছেলেকে অন্ধকারে যেতে মানা কবলে, শুনলে না ব'লে ভূতের ভয দেখালে তুমি, আঁৎকে উঠে ছেলে গেল পডে—তাব তাল পডলো গিযে আমাব ঘাডে!"

সে রাত্রে বাড়ীতে এক বিষম কাণ্ড ঘটিল। ক্ষ্যেন্তি তো বিদায় হইলই,— মঙ্গলা ঠাকুবাণীও বুঝি বা হ'ন! তা রহিলেন তো উপোসী হইযাই রহিলেন! আব বোধ করি পেটের মধ্যেও সেই 'গুপো' সন্দেশেব ডিপোব কল্যাণে — অভাব ছিল! শুনা গিযাছে যে, 'রাত-উপোসী থাকিলে হাতীও না কি কাহিল হইযা যায,'—সুখেব বিষয তাঁর তেমন কিছু ঘটে নাই! পূর্ণেন্দু অত্যন্ত রাগিযা অনাহারে নিজের ঘরে গিযা বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী বিমলকে খাওয়াইতে বসিলে বিমল বলিল, "দিদাতা বদ্দ পাজি হয়েছে,—আমি

ছিপ্তি তাবুক পেতা কলে দোব ওকে।"

ইন্দ্রাণী চম্‌কাইযা তাডাতাডি বলিল, "ছিঃ! ও কথা বল্‌তে নেই বিমু, দিদাকে নম' কবতে হয,—দিদা যে ঠাকুব।"

বিমু দিদিমার উপর মর্ম্মান্তিক চটিযাছে। প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, থাতুল হয না। পাজি ছেলে, দুত্তু ছেলে হয। ক্ষ্যেস্তিকে কেন দূল হ' বল্লে? বঁটি দিযে দিদাল নাক কেতে দোব।"

"বিমু। ছি—ছি, ওসব কথা বল্‌তে নেই বাবা! বড্ড দোষ হয। ভগবান রাগ করেন, আব কক্ষনো বলো না।"

বিমু জিদ কবিযা চেঁচাইযা উঠিল, "বল্‌বো—বল্‌বো,—কেন বল্‌বো না? পাজি দিদা, বজ্জাত দিদা,—দুত্তু ছেলে কেন আমাব ক্ষ্যেস্তিকে তালিযে দিলি? তোল দাঁত ভেঙ্গে দোব।"

ইন্দ্রাণী ঘবে শুইতে গেলে বিনিদ্র পূর্ণেন্দু তাহাকে সবেগে বক্ষে জডাইযা ধরিয়া কাতব মিনতিব সহিত বলিযা উঠিলেন, "আর আমি পাবিনে, চলো! ইন্দু চলো, আমবা আর কোনখানে চলে যাই। দোহাই তোমার, তুমি আব আপত্তি করো না।"

ইন্দ্রাণীরও আজ অনেক বাব এই কথাই মনে হইযাছে। এ আবেদন তাব কাছে আবও অনেকবাবই তো করা হইযাছিল,—সে-ই সম্মত হয় নাই। আজই তাব সে কথা পুনঃ পুনঃ মনে পডিযা নিজেব ভীরু ধর্ম্মবুদ্ধিকেও মধ্যে মধ্যে ধিক্কাব দিয়াছে। নিজের জন্য নয়,—প্রবাস-প্রত্যাগত স্বামীর দুরবস্থা দেখিযা নারী-ধর্ম্মের প্রধান অংশটা যে তাব ববণীয সে কথা স্মরণ হইয়াছে, কিন্তু বেশীক্ষণ এ স্মৃতিটাকে সে আমল দিতে পারে নাই, বিমলেন্দুর জন্য। সেই কথাই সে বলিল, —"গেলে মন্দ হয না কিন্তু বিমু কি মাকে ছেড়ে থাকতে পার্বে?"

পূর্ণেন্দু সবেগে কহিযা উঠিলেন, "খুব পাববে,—খুব পারবে। ওকে ঐ শনি-ছাড়া করাও ইন্দু! না হলে পরে বড্ড পস্তাতে হবে।"

ইন্দ্রাণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "উনি কিন্তু ওকে ছেড়ে দিতে রাজী হবেন না।"

পূর্ণেন্দু কহিলেন, "না রাজি হন তো কি আর করা যাবে,—ও না হয় এইখানেই থাকবে—আমি আর সত্যি পারচিনে!"

ইন্দ্রাণী কহিল, "তা কি হয়?"

পূর্ণেন্দু আগ্রহ-মথিত গাঢ় আলিঙ্গন ঈষৎ শিথিল করিয়া কহিলেন, "কেন হয় না, আমায় বুঝিয়ে দেবে?"

ইন্দ্রাণী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, "লোকে কি বল্‌বে?"

পূর্ণেন্দু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "বলবার কি আছে?"

ইন্দ্রাণী আরক্ত গণ্ডে উত্তর করিল, "আছে বই কি! আমি যদি ওর নিজের মা হতুম, তাহ'লে কেউ কিছুই বল্‌তে পারতো না, কিন্তু তা' তো নই, ওকে ফেলে গেলে কেনই বা লোকে নিন্দা করবে না? তাছাড়া লোকে না বল্লেও আমার নিজের মনই যে সায় দেবে না!"

পূর্ণেন্দু এই শেষ উপায় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁর অতৃপ্ত তৃষিত জীবনটাকে তিনি ভাল করিয়া দুটো দিনও উপভোগ করিয়া লইতে পারেন। সুখ-ভোগ-পিপাসা তাঁর অপরিতৃপ্ত, ভোগের উপাদান বা নৈবেদ্যের অপ্রচুরতা এ অতৃপ্তির কারণও নয়; বরং উহা তাঁর পক্ষে অপর্য্যাপ্ত, গ্রহণ করিবার সুযোগ সামর্থ্য বা অবসরেরই অভাব। বিষণ্ণ এবং বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"তবে এমনি করেই জীবনটাকে তুমি নষ্ট করতে চাও? কিন্তু আমি যে আর পারি নে' ইন্দু! এটা কি তুমি ভেবে দেখ্‌বার দরকার বোধ কর না? আমার 'পরেও কি এতটুকু কর্ত্তব্য নেই তোমার?"

ইন্দ্রাণী গাঢ় আলিঙ্গনে স্বামীকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া তাঁর বুকের উপর নিঃশব্দ মুখখানা লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

হায়! এম্‌নি করিয়াই যে এই নিরুপায়া নারী নিজের সমস্ত দেহ মন

একান্ত ভাবে সঁপিয়া দিয়া স্বামীর সমুদয় ক্ষোভের বেদনা প্রশমিত করিতে চায় কিন্তু যে মাতৃত্ব দিবার জন্যই তার মহানুভব পিতা তাকে এই বিপত্নীকের হস্তে চির সংস্কারের বিরুদ্ধেও সমর্পণ করিয়াছেন, নিজেদের কোন লাভ-ক্ষতির হিসাব করিতে গিয়া সেখানে এতটুকু ত্রুটি করিতে মন যে তার সায় দিতে চাহে না। পূর্ণেন্দু উদ্যত আদরের উৎস সহসা রুদ্ধ করিয়া দিয়া নির্ব্বাক্ অভিমানে পিছন ফিরিয়া শুইলেন। পরদিন তেম্নি করিয়াই বিদায় লইলেন, কিন্তু তথাপি স্ত্রীর অনুমতি পাইলেন না।

গোপন-অশ্রুর অবিরল প্রবাহে ইন্দ্রাণীর ক্ষুব্ধ কাতর বক্ষ ভাসিয়া গেল, কিন্তু সে স্বামীর প্রস্তাব অনুমোদন করিতে সমর্থ হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোট্ট একটি ফুট্‌ফুটে কচি মেয়ে কোলে লইয়া ইন্দ্রাণী বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল।

রামদয়াল মেয়ের নামকরণ করিয়াছিলেন, তারা। "কালী তারা"—মহা-বিদ্যাদের তারার সঙ্গে মিল না থাক, আকাশময় ছড়ানো যে সব জলজ্বলে তারকাদের সন্ধ্যাবেলায় দেখা যায়, তাদের সঙ্গে এই ক্ষুদে মেয়েটির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল। তেম্নি ছোট্ট, আর তেম্নি উজ্জ্বল। সুন্দর মেয়েটি! যদিও তারার মা ইন্দ্রাণীকে দেখিতে তারার চাইতেও অনেক বেশি ভাল। তারার নাক চোখ উহার মত অমন ধারালো না হইতে পারে; তথাপি মায়ের রং ও গড়নটা সে পুরাপুরি অধিকার করিয়া আসিয়াছে, বাপের মুখশ্রীও মন্দ ছিল না, দুইয়ে মিলাইয়া মেয়েটিকে দেখিতে খুবই সুশ্রী।

প্রথম দর্শনেই বিমল মোহিত হইয়া গিয়া ইহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিয়া ফেলিল।

মঙ্গলা ঠাকুরাণী অবশ্য এই ভালবাসার বিপক্ষে সশস্ত্র হইযাই বাধা দিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। বিমু দিদিমার নিষেধ শাসন এমন কি টিপুনি ঝাঁকানিটা পর্য্যন্ত হজম করিয়া 'বোনটি'র আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। খেলা ফেলিয়া যখন তখন ছুটিয়া আসিয়া 'বোনটি'র মাথার কাছে উবু হইয়া বসিয়া পড়ে, তার মাথার একরাশ কোঁকড়ান কালো রেশমের থোপের মত চুল লইয়া নাড়া চাড়া করে। তার কচি কচি আঙ্গুলগুলি তুলিয়া লইয়া নিজের আঙ্গুলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে। সে যখন দুপদাপ্ করিয়া পা ছুঁড়িয়া 'হুঁগোঃ, হুঁগোঃ,'—শব্দ করিতে থাকে,— বিস্ময়ে আনন্দে বিমুর উজ্জ্বল চোখ দুটি ঝকমকিয়া উঠে।—"বৌ! বোনটি তো আমায় দাদা বলে ডাকচে না? কখন দাদা বলে ডাকবে?—ওকে দাদা বল্‌তে বলে দাও না।"—এই বলিয়া হাঙ্গামাও বড় কম করে না।

ইন্দ্রাণী সস্নেহে হাসিয়া উত্তর করে, "একটু বড় হলেই বল্‌বে ধন! এখন বড্ড ছোট্ট কি না, তাই দাদা বল্‌তে পারে না।"

বিমু একটু ঘুরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "এইবার বোনটি একটুখানি বড় হয়েছে তো? এই বারে তো দাদা বলে ডাকবে? বোনটি! ওরে বোনটি! বল্ শিগ্‌গির করে আমায় দাদা বল? ঐ দেখ বৌ এখনও দাদা বল্‌চে না! কেবল 'হুঁগো, হুঁগো', ঐ কথাই বল্‌চে। ও বুঝি ভাল কথা? বোকা মেয়ে কোথাকার!"

যেখানে যা পায় আনিয়া বোনের কাছে হাজির করে।—তা' কে জানে দরওয়ানের প্রকাণ্ড লাঠি, আর কে' জানে বাপের বুট জুতাটা। খাওয়া তার 'বোনটি' না দেখিলে হয় না। যে দুধ খাওয়ানো সব চেয়ে কঠিন ছিল,—বাড়ী সুদ্ধ লোক হিমসিম খাইয়া যাইত, বোনটি দেখিতেছে বলিলেই সে দুধের গ্লাস

কোথা দিযা উজাড হইযা যায়। স্নান কবানো, কাপড় পড়া, ভাত খাওযা, ঘুম পাড়ানো—সমস্ত ব্যাপারই এ ছেলের আব্দাব ও হাঙ্গামার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইত; কিন্তু এই যে এতটুকু একটি জাদুকরীর আবির্ভাব হইযাছে, এর চোখের সাম্নে বা আড়ালে, এর নামটা কানে গেলেই, এই অশান্ত জীব যেন মন্ত্র-বশীভূত হইয়া পড়ে। আবদার অত্যাচাব কিছুই আর থাকে না। তবে কি এবার এই ক্ষীরোদ-সম্ভূতার প্রভাবে পূর্ণেন্দুর সংসাবে শান্তিদেবীব আবির্ভাব ঘটিল? হরি বল মন!—যে কপালে বিধাতা শান্তি লেখেন নাই, তাকে কি কেহ শান্তি দিতে পারে? বিমলের এতখানি বাডাবাড়ি বিমলের দিদিমাব শবীবে বিষের বাতি জ্বালাইয়া দিতেছিল। ছেলেকে কোন মতেই বশে রাখিতে না পারিযা 'ডাকিনীর মাথায় সর্ষপ পডিযা দিলে, তাহাবা না কি, কি রকম কবিযা নাচিযা বেড়ায',—বলিযা যেমন প্রবাদ আছে, ঠিক তেমন কবিযাই তিনি নৃত্য কবিয়া ফিবিতেছিলেন। তারাব উপব যাহাতে বিমলেব ঈর্ষা জন্মে, সর্ব্বপ্রযত্নে সে চেষ্টা তিনি তাব জন্ম-সম্ভাবনা হইতেই করিযা আসিযাছেন,—অথচ ফল ফলিল বিপবীত!—তা' বলিয়া তাঁর অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না, সর্ব্বপ্রযত্নেই তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন। খুকির কাছে মযলা লাগার ভয, খুকির তাহাকে কামডাইযা দিবার সম্ভাবনা, খুকিকে ছুঁইলে খুকির মার তাহাকে মারিবাব ভীতি—কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া অবশেষে খুকির কাছে আসা জোর কবিয়া বন্ধ করিতে স্থিবসঙ্কল্প হইলেন; এবং এই উপলক্ষে কোন মতেই যে কার্য্যে তাঁহাকে কেহ সম্মত করিতে পারে নাই, সেই কঠিন কাজটাই তিনি কবিয়া ফে'ললেন,—পূর্ণেন্দুকে বলিলেন—

"দেখ গা! বিমুকে না হয ইস্কুলেই পাঠাও। রাতদিন ঘরের মধ্যে একটা কচি ছেলে কামড়ে পড়ে থাকলে যে শরীব ওর গোল্লায যাবে।"

শাশুড়ীর সুবুদ্ধির কারণ বুঝিযা পূর্ণেন্দু মনে মনে হাসিলেও প্রকাশ্যে তাঁর যুক্তিকে অমান্য করিলেন না, সেই দিনই ইন্দ্রাণীকে জানাইয়া ছেলেকে স্কুলে

ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করিতে বাহির হইলেন। ইন্দ্রাণী অবশ্য প্রথমে ঘরে পড়ানোর কথাই বলিযাছিল ; কিন্তু শেষে স্বামীর যুক্তি-নিহিত-কূটতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া না বলিতে পারিল না। অত অল্প বয়সে স্কুলের শিক্ষা সঙ্গ প্রভৃতি শিশুর পক্ষে উপযোগী নয় জানিলেও, নিজের শক্তি কত অল্প জানে বলিয়া রুদ্ধ আক্ষোভে বিমল সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের মত এবারেও দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া নীরব রহিল।

স্কুলে তো ভর্ত্তি করানো হইল। কিন্তু স্কুলে তাহাকে পাঠায় কাহার সাধ্য! 'বোনটি' না গেলে সে যাইবে না, 'বোনটিও তার সঙ্গে চলুক। হাঁটতে পারে না তো কি, রামী বুঝি ঐ ওকে কোলে করে নিয়ে যেতে পারে না? তা বৈ কি, রামীর পাযে ব্যথা হয় নি, মিথ্যে কথা। এখনই মাগীকে ঝেঁটা-পেটা করে দেবো না!—নাই বা বোনটি বসতে পারলো?—পণ্ডিতমশাই ওকে কোলে করে পড়াবে।—ঐ তো কথা কইতে পারে! 'হ্যাঁ গো', 'হ্যাঁ গো',—তো বল্‌চে, পারে না বৈ কি কথা বল্‌তে! দুষ্টু দিদাটা খালি মিথ্যে কথা কয়,—দোব এক্ষনি দিদার দাঁত ভেঙ্গে।'—

অনেক হাঙ্গামার পর ইন্দ্রাণীর বিশেষ চেষ্টায় তারাকে কোলে লইয়া রামা ঝি স্কুলের দরজা অবধি বিমলকে পৌঁছাইয়া দিবে এবং এইরূপেই ফের তাহাকে লইযা আসিবে—এই ব্যবস্থায় তাহাকে সম্মত করা গেল। বাড়ী ফিরিয়াই বিমলের প্রধান কাজ বোনটিকে স্কুলের সারা দিনের সমস্ত ইতিহাস জ্ঞাপন করা। 'জান্‌লি রে, বোনটি! আজ আমি পড়া বল্‌তে পারি নি বলে পণ্ডিত-মশাই আমায় একপায়ে দাঁড়াতে বলেছিল', 'আজ সতীশ 'হাত-ছড়ি' খেয়েছে', 'বিধুর কান ধরে আচ্ছা করে আজ পণ্ডিত মশাই নেড়ে দিয়েছিল।' ইত্যাদি।

একদিন রামার সঙ্গে খুকিকে পাঠানো হয় নাই ;—বাড়ী আসিযা বিমল সে দিন যত পারিল ইন্দ্রাণীকে দুই হাতে চড়াইল। খুকিকে কাছে আনিয়া দিলে তাহাকে পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। তার পর যেমন দিদিমা আসিয়া

আরম্ভ করিয়াছেন "এমন আদিখ্যেতা-ওলা ছেলেও তো আমি আমার বাপের জন্মেও কখন দেখি নি! এই বয়েস থেকে বোনের ভেড়া হয়ে গেলি যে, বে! —বড় হলে তোব দশা কি যে হবে, তাই অবাক্ হয়ে ভাবি!"—অমনি লাফাইয়া উঠিয়া বিমলেন্দু বাঘের মত থাবা দিয়া দিদিমার টুঁটি টিপিয়া ধবিল। "দূর হঃ, তুই দূব হয়ে যা,—তুই আমাব বোনটিকে এতটুকুও ভালবাসিস্ না, তুই ওকে দেখতে পাবিস না, যা তুই যা, তুই যা।"

ইন্দ্রাণী কোন মতে সেই প্রবল আক্রমণ হইতে মুক্ত কবিয়া দিলে রাগে অপমানে ও হিংসায কালো হইযা গিযা মঙ্গলা দেবী হাঁফাইতে হাঁফাইতে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, "বজ্জাত হতভাগা ছেলেব আস্পর্দ্ধা দেখে অবাক্। পাঁচ বছরের ধাড়ী পাঠশালে পড়তে যাচ্ছেন, স্বভাবটি ঠিক বৈলো। আর তাও বলি বাপু, এ সব তো ছোট ছেলেব মুখেব কথা নয, এর মধ্যে যে টিপুনি আছে, সে কি আমি বুঝি নে'। বলে কি না,—'বোনটি'কে তুমি দেখতে পাব না?' হুঁঃ! —তোর বোন আমাব কে, যে, আমি দেখতে পারবো? পারি নাই তো। কি করবি আমার? যা' পারিস তাই কব।"

খুকিকে কোলে লইযা স্কুল হইতে আনিতে দিদিমার নিষেধ ছিল, বামার কাছেই সে খবর পাইযা বিমলেন্দু ক্ষেপিযা আসিযাছে!

তারার জন্ম-সম্ভাবনা যখন জানা গেল, তখনই তুলসী তলায় পড়িয়া বিমলেন্দুব দিদিমা তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ডাকাডাকি বাধাইয়া বলিতে লাগিলেন, "যেন জ্যান্ত ছেলেব মুখ ওকে দেখতে না হয……"

রামদয়ালের ইচ্ছা ছিল ইন্দ্রাণীর সন্তান এই বাড়ীতেই জন্মগ্রহণ করে। প্রথমতঃ ইন্দ্রাণীর পিত্রালয়ে স্ত্রীলোক নাই। দ্বিতীযতঃ, রামদয়াল মনে মনে বিচার করিয়াছিলেন, ইন্দ্রাণীর সন্তান যদি বিমলের দিদিমার হাতে জন্ম হইতে সমর্পিত হয়, হযত উঁহার চিত্ত সেই অনন্যসহায জীবের প্রতি কিছুটা অনুকূল হইতে পারে। এই নীতি অনুসারেই তিনি ইন্দ্রাণীর এখানে প্রসব হওয়ার

প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিমলের দিদিমা মুখ একেবারে পিঠের দিকে বাঁকাইয়া নাক প্রায় সিকায় তুলিয়া অবাক হইয়া গিয়া জবাব দিলেন, "সে তো আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না,—তা হলে আমায় বাগবাটে পাঠিয়ে দিয়ে ডাক্তারনী মাগী-ফাগি এনে যা হয় করো।"

পূর্ণেন্দু ইহাতে সাগ্রহে সম্মত ; কিন্তু ইন্দ্রাণী সম্মতি দিল না। বিদায় কালে খুড়িমা-সম্বন্ধীয়া প্রতিবেশিনীর পায়ে প্রণাম করিতে তিনি চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "এসো মা, এসো! ভালয় ভালয় নেয়ে-ধুয়ে বেটা কোলে করে নিজের ঘরে ফিরে এসো মা!"

শুনিয়া মঙ্গলাদেবী দণ্ডাহতা বাঘিনীর মত গুমরাইয়া উঠিলেন, "অমন কথা মুখেও এনো না বে'ন।—জানো, ওতে আমার বিমুকে গাল পাড়া হয়।"

খুড়িমা অবাক্ হইয়া গিয়া কহিলেন, "সে কি? তা কেন হবে? বিমু আমার একশো বচ্ছরের হয়ে বেঁচে থাক, ওর একটি দোসর হবে, তুমিও সে আশীর্ব্বাদ করো। এক সন্তান, তো শিবরাত্রিরের সল্‌তে। আর একটি হলে ওটিরও ভরসা বাড়ে।"

আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে মনে মনে বোধ করি অভিসম্পাত করিয়াই মঙ্গলাদেবী বাঁকা মুখে চিবাইয়া বলিলেন, "হুঁ-উ! তা বটে!—তা দেখচো ওই তো ওর বাপের ছিরি! এর ওপোর যদি আবার একজন ভাগীদার জোটে, তাহ'লে কি আর আমার বাছার এ ভিটেয় থান হবে ভেবেচ?"

"ওমা! অমন কথা বলো না বে'ন! ও যে সৃষ্টিধর, বংশধর—ওকে ভিটে ছাড়াবে এমন পাষণ্ড কে' আছে? ধরো, তোমার সুবিরই যদি আর একটি খোকা হতো, তাকে কি আর ফেলতে পারতে?"

"সে কথা আলাদা—" বলিয়াই তাঁহারই পদপ্রান্তে প্রণতা আশীর্ব্বাদা-কাঙ্ক্ষিণী সঙ্কোচে ভয়ে একান্ত ভীতা ইন্দ্রাণীকে তিনি অনায়াসেই এই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন,—"বরং শূন্যি কোলে ফিরে এসো বাছা! তবু আমার দুখের

পথের কাঁটা যেন তৈরি করে এনো না।"

শুনিয়া ইন্দ্রাণীর চোখ দিয়া কেন যে জল উথলিয়া পড়িল না সেই আশ্চর্য্য! তার খুড়শাশুড়ী সম্পর্কীয়া "ষাট্" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং তাঁর চোখে অনাহূত তপ্ত অশ্রু আসিয়া পড়িল।

তা' ভগবান মুখ রাখিয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে সন্তানের জন্ম হইল, নিজের সকল যন্ত্রণা বিস্মৃতা হইয়া ইন্দ্রাণী ব্যাকুল হইয়া ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হলো, ক্ষেমঙ্করি?"

ক্ষেমঙ্করী একটু ইতস্তত: করিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইয়া জবাব দিল, "কান্না শুনে বুঝতে পারচো না দিদি? মেয়ের কান্না ছাড়া কি এমন সানাইএর আওয়াজ ছেলের গলায় বাজে? তা হোক বোন, প্রথম সন্তান হ'লই বা মেয়ে? ওই আমাদের সাত ব্যাটা।"

ইন্দ্রাণীর স্পন্দিত বক্ষ লঘু করিয়া একটা প্রচণ্ড নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া গেল। ধাত্রী মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল জামাইবাবু বোধ করি বেজায় কৃপণ? মেয়ে হওয়া শুনিলে হয়ত ভবিষ্যতে বিয়ে দেওয়ার ভয়ে রাগ করিবেন। প্রকাশ্যে কন্যা-জননীর সান্ত্বনা চেষ্টা করিয়া সদ্যোজাতা ক্রন্দনশীলা মেয়েটিকে হাতের তেলোয় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উহার মায়ের চোখের সাম্‌নে ধরিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "মেয়ে বটে দিদি! কিন্তু কি রূপেরই মেয়ে তোমার জন্মেচে! মরি—মরি, যেন একটি মল্লিকাফুলের মালা।"

মেয়ের জন্ম-সংবাদে কেহই অসন্তুষ্ট হইল না,—মেয়ের মা এবং মঙ্গলা ঠাকুরাণী সবিশেষ হৃষ্ট হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একসঙ্গে দুইটি শিশু বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিমলের যখন আট বৎসর বয়স, তাবার তখন চার। মাস কয়েক বয়স হইতেই সেই যে তাবা 'দাদা' চিনিয়াছিল, যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই যেন সে আকর্ষণও প্রবলতর ও প্রগাঢ়তম হইয়া উঠিল এমন হইল যে, এই ছেলে মেয়ে দুটি যেন পরস্পরের ছায়া। দাদা না খাওয়াইয়া দিলে তারা খায় না, দাদার সঙ্গে নহিলে তার ঘুম হয় না, ভোরে উঠিয়া সাতবার সে টলিতে টলিতে দাদার ঘরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া ডাকা ডাকি করে,—"দাদ্দি! দাদ্দি!" ভিতর হইতে মজলা ঠাকুরাণী ধমক দিলে. কোনবার পলাইয়া আসে, আবার কখনও দোরের পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বিমলেন্দু সন্ধ্যারাত্রে ইন্দ্রাণীর বিছানায় শয়ন করে, পুনঃ পুনঃ হুকুম করিয়া দেয়, যেন তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দিদিমার ঘরে চালান করা না হয়, কিন্তু দিদিমা সে কথা কানে তুলিবার পাত্রী নহেন। তিনি প্রত্যহই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রাণী দু' একদিন মৃদু আপত্তি উত্থাপন করিতে গিয়া ভৎ'সিত হইয়াছিল।—ঘুমাইলে সকল দুরন্ত ছেলের মত বিমলেন্দুরও কোন সামর্থ্য থাকে না, তখন তাহাকে লইয়া যা খুশী করা যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় দিদিমার ঘরে বাহিত হইয়া সারা রাত্রি সে জানিতে পারে না, নিঃসাড়ে ঘুমায়, কিন্তু সকালে উঠিয়া যখন জানিতে পারে, অমনি ক্ষোভে রোষে পাগল হইয়া গিয়া এমন কাণ্ড বাধায় তখন তাহাকে শান্ত করা কঠিন হইয়া উঠে। দিদিমা বেগতিক দেখিলে সরিয়া পড়েন,—সব তাল গিয়া পড়ে ইন্দ্রাণীর উপর। দিদিমা এই বলিয়া সদুপদেশ দেন, যে, ও তো আর তোর সত্যিকার মা নয়—সৎমা বৈ তো না, তোকে নিয়ে ওর শুতে ভাল লাগবে কেন? তোর বাপেরই না কি তাই পছন্দ হবে?

কেন যে তুই অবুঝের মতন ওদের কাছে আদর কাড়াতে যাস্! ওদের তো তোর জন্যে ঘোড়ার ডিমের যত্ন।—ইত্যাদি।

বিমলেন্দু এই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও দিদিমার উদ্দেশ্যে দুই পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া চীৎকার করিয়া বলে, "তারা কেন ওর কাছে শোয়?"

দিদিমা অবাক হইয়া গালে হাত দেন,—"আহা রে ছেলের আমার ন্যাকা-পনা কথা শোন! তারা ওর পেটের মেয়ে, তুই ছোঁড়া ওর কে?"

বিমলেন্দু চীৎকার করিয়া বলে, "বা রে! আমি বুঝি ছেলে নয়? আমি আর ওকে বৌ বল্‌বো না,—বোনটির মতন মা বলবো।"

শুনিয়া মঙ্গলা দেবীর গায়ে ত ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল। মুখ খিঁচাইয়া ব্যঙ্গ করিলেন, "কালে-কালে আরও কত হবে। বলি, মা বল্লেই কি সৎমাকে মা করতে পারবি? ছুঁচোকে বাঘ বল্লেই কি বাঘ হয়।"

এ আধ্যাত্মিক যুক্তি নাকি বিমলের মনে ধরিল না,—সে নিজের নূতন খেয়ালে মাতিয়া উঠিয়া লাফ দিতে দিতে উচ্চ চীৎকারে আরম্ভ করিল, "বোনটি! বোনটি! শিগ্‌গির শুনে যা।"

দাদার আহ্বানে তারা উঠি-পড়ি করিয়া ছুটোছুটি আসিলে বলিল, "শোন্ বোনটি! এবার থেকে বৌ' বল্‌বো না,—তোর মতন ওকে মা বল্‌বো, জানলি বে? তা'হলে রাত্তিরে তোর কাছে শুতে পাবো।—কেউ তুলে আন্‌বে না।"

তারা কি বুঝিল বলা যায় না, সম্ভবতঃ ঠিকই বুঝিয়াছিল। হৃষ্ট হইয়া বারবার ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হ্যাঁ দাদি, তুমিও মা বলো।"

মেয়ে কোলে পাইয়া ইন্দ্রাণী অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে মেয়ে লইয়াও সে স্বস্তি পাইল না। পূর্ণেন্দু তার ছবির মত পরীর মত ছোট্ট মেয়েটিকে বড় বেশি ভালবাসিয়া ফেলিলেন,—এই লজ্জায় ইন্দ্রাণী বিব্রত হইয়া উঠিল। বিমল দিদিমার চেষ্টায় কোনদিন বাপের অনুগত নয়,—বাপকে সে

এড়াইয়া চলে, তাঁর কাছে দু' একদিন শাসিত হইয়া বিদ্বিষ্টও হইয়া আছে। তারা কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই পিতার সাড়া পাইলে চমকিয়া চারিদিকে চায়,— ভায়ের মত সে বাপেরও অনুগতা। পূর্ণেন্দু বাড়ী থাকিলে মেয়েটিকে বুকে চাপিয়া কোলে করিয়া আদরে উহাকে ভরাইয়া রাখেন। বাড়ী ঢুকিবার সময় উচ্চকণ্ঠে হাঁক পাড়িয়া আসেন, "তারা—মা!"—ইন্দ্রাণী লজ্জায় মরিয়া যায়। স্বামীকে অনুযোগও সে এই বলিয়া করে, "একটা মেয়ে নিয়ে এত আদিখ্যেতা কেন? মেয়ে মানুষকে অত আদুরে করতে নেই।"

উত্তরে তাহার লজ্জাকুণ্ঠায় আরক্ত গণ্ডে আদরের ধারা ঢালিয়া দিয়া, পূর্ণেন্দু বলিয়াছেন, "ওগো। মেয়ের আদরে মায়ের আদর ঢাকা পড়বে না,—ভয় নেই গো, ভয় নেই। তোমার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ই আছে!"

ইন্দ্রাণী অতঃপর এ লইয়া তর্ক তুলিলে তার মীমাংসায় পূর্ণেন্দু যে যুক্তি দেখাইত, তার পরও যে ইন্দ্রাণী মেয়ের আদরের অযৌক্তিকতা দেখাইতে চেষ্টা করিত, সে নেহাৎ জোর করিয়া। পূর্ণেন্দু জবাব দিয়াছিলেন, "তোমার বাবা তোমায় যদি এ বয়সে এখনও অতটা আদর করতে পারেন, তবে আমি আমার এই কচি মেয়েটাকে এইটুকুও পারিনে? তুমি যদি বাপের আদরে এম্‌নি করে বিগড়ে থাকো, তো আমার মেয়েও তাই হোক্। এর চেয়ে কিছু আমার চাইবার নেই।"

শুনিয়া হর্ষ প্রমুদিত চিত্তে অথচ ঈষৎ ব্যথিতা ইন্দ্রাণী স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, "ভা—রি এক আদর্শ পেয়েছেন! যাস্—যাস্, আর স্তোক-বাক্যে আসল কথাটাকে চেপে দিতে হবে না।"

কিন্তু সেই হইতে 'আদর দিলে মেয়ে মানুষ খারাপ হইয়া যাইবে' এই যে মিথ্যা যুক্তি সে নিজের অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিত, সেটা আর উচ্চারণ করিতে পারিত না। বাপের আদর সে যে অন্তর পূর্ণ করিয়াই পাইয়াছে। তথাপি বিমলেন্দুর তরফ হইতে পাছে কোন অবিচারের অনুযোগ ওঠে সেজন্য

সে সর্ব্বদা তটস্থ হইয়া থাকিত। বয়সের তারতম্য হিসাবেও একটা কোন তুচ্ছ বস্তু তারার জন্য আসিলে ইন্দ্রাণী হয় সেটা লুকাইয়া ফেলিত; আর নেহাৎ ঝুম্‌-ঝুমি জাতীয় না হইলে তারার হাত দিয়া সেটা বিমলকে দেওয়াইত। বিমলও আবার তখনি 'বোনটি'কে সেটি ফিরিয়া দিত। কিন্তু এততেও মঙ্গলা ঠাকুরাণী ভুলিয়াও কোন দিন তার ব্যবহারে এতটুকুও মহত্ত্বের নিশানা পাইলেন না। দুঃখ এইখানে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দমকা হাওয়ায় যেমন উৎসবের সহস্র বাতি এক নিমেষে নিবিয়া গিয়া সমুদয় শোভাসজ্জাকে গাঢ় অন্ধকারে আবৃত করে,—অকস্মাৎ এক দিন ঘোর বিপদের অন্ধকারে তেমনি করিয়াই ইন্দ্রাণীর সমস্ত আশাদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করাইবার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েক শত বিঘা জমি লইয়া ঐ বিষয়ে শিক্ষিত একটি আমেরিকা-ফেরত ছেলের সাহায্যে পূর্ণেন্দু একটা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সেখানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। জ্বর লইয়া বাড়ী ফিরিয়া তিন দিনের দিন তাঁর মৃত্যু ঘটিল। এই আকস্মিক মৃত্যু ইন্দ্রাণীকে বজ্র-স্তম্ভিত করিয়া দিল, সে এত বড় কাণ্ডটার অনুভূতিও যেন করিতে পারিল না। প্রচণ্ড আঘাতে তার বুদ্ধি-বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পূর্ণেন্দু বিমলকে কাছে ডাকিয়াছিলেন। বিস্মিত ও ভীত বালক কুণ্ঠাভরে আসিয়া কাছে বসিলে তার ছোট হাত নিজের জ্বরতপ্ত হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—"তারা!"

তাবাকে আনা হইলে তার ক্ষুদ্র হাতটুকু বিমুর হাতে তুলিয়া দিতেই বিমল বাপের হাত এক রকম জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া সেই হাতই জোর দিয়া চাপিয়া ধরিল। দেখিয়া পূর্ণেন্দু একটা দীর্ঘ কবিয়া শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা শান্ত ভাবেই মোচন করিলেন।—তার পর অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিলেন, "ওকে আমি তোমায় দিয়ে গেলুম।"

বিমল কিছু না বু'ঝযাই ঘাড বাঁকাইয়া নিজেব স্বীকাবোক্তি জানাইল।

তাব পরই দুজনকে সবাইয়া দেওয়া হইল। বিমল স্বেচ্ছায় পলাইয়া গেল, তাবাকে জোব কবিয়া সবাইতে হইল এবং এব পর জীবিত বা মৃত পিতার সহিত তাদেব সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

পূর্ণেন্দুব পূর্ণসংজ্ঞা বরাববই ছিল। সংবাদ পাইযা বামদযাল মৃত্যুর দিনেই আসিয়া পৌঁছিযাছিলেন। সঙ্গে কলিকাতাব এক বড ডাক্তারও ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে তখন আব প্রয়োজন ছিল না। আবাহনের সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জ্জন করিয়া দিয়া মাত্র তাঁর ঋণটুকু পবিশোধান্তে ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ রামদয়াল তাঁর তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক জামাতাব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে শ্মশান-ঘাটে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকাব ঘোবালো হইযা আসিয়াছে—তখনও নিবিড় হয় নাই, কিন্তু এবই মধ্যে এ বাড়ীতে আজ কি অসহনীয় নীরবতাই বাসা বাঁধিয়াছে! বিগত কয়দিনকাব ছুটাছুটি চলাবলা কর্ম্মব্যস্ত ভাবেব পর এই অকথ্য শোকের নির্ব্বাক্ স্তব্ধতা ঝটিকার পবক্ষণে শান্ত সমুদ্রেব মত দেখায় না,—এ যেন মনে হয় মহাপ্রলয়েব পরের বিরাট স্তব্ধতা। এর স্তব্ধ বক্ষের অন্তরালে অতীতের কোটি-কোটি বিপ্লবময় স্মৃতি—অনাগতেব অযুত উন্মেষ-রহস্য—সমস্তটাই যেন এর কুহেলিকাময় বক্ষ-বসনের তলদেশে—লুপ্ত হয় নাই, মাত্র সুপ্ত রহিয়াছে।—ইহাকে ভাঙ্গাও যায় না, সহাও যায় না।

ইন্দ্রাণী অসম্বরণীয় শোকের আবেগে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

যখন প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতি-বর্ষণের সহিত তার সময়োচিত সজ্জা-বিধান করিতে ডাকিয়া লইয়া গেল, সে নিঃশব্দেই তাদের অনুগমন করিল। সিঁথির সিঁদুর হাতের লোহা বস্ত্রাভরণ সমস্তই নিঃশব্দে বিসর্জ্জন দিয়া শুভ্র-বসনা বিধবার বেশে স্বামীর পরিত্যক্ত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল। নব-বিধবার শোকস্তব্ধ অবিচলিত মূর্ত্তি দেখিয়া সাধারণ লোকে বিস্ময় বোধ করিল। তার এ অবস্থায় হয় চীৎকার করিয়া কান্না অথবা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া করুণ বিলাপ—এ দুইটার একটা অন্ততঃ শোভা পায়; এবং এই চিরপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইলে চিরন্তন নিয়মানুযায়ী তাঁরাও সান্ত্বনার যা-কিছু বাঁধা গৎ তাঁদের জানা আছে, প্রয়োগ করিতে অবসরও পান,—তা' না হইয়া,—এই তরুণী নববিধবা অচলা পাষাণীর মত এই যে বিলাপ-পরিতাপহীন শোকের বেড়া আগুন নিজের চারিদিকে ঘেরিয়া রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, ইহাকে লইয়া লোকে করে কি? যার শোক নাই, তাহাকে কিসের সান্ত্বনা দিবে? কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পরস্পরের মধ্যে সদ্য-বিগতের সম্বন্ধে দুঃখজনক আলোচনা যথাসম্ভব সারিয়া সদ্য-বিধবার সঙ্কটাপন্ন দুরবস্থার আভাস তার অর্দ্ধচেতন চিত্তের উদ্দেশ্যে বৃথাই প্রেরণ-চেষ্টা করিয়া অবশেষে উহাতেও তার মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলিতে না পারিয়া একে একে অসন্তোষের সহিত উঠিয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া কেহ বলিলেন "বৌটোর যেন সব তাতেই এক ঢং!"—কেহ বলিলেন, "ওর নাম খৃষ্টানি!—তাদের না কি, মানুষ মলে কাঁদতে নেই। সাধ করে কি বুড়ি মাগী জ্বলে মরে!"

কেবল সেই খুড়িমা বলিলেন, "না গো, তোরা বুঝতে পারিস নি,—ওর বুক একেবারে চৌচির হযে গেছে।—কাঁদবারও বাছার ক্ষেমতা নেই।"

যেখানে বিমলেন্দুর দিদিমা খুব ঘটা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জামাইয়ের হাত-বাক্স প্রভৃতি নিজের চাবিবদ্ধ ভাণ্ডারঘরে পুরিয়া রাখিতেছিলেন, সহানুভূতিকারিণীর দল সেইখানেই পুরাপুরি আশ্রয় লাভ করিয়া বাঁচিলেন।—

রামদয়াল শ্মশান হইতে ফিরিয়া মেয়ের কাছে আসিযাই সেই দীন মূর্ত্তি দেখিযা হা-হা শব্দে কাঁদিযা উঠিযাছিলেন ; কিন্তু সে যখন তাহাতেও কাঁদিল না, তখন তাঁর নিজের সেই মর্ম্মন্তুদ শোকের বেদনাও ভয়ের তাড়নায় থমকিয়া গেল। কাছে বসিযা মাথায হাত দিযা ডাকিলেন, "মা ! মা গো আমার !"

ইন্দ্রাণী তার অর্থহীন দুই চোখের দৃষ্টি পিতাব শোকদগ্ধ মুখেব উপর স্থির কবিযা চাহিযা বহিল। সে দৃষ্টিতে কিছুই ছিল না ; তথাপি এতখানি ছিল যে, ততবড আঘাত এই একমাত্র কন্যাব বৃদ্ধ পিতাব পক্ষে একান্তই অসহনীয়।

আবাব কিছুক্ষণ পবে পিতা ডাকিলেন, "মা আমার !" মেযে জবাব দিল, "বাবা !"

"মা ! ধৈর্য্য ধববাব চেষ্টা কব মা। ইচ্ছাময়ের কার্য্যে আমাদের জন্য তো রদ হবে না মা ! তুমি তো সবই জানো।""

ইন্দ্রাণী পিতাব কোলেব উপব একখানি হাত রাখিয়া শান্ত ভাবে উত্তর করিল, "জানি বাবা !"—বলিয়া আবার ঠিক সেই বকম করিয়াই একদিকে চোখ মেলিয়া বসিযা রহিল। দেখিযা বামদযালের বিদীর্ণ চিত্ত শতধা হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাঁব অত্যন্ত আদবের মেয়েটিকে এতবড় দুঃখের অবস্থায় এমন কবিযা দেখা যেন সহ্য করিতে না পাবিয়া একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া কহিযা ফেলিলেন, "ধৈর্য্য ধববার চেষ্টা এত বেশী করে করিস্ নে মা ! এ যে আমি সইতে পাবচি নে', ইন্দ্রা !"

ইন্দ্রাণী এবার বাপেব দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি কি করবো বাবা ?"

মানুষের গলায় এমন সুরও যে লুকানো থাকে, তাব সুখের দিনের কল-ঝঙ্কারে এত বড় নিদারুণ কল্পনা কেহ কি করিতে পারে ? কথা কযটা এবং তাঁর উচ্চারণে, এই রূপসী তরুণীর বুকের ভিতরটা যে কি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে এক সাহারার তপ্ত মরু—কোন দিকে এর যেন আজও সীমা নির্দ্দেশ

হয় নহে, চারিদিকেই আগুনজ্বলা বালুর সমুদ্র ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছে।—রামদয়াল কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! কি' তোকে আজ বলবো আমি বল্? শুধু এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্চি, যিনি সম্পদ্ দেবার কর্ত্তা, বিপদ তাঁরই দেওয়া। তাঁর দান মনে করে, এ দুইকেই তুমি যেন সমান ভাবে গ্রহণ করতে পারো। বাবা আমার তাঁর কাছে চলে গেছেন, কিন্তু তোমার উপর যে কর্ত্তব্যের ভার দিয়ে গেছেন, তুমি নিজের সেই মহাব্রতকে একমুহূর্ত্তের জন্যেও যেন নিজের কোন লাভক্ষতির খাতিরে পড়ে তুচ্ছ করে না ফেল। আমার আর কিছুই যে দয়াল হরি তোমায় বলবার জন্যে রাখেন নি ইন্দু!"

ইন্দ্রাণী এতক্ষণে পিতার কথার অর্থবোধ করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সভয়ে কহিয়া উঠিল, "বাবা! আবার আমায় তবে বেঁচে থাকতেই হবে?"

রামদয়াল কহিলেন, "হ্যাঁ মা, তোমায় বাঁচতেই হবে। পূর্ণর ছেলেমেয়েকে মানুষ করে তোলবার জন্যে তোমায় বাঁচতেই যে হবে মা!"

বিমল মহা বিরক্তিভরে ছুটিয়া আসিয়া পরুষ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "বৌ! এ সব তোমাদের কি হচ্চে বল তো? দিদা ওখানে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্চে; তুমি এখানে ফোঁস ফোঁস করচো;—আমার আর বোনটির ক্ষিদে পায় না বুঝি? আমরা আজ কিচ্ছু খাবো না, বুঝি?"

রামদয়াল বিমলের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে জোর করিয়া ইন্দ্রাণীর কোলে বসাইয়া দিলেন। তার পর ইন্দ্রাণীর ডান হাত উঠাইয়া ছেলের মাথার উপর স্থাপন করিয়া বাষ্পবিজড়িত গদ্গদ্ কণ্ঠে কহিলেন, "মা, তোকে যে আমি এই বাড়ীতে পাঠিয়েছিলুম, সে তো আর কোন কিছুরই জন্যে নয়,—শুধু এই মাতৃহীনের মা হ'বার জন্যে। আজ এ শুধু মাতৃহীনই নয়,—এই পিতৃ-মাতৃহীন বালকের দুটো স্থান তোমায় পূর্ণ করতে হবে। এই এখন তোমার জীবনের একমাত্র মহাব্রত। এ যে তোমায় পালন করতে হবে ইন্দু!"

এ ব্রত পালন যে তার পক্ষে কি দুঃসাধ্য—কি কঠিন! তেমন সোজা কথাটাকেও স্মরণ করিতে পারে, ততটুকু শক্তিও তখন ইন্দ্রাণীর মনে ছিল না। উঃ! কি রিক্ত কি শূন্যই সে মন তার! সে শুধু পিতার আদেশ চিরদিনের অভ্যাসের ফলেই যেন নিজের সমস্ত বোধ-শক্তির অগোচরেই অন্ধ ভাবে গ্রহণ করিয়া বিমলকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। অমনি দুচোখ দিয়া দরদর অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইয়া গেল। এই বারে বড় আকুল, বড় কাতর হইয়াই সে কাঁদিল।

বিমল রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া তার পিঠে দুম করিয়া একটা কিল মারিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "ছিঁচ-কাঁদুনির মতন প্যান-প্যান করে কাঁদবেই যদি, তো গেলে না কেন বাবার সঙ্গে কলকাতায়!—বাবাকে যখন ডাক্তার বাবুর সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হলো?—ও সব আমি শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না,—দাও বলচি শীগ্গির, কি খেতে দেবে? ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে—আর ওঁরা মজা করে বসে বসে কাঁদচেন!"

ইন্দ্রাণী উঠিয়া আসিয়া সত্য-সত্যই ছেলে মেয়েকে খাবার দিল। তাহা দেখিয়া মঙ্গলা ঠাকুরাণী উচ্চ হুঙ্কারে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কান্নার শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি রাক্কুসীই বাড়ী এসেছিল রে মা! আমার সতী-সাবিত্রী স্বৰ্ণর গায়ের বাতাস কি ওর গায়ে আছে যে, তার ধন কেড়ে নিলেই তা' সইবে? ছেলেটাকে না এখন গবগবিয়ে গিলে খেলে বাঁচি!"

প্রতিবেশিনীরা অবাক্ হইয়া অনেকেই গালে হাত দিলেন। কেহ কেহ বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এখনকারের মেয়েদের চেনবার যো নেই! স্বোয়ামী থাক্তে তার সঙ্গে কতই না ফষ্টিনষ্টি, আর যেই সে চোখ বুজেচে কি, না বুজেচে, অমনি যেন ঘাড়ের বোঝা ফেলে নিশ্চিন্দি হয়ে বাঁচলো। তবু অমন রাজার মত স্বোয়ামী,—তাই কি বুড়ো না হাবড়া না নির্ধন। সে যদি হতো, তা হলে আরও না জানি কি করতো?"

কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "বুঝতে পারচো না ? এখন সতীনপোটাকে বশ করে ফেলে বিষয় হাতে করবার চেষ্টা। খুব মেয়ে বাবা !"—আর একজন বলিলেন, "তা আর হবে না ? বউ ইংরিজি জানে কত ? সাতটা পুরুষের কান কাটতে পারে।"

অনেকেই অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। সদ্য-বিধবার এতটা ধৈর্য্য কাহারও ভাল লাগে নাই, এবং আধুনিকতাই ইহার মূল ধরিয়া লইয়া একালের মেয়েদের কঠিন চিত্তের ও অসৎ গুণের সম্বন্ধে সেদিনকার ব্যর্থ শোকসভায় আলোচনা করিয়া সকলেই কথঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তি এবং মঙ্গলা ঠাকুরাণীকে কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ করিয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

রামদয়ালের ইচ্ছা ছিল কিছুদিনের জন্য ইন্দ্রাণীকে কাছে লইয়া যান, কিন্তু কথাটা উঠিতেই ইন্দ্রাণী আপত্তি-জনক মাথা নাড়িল। রামদয়াল কিছু ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু দ্বিরুক্তি করিলেন না। কি জন্য যে মেয়ে স্বামীর ঘর ছাড়িতে চাহিতেছে না, তাঁর বুঝিতে বাকি নাই। সে যে দিনরাত্রির অধিকাংশ পূর্ণেন্দুর ঘরের মেঝেয় চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে, কদাচিৎ উঠিয়া সেক্রেটারিয়েট টেবলটার ড্রয়ার খুলিয়া তারই লেখা প্রভৃতি নিজের স্বল্প কয়খানি পত্র—লইয়াই নাড়াচাড়া করে। পূর্ণেন্দুর কোন তৈলচিত্র বা এনলার্জ-করা ফটো ছিল না। এমনি একখানা সাধারণ ফটো একবার সে কোন বন্ধুর দ্বারা তোলাইয়াছিল,—সেইখানা একদিন পিতার হাতে দিয়া ইন্দ্রাণী বলিয়াছিল, "এটা বড় করা যায় না বাবা ?"

রামদয়াল প্রতিশ্রুতি দিয়া ছবি লইলেন। বুঝিলেন, মেয়ে এখন তার অপগত স্বামীর স্মৃতির মধ্যে তন্ময় হইয়া থাকিতে চায় ; এদের মধ্য হইতে দূরে যাইতে চায় না। তিনি ইহা সুযুক্তি বোধ করিলেও তার নিজের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এ অবস্থায় এ ব্যবস্থা তার মনকে কতকটা খোরাক যোগাইয়ে দেয়, কিন্তু দেহ ধারণ করিতে হইলে, আরও যে একটা ব্যাপারকে বাদ দেওয়া

চলে না, দেহের খোবাকটা যে এখানে কেমন করিযা কে যোগাইবে সেই ভাবনাই তাঁকে বড বেশি চিন্তিত করিল। জামাতার মৃত্যুর পর এই ভয়ানক দিন কয়টা জামাতৃগৃহে বাধ্য হইয়া বাস কবিতে করিতে এই অভিজ্ঞতা তাঁর জন্মিয়াছিল, যে —এ বাডীতে স্বামিহীনা ইন্দ্রাণীর যে অবস্থা, তার চেয়ে দুরবস্থা কোন ভদ্র-কন্যাবই বোধ কবি আর ঘটিতে পারে না! তাঁর বড় আদরের অশেষ গুণবতী কন্যাব পদ ও প্রতিষ্ঠা যে এত নামিতে পারে—কন্যা-গৌরবে একান্ত গর্ব্বিত এ বৃদ্ধেব ইহা যেন ধাবণাবও অতীত। এই ভ্রান্তি আজ একান্ত অসময়ে অত্যন্ত তীব্র আঘাতে ভাঙ্গিযা গেল। দেখিলেন, তাঁর অবিদ্যমানে শোকাহতা ইন্দ্রাণীর নিরাহারে মৃত্যু ঘটাও খুব বেশি অসম্ভব নয!

এব উপব তাঁব এই বযসে এত বড় শোকের উপব আবার একটা যে মস্ত বোঝা ঘাডে পড়িল, সে ভাবনাও তাঁহাকে দিশাহারা না করিযা পারিল না। পূর্ণেন্দুব স্থাবব ও অস্থাবব সম্পত্তি সমস্তই নানা প্রদেশে ছড়ান। এলাহাবাদে ও কলিকাতাব ভাডাটে বাড়ী, সুন্দরবন অঞ্চলের নূতনকেনা জমিজমা, তার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ কবিবার বিবিধ যন্ত্রপাতি,—এম্নি নানান্ ফ্যাকড়ায় আগাগোড়া তাল পাকাইয়া আছে। এর ভিতর আবার দেনা আছে, পাওনা আছে, অপব একজনের সঙ্গে অংশীদারী আছে, কতক জিনিয আমেরিকা বা ইংলণ্ডে 'অর্ডার' দেওযা আছে, তাব সিকি মূল্য দেওযা হইযা গিয়াছে, কোন একটা মাল আসিযা পৌছিযা মাল না ছাড়ানোর জন্য মোটা টাকার অঙ্ক বাডাইতেছে। ক্যাদয়াল কতকটা কর্ম্মচারীর নিকট, কতক খাতাপত্রে এবং কিছু কিছু বৈদেশিক মেসিনওয়ালাদের জোর তাগিদে আন্দাজ পাইয়া বসিয়া পডিয়াছিলেন, কিন্তু কোন অবস্থাতে হতাশাস হওয়া তাঁর স্বভাব নয়, নিজের ভীত আর্ত্ত চিত্তকে এই বলিয়া জয় করিলেন, জগতে অসম্ভব কি আছে? পূর্ণেন্দুর চাঁদমুখে আগুন দিতে দেখতে পেরেছি,—মাকে আমার এই দুরন্ত গ্রীষ্মে একাদশীর রাতে নির্জীব হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পেরেছি, তখন এই

খাটুনিটুকুই কি আমার অসহ্য হবে?

এই উপলক্ষে রামদয়ালকে আরও কিছু দিন মেয়ের কাছে থাকিতে হইল, এবং শুধু থাকা নয়,—আফিস আদালত ও জামাইয়ের কর্ম্মক্ষেত্র সুন্দরবন অঞ্চলেও ছুটাছুটি করা হইতে পার পাইলেন না। এমন করিয়া প্রায় মাসাধিক কাল ধরিয়া একটা জোয়ান পুরুষের মত এই অনলস বৃদ্ধ রাত্রে এবং দিনে প্রাণান্তশ্রমে খাটিয়া নাবালকের সম্পত্তিটাকে এমন অবস্থায় দাঁড করাইতে সমর্থ হইলেন যে, এখন আশা হইল দুমুঠা পেটের ভাত ও পরণের কাপড়ের জন্য অনাথ পরিবারকে কাহারও গলগ্রহ হইতে হইবে না। অবশ্য এই স্বল্প দিনের মধ্যেই যে সম্পূর্ণ সুবন্দোবস্ত হইয়া উঠিল তা' নয়,—এখনও বিস্তর খাটুনি বাকি,—তথাপি বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা অনেকখানিই কাটিয়া আসিল। অংশীদার ছেলেটির জুয়াচুরি মতলব ছিল না, কিন্তু আধুনিক-তন্ত্রের মত 'কাজে কুঁড়ে ও বচনে দেড়ে' ছেলেমেয়েরা যেমন হয়, সে-ও তা ভিন্ন কিছু নয়,—'হচ্ছে, হবে' —অবস্থায় অনেক সময় আলস্যজনিত একটা আধা-জুয়াচুরি গোছ ব্যাপার দাঁড়াইয়া যায়,—অর্থাৎ নিজে লাভ না খাইয়াও অংশীদারের লোকসান ঘটাইয়া দেয়,—এ ক্ষেত্রেও সেই ব্যাপারে পৌঁছাইবার উপক্রম হইয়াছিল,—রামদয়ালের সাবধানতায় উপস্থিত ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

বিষয়-কার্য্যের সম্ভবমত বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ী ফিরিবার কথা মনে করিতে গিয়াই রামদয়ালের সারা প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল। এতবড় শোকের ঝড় মাথার উপর লইয়াও তিনি এই যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে নিজেকে পিষিয়া ফেলিতেছিলেন, তার মধ্যেও তাঁর সান্ত্বনা ছিল এই যে,—ইন্দ্রাণীর কর্ত্তব্যের বোঝা তিনি তার কল্যাণের জন্যই নিজের অশক্ত স্কন্ধে চাপাইতে দ্বিধা করেন নাই। সেই সঙ্গে তার বিয়োগবিধুর ব্যথাভরা প্রাণটাকেও সান্ত্বনা হস্তের প্রলেপে একটুখানি জুড়াইবার চেষ্টাও করিতে পাইতেছিলেন। এখান হইতে বিদায় লইলে আর তো না নিজের, না মেয়ের—কারও জন্য কিছুই করিবার থাকিবে

না,—দু'জনারই দিন কাটিবে কেমন করিয়া ?

এ বাড়ীতে যে কয়টি প্রাণী রহিল, তাদের মধ্যে ইন্দ্রাণীর মুখ চাহিবার মত একজনও যে নাই,—সে কথা বুঝিতে রামদয়ালের বাকি ছিল না। বিমলেন্দুর দিদিমা এতদিন তবু জামাইকে একটু সমীহ করিয়া চলিতেন। ইন্দ্রাণীকে অবশ্য পীড়ন ঠিকই করিতেন, তবু তার মধ্যে একটু আড়াল ছিল। মন খুসী থাকিত না ; তবে কদাচিৎ, দৈবাৎ যদি থাকিয়া গেল তো, পূর্ণেন্দুকে দেখাইয়া তার প্রিয়তমাকে হয় ত বা একটুখানি মিষ্ট কথার অপচয়ই বা করিয়া ফেলিলেন।—বিশেষ ব্রত উদযাপনের জন্য যখন মোটা টাকার দরকার হইত। —কিন্তু সে আড়াল-আবডালের দরকার আর নাই—এখন এ বিশ্বে মজলা ঠাকুরাণীর ভয় করিবার মত সৌভাগ্যবান্ কাহাকেও দেখা যায় না,—মহোৎসাহে উক্ত ঠাকুরাণী এই শোকভার-নম্রা, আত্মসমাহিতা অভাগিনীর প্রতি যথেচ্ছাচারের স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। রামদয়াল দেখিলেন তাঁর মেয়ের মুখে জল দিবার লোক এখানে কেহ নাই। পূর্ণেন্দুর সেই জ্ঞাতি খুড়িমা একবার আসিয়া তার জন্য হবিষ্যি দুটি রাঁধিয়া দেন। তাঁরই মুখে শুনিয়াছেন, ইন্দ্রাণীর পাতেই তাহা না কি পড়িয়া থাকে। সে যে খাইবে না বলিয়া খায় না বা কান্নাকাটির জন্য খাইতে পারে না, তা নয়, ডাকিলেই নিঃশব্দে উঠিয়া সে আহারে বসে। কিন্তু হায় ! বুকের ভিতর যার সর্ব্বদা অগ্নিহোত্রের মত অগ্নি-কুণ্ড অনির্ব্বাণ জ্বলিতেছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা কি তার থাকে, হাজারও ইন্দ্রাণী নিজের নির্ম্মম ভাগ্যের জন্য নিজেকে বলিদান করিতে চাক, শরীর সে কথা মানিবে কেন ?

দয়াল দেখিতেন এই একটিমাত্র মানুষ তাঁর মেয়ের মুখ চাহিতে আছে, তার এ বাড়ীতে জোর কতটুকু ? যার বলে মনে বল ছিল, সে আজ নাই। বিমলের দিদিমার সঙ্গে এঁর চির-বিরোধ। আজ এত বড় সুযোগের দিনকে প্রত্যাখ্যান করার পাত্রী মজলা দেবী ন'ন। তিনি শীঘ্রই নিজ মূর্ত্তি

ধারণ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দ্ব'দশীব প্রাতে খুড়িমা আসিয়া অর্দ্ধমৃতা ইন্দ্রাণীকে তেল মাখাইয়া স্নান করাইলেন, তার পর মঙ্গলা দেবীকে ডাকিয়া তুলিয়া উহাকে সরবত করিয়া দিবার জন্য একটু মিশ্রী বা চিনি চাহিতেই তিনি অকাল-জাগ্রত কুম্ভকর্ণের মতই ভীষণ তিক্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "দেখ বাপু, পূণ্য তার মা-হারা ছেলে মানুষ করিয়ে নেবার জন্যেই, পায়ে ধরে আমায় এখানে এনেছিল,—তার দোজপক্ষের বউএর হবিষ্যি রাঁধবার বা সরবৎ ভেজাবার চাকরাণী হবার জন্যে আমি আমার বাগাঘাটের-বাস্তভিটে ছেড়ে এই ঝোড় জঙ্গলে বাস করতে আসি নি। বাপকে বলো গে',—মেয়ের ফুলশয্যে তো খুব ঘটা করে বসে সাজাতে পেরেছিল,—দোয়াদশীর জলখাবার সাজাতে পারে না?"

খুড়ি কহিলেন, "সে তুমি বল্‌তে পার বোন,—আমি তেমন কথা কোন্ মুখ নিয়ে পূর্ণর শ্বশুরকে বল্‌তে যাই বল? কখনও অভ্যেস নেই,—এই দুরন্ত গরমের রাতদিন জলবিন্দুটি মুখে না দিয়ে কাটান যে কি,-সে তো নিজের হতেই জানো! তোমাদেরই আরও বেশি মায়া হ'বার কথা। যা'হোক একটু কিছু দাও,—মুখে দিয়ে জল ঢালুক তো একটু গলায়।"

মঙ্গলা দেবী যথাপূর্ব্ব স্থির থাকিয়া জবাব দিলেন, "আমার ভাঁড়ার কেমন করে এখন খোলা হবে, ওর বাপকে বলো, দোকান থেকে আনিয়ে দিক্! সর্ব্বস্ব গ্রাস করে তো বসেইছেন। আমার বাছার হাত ধরে ক্রোশ্ ক্রোশ্ দিন তো অ মায় বাড়ী থেকে যেতেই হবে। হায় রে! পূণ্য কি ছেলেমানুষীটাই যে করে গেলি বাবা! খামকা পাঁচজনের পরামর্শে পড়ে কোথা থেকে হুট্ করে একটা ধেড়ে ধুম্বো মাগী,—গুরুমা কি ধাইমা তার কিচ্ছু ঠিক নেই,—এনে আমার ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে নিজে তো এই সরে পড়লি,—এখন ছেলেটাকে পথে বার করে দিলেই ওদের মনোবাসনা সিদ্ধি হয়।"

মঙ্গলা যখন দেখিলেন এই খুড়-শাশুড়ীর কল্যাণে ইন্দ্রাণীর দুঃখ পাইয়াও

ঠিক দুঃখ পাওয়া পুরা হইতেছে না,—সে সময় মত ভাত-জল সবই তাঁর ভাণ্ডারের উপর নির্ভর না করিয়াও পাইতে থাকে, তখন একদিন ছুতায় নাতায় ঝগড়া বাধাইয়া তাঁর এই জ্ঞাতি বোনটিকে এমন একটা কটু কথা বলিয়া বসিলেন যে, ইহার পর আর এ বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়াইতে তাঁর কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। নিজের ঘরে বসিয়া এই মন্দভাগিনী তরুণীর জন্য তিনি চোখের জল নেহাৎ কম ফেলিলেন না বটে, কিন্তু তার মন্দ ভাগ্যের অংশ লইয়া কোন সাহায্য করিবার ইচ্ছা তাঁর সেই একটা মাত্র কথার ঘায়ে বিতৃষ্ণায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এমনি নির্ঘাত সন্ধানে শরক্ষেপ করিতে না জানিলে আর যোদ্ধার বাহাদুরি কিসের!

রামদয়াল মহাল হইতে ফিরিয়া তাহার মুখে শুনিলেন, সে বিমলের কোন উপদ্রবের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে, "দাদি! দাদি! লক্ষ্মী ছেলে! জুড়নো লুচি কাও ভাই, মাল যে আজ একদছী।"

সেদিনের তিথিতে একাদশী লেখে না,—রামদয়ালের বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠিল। তারাকে ডাকিয়া জেরা করিতে পাঁচ বছরের তারা কহিল, "মা তো আজ কিছু কায নি দাদু! দিদা বল্লে তোল মাল বুঝি একদছী।"

রামদয়াল শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন বিমল জুড়ানো লুচির বিরক্তি ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল,—"সত্যি দাদু! ভারি মজা হয়েছে! দিদাটা এমন হ্যাংলা, একাদশীর দিনে নিজে ভাত রেঁধে খেলে হ্যাঁ গো, আমি নিজের চোখে ওকে দেখেছি খেতে! আর মার বেলায়—বল্লে, উনি তো কই রাঁধলেনও না খেলেনও না,—আজ বোধ করি একাদশী করবেন!"

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন পূর্ব্বক রামদয়াল মেয়ের কাছে গিয়া একেবারে বলিয়া উঠিলেন, "ইন্দ্রা! মা! আমায় কাল বাড়ী যেতে হবে—গিরীনের চিঠি এসেছে। তোকেও আমি নিয়ে যাব।"

ইন্দ্রাণী ছেলেমেয়ের খাবার সাজাইয়া নত চক্ষে চিন্তা-ম্লান মুখে যেমন থাকে

নীরবে বসিয়া ছিল,—ধীরে ধীরে চোখ তুলিয়া বাপের বেদনা-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিমলের কি করবে ?"

রামদয়াল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "ও-ও যাবে।"

ইন্দ্রাণীর অধর-প্রান্তে এক ফোঁটা দুঃখের হাসি মেঘকাটা বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল,—সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উনি তো ওকে পাঠাবেন না।"

রামদয়াল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে গেলেন, "তা হলে ?"

ইন্দ্রাণী শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমায় এইখানেই থাকতে হবে। সে তুমি নিজেই তো বলেছ।"

নবম পরিচ্ছেদ

ফুল শুকাইয়া গেলেই তার সমস্ত পরিচয়কে সে নিঃশেষ করিয়া দিয়া যায় না,—শুধু সঙ্গে লইয়া যায় বর্ণটুকু। তেমনই পতিহীনা হইয়াও ইন্দ্রাণী আবার সেই স্বামিহীন সংসারেই ঘর করিতে লাগিল, কিন্তু সব থাকিতেও তার যেন আর কিছুই রহিল না। জগৎটা যে এত বড় শূন্য, জীবনটা যে এতখানি বিস্বাদ,—কোন দিন কি ইহা কল্পনা করিতে পারা গিয়াছিল ?—অথচ সেই অচিন্তনীয় কাণ্ডই যখন ঘটে, তখনও তেমনি করিয়াই জীবনযাত্রার পথকে মানুষে গড়িয়া লয়। ইন্দ্রাণীর জীবনে প্রথম হইতেই আলোর সঙ্গে ছায়া পাশাপাশি দেখা দিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলোর আভা একদিনের তরেও ফুটিয়া উঠে নাই। ছোটবেলায় মা মরিয়াছেন, বিবাহের পর দেবী-মঙ্গলার বিষদৃষ্টি তার সুখের চাঁদকে রাহুগ্রস্ত রাখিয়াছে, কিন্তু মা যেমন ছিলেন না—

বাপের স্নেহের বন্যা সে দুঃখকে ছাপাইয়াছিল, স্বামী-প্রেমের অক্ষয় আলো,— সে যে সব কালোকেই আলোকিত করিয়া দিয়াছিল, ফুলের সঙ্গে কাঁটা,—সে চিরদিনই তো গাঁথা থাকে, কিন্তু আজ কোথায় আলো?—কোথায় ওরে আলো?—আজ অন্ধকারময় কালোর ছায়াতেই যে চারিদিককার সকল আলোর রেখা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে,—কোথাও যে এর কোন কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাণ যে আজ থাকিয়া থাকিয়া তাই রুদ্ধ কাতর স্বরে উর্দ্ধে চাহিয়া আর্ত্ত চীৎকারে কাঁদিয়া উঠে। ডাকিয়া বলে, "কোথায় আলো?—ওরে কোথায় আলো।"—কিন্তু কোথায়?—ওরে কোথায় সেই ইপ্সিত কাঙ্ক্ষিত আবাধিত আলোকের এতটুকু রশ্মিরেখা! কোথায় রে,— কোথায়? ইন্দ্রাণীর সারা জীবন এ কি নির্ম্মম অন্ধকারের বিরাট গহ্বরে চির-সমাহিত হইয়া গেল? কেমন করিয়া এ অসহ্য আঁধার ঠেলিয়া সে তার নব-যৌবন বিকশিত এই তরুণ জীবনকে অবসানের অস্তাচলে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে? সে যে বড় দীর্ঘ পথ,—পাথেয় তার যে স্বল্প।

খুব বড়-রকম একটা আঘাত লাগিলে প্রথম যখন সেটা পাওয়া যায়— অনুভূতি তাহাকে ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। ক্রমে অসাড় চিত্তবৃত্তি যত সজাগ হইয়া উঠিয়া সেই আঘাত-ব্যথাকে সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিতে থাকে, বেদনা ততই অসহ্য হইতে অসহনীয় হইয়া উঠে। ইন্দ্রাণীর সুবিপুল বেদনাভাবে বিদ্ধ অসহ্য ব্যথায় ব্যথিত চিত্ত দিনে দিনে পলে পলে যেন মরণ-যন্ত্রণা অনুভব করিয়াই জীবিত রহিল। তার মনে হইল তার বিশ্বে যেন মহা-প্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে, এ যেন একটা যুগ-সন্ধি! এর মধ্যে যেন তার পরিচিত জীবনের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সব এলোমেলো ঝাপ্‌সা। তা' এই রকম ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবন লইয়াই তো সংসারের সাড়ে তিন ভাগ লোকে বাঁচিয়া থাকে,— সেও রহিল। উপায় কি?

মঙ্গলা ঠাকুরাণী জামাই মরায় সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে কর্তৃত্ব-শক্তিটাকে কাজে

লাগাইতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে পূর্ণেন্দু বাড়ী থাকিলে মাথায় একটুখানি আঁচল চাপা দিতেন—দাসী, চাকর, প্রতিবেশিনী, কাক, পক্ষী, গোরু, বাছুর অথবা ইন্দ্রাণী এতন্মধ্যে কাহারও প্রতি কটূক্তি প্রয়োগকালীন পূর্ণেন্দুর কানকে কথঞ্চিৎ বাঁচাইবার প্রয়োজন ঘটিত ;—এখন সে পাট নাই,—অধিকন্তু জামাইএর বিষয়-সম্পত্তি ইন্দ্রাণীর দলের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য খাটো থান-ফাঁড়ায় অর্দ্ধাবৃতা হইয়া ভিন্ন-পাড়ায় উকিলের পরামর্শ খুঁজিতে যাইতেও পিছপা ন'ন। পূর্ণেন্দুর মরণে তাঁর শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীকে কেহ কেহ যে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন, সে তাদের বুদ্ধিভ্রম বলাই উচিত,—এমন কথাটা হঠাৎ বলিতে লজ্জা লাগে, তবে এই দুর্যোগটাকে অবলম্বন করিয়া তাঁর জীবনে যে সুযোগগুলি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সে কথাটাকে চাপা দিলেই তো চাপা পড়িবে না।

আরও একজন এই মর্ম্মান্তিক অকাল-বিয়োগে লঘু বোধ করিতেছিল। সে পূর্ণেন্দুর একমাত্র পুত্র বিমল। হ্যাঁ,—বিমলেন্দু সংসারের মধ্যে বাপকেই যা একটু ভয় করিত, তাঁর অবিদ্যমানে সে যতটা উদ্দাম অত্যাচার চালাইত, পিতার উপস্থিতিতে সেরূপ ভরসা করিত না। বিশেষতঃ পড়াশোনায় অবহেলা, স্কুল কামাই, স্কুল-পালান, বাড়ীতে ইন্দ্রাণীর কাছে পড়া না দেওয়া—এ সব বিষয়ে পূর্ণেন্দুর অবিদ্যমানেও যে কিছু গলদ ঘটিত,—বিমল দেখিত, তার জন্যও তার নিস্তার ছিল না, পূর্ণেন্দু বাড়ী আসিয়াই এইসব তদারক করিতেন; এবং ইন্দ্রাণীই যে তাঁর গুপ্তচর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি!—ফলে প্রায়ই সে এই সব অপকর্ম্মের জন্য মার বকুনি খাইত। এ লইয়া দিদিমা-নাতিতে অনেক কাণ্ডই করিয়াছেন, কিন্তু সৎমায়ের এই 'খলোমী' কিছুতেই ছাড়াইতে পারেন নাই। বিমল বাপের কাছে ভর্ৎসিত ও প্রহৃত হইয়া আসিয়া তার সাতগুণ শোধ মায়ের উপর তুলিত। তার পর কাঁদিয়া গিয়া দিদিমাকে লাগাইত, "দেখ না দিদা! বাবা এলেই বৌ সব কথা ওকে বলে দেয়, আমায় মার খাওয়ায়।"

দিদিমা ইন্দ্রাণীকে শুনাইয়া মুখ ঘুরাইয়া ছেলেকে সান্ত্বনা দিতেন, "ভাল-থাকি ঐ করতেই তো এসেছে যাদু! নৈলে সৎমা আর বলেছে কেন?"

এ সব জ্বালার অবসান ঘটিয়াছিল। বিমল দেখিল দিনের পর দিন চলিয়া গেল মাসের পর মাস কাটিল,—তাহাকে শাসন দমন করিবার সেই যে একটি মাত্র লোক এ পৃথিবীর মাটিতে হাঁটিত, সে আর এ বাড়ীতে পা দিল না।—সে এমন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল কোথা? মনে তার কৌতূহল যে জাগিত না, তা নয়, তথাপি সে সম্বন্ধে খোঁজখবর করিতে গেলে যদিই বা হঠাৎ সে ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া কঠিন হস্তে কান ধরিয়া টান দিয়া বলে, 'পাজি নচ্ছার ছেলে! ঘুড়ি ওড়ানোর যে বড্ড সখ হয়েছে দেখছি!'—অত কষ্টের বোতল-চুরের মাঞ্জা দেওয়া সূতাসুদ্ধ লাটাই ঘুড়ি সব কাড়িয়া লইয়া পুকুরের জলে ফেলিয়াও দিতে পারে!—অথবা অহিফেন-প্রসাদাৎ ঝিমাইতে তৎপর—পণ্ডিতমশাইএর দীর্ঘ শিখাটি তাঁর চৌকির সহিত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া সেই যে সে এক করুণরসের অবতারণা করিয়াছিল, অথবা স্কুলের পড়ায় কি অবহেলা করায়, স্কুলের মাষ্টার তাহাকে এক ঘা বেত মারায়, সেই বেত মাষ্টারের হাত হইতে টানিয়া লইয়া সপাসপ করিয়া সেই যে সে তাঁকে পিটাইয়া দিয়াছিল, যা লইয়া রামদয়াল আসিয়া অনেক হাঁটাহাঁটি,—ঘাট-মানামানি করিয়া মিটাইলেন,—অথচ সে একটা চড়ও খাইল না।—এ সবের জন্য কি জানি কি ভয়ানক শাস্তি দিয়াই বা বসেন।—কাজ কি? তবে বিমল নেহাৎ কচি ছেলেতো নয়। পিতা যে হঠাৎ কলিকাতায় চিকিৎসা করিতেই গিয়াছেন, এও সে ঠিকমত বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তা ভিন্ন পাঁচজনের মুখেও কিসের একটা আভাস সে পাইত।—তাই একদিন তারা যখন হঠাৎ বলিয়া বসিল, "দাদি! আমার বাবা কখন আসবে দাদি?" তখন নিজের সন্দেহ অনুসারেই বিমলের মুখ দিয়া আচমকা বাহির হইয়া গেল, "তোর বাবা তো আর আসবে না তারা!—বাবা যে মরে গেছে।"

মৃত্যু কি, তারাব তাহা ধারণা ছিল না ; কিন্তু ঐ 'আর আসিবে না' কথাটা তাহাকে বড বেশী বিঁধিল। সে দুই চোখে জল ভরিয়া ফুলা ঠোঁটে কাঁদো-কাঁদো হইযা বলিল, "তবে আমায কে' আদর কল্‌বে ?

বিমলেব এ কথাটা আদপে ভাল লাগিল না সে অভিমান-ক্ষুণ্ণ অনুযোগে জবাব দিল, "কেন, বাবা ছাডা কি তোকে কেউ আদব করবার নেই ? কেন, আমি কি তোকে আদব কবিনে ?"

তারা সে কথায কান না দিযা, ফুলিযা ফুলিযা কাঁদিযা উঠিযা কহিতে লাগিল, "না দাদি ! বাবা আসবে, বাবা আসবে, বাবা যে আমায খুব ভালবাসে, —বাবা যে আমায আদল্ কলে,—বাবা আস্‌বে দাদি ।"

ঘোব অভিমানে পরিপূর্ণ হইযা বিমল কহিল, "আসতে হয় আসুক না, আমার আমি কি জানি ! বাবা কি আমায ভালবাসতো যে আমি তার জন্যে তোর মতন 'আসবে, আসবে' কবে নাকে কাঁদতে বসব ? তুই বাবাব আদুরী মেযে, তুই তাব জন্যে কাঁদ্‌গে যা ।"

এই বলিযা রাগ কবিয়া সে বোনটিব নিকট হইতে জোরে জোবে পা ফেলিযা চলিযা গেল, এবং হাঁকডাক করিয়া দিদিমাকে জানাইল তার লাটাই ভাঙ্গিয়া গিযাছে—নূতন লাটাই কিনিবাব জন্য তাহাব এই মুহূর্ত্তেই একটা আস্ত টাকা চাই । দিদিমা বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা ! ওই বলে যে এই কালকেই একটা টাকা নিযে গেলি, কি কবলি সে টাকা ?"

বিমলেন্দু বলিল, "সেটায় তো বোনটিকে একটা কাঁচের পুতুল কিনে দিযেছি, আজ একটা শিগ্‌গির বাব করে দাও ।"

মঙ্গলা ঠাকুরাণী দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিযা উঠিলেন, "তাই তো গা ! ছেলের আমার বড্ড যে আবদার ! আমি ওঁকে টাকা বার কবে করে দেব, আর উনি তাই দিয়ে দিযে ওঁব সোহাগের বোনের পা পূজো করবেন । বলে, 'বাঁচিনে বাঁদরের জ্বালায়'—তাই হযেছে আমাব ।"

বিমলেন্দু মুখখানা পেঁচার মত গম্ভীর করিয়া বলিল, "নাঃ, এবার তো আর সেটি হচ্চে না, বোনটির সঙ্গে ঝগড়া করিছি যে।—দিয়ে দাও দেখি, লাটাই কিনে আনি। বল ত কিনে এনে তোমায় দেখিয়ে যাব খন'।"

দিদিমা টাকাটি বাহির করিয়া আনিয়াও অর্দ্ধ অ-বিশ্বাসে সংশয়ের স্বরে কহিলেন, "হেঁ, তোমার ঝগড়া তো! এক্ষুনি সে ছোট-ভাইনীর চাঁদমুখ চোখে পড়লেই মুণ্ডু ঘুরে যাবে। ওর মা তোর বাপকে তুক্ করেছিল—আর, মেয়েকে দিযে করিযেছে তোকে।"

বিমল বিরক্ত ঔদাস্যে মাথা নাড়া দিয়া কহিয়া উঠিল, "হ্যাঃ, 'তুক্' করালে তো বত্তই হোল! আমি কি না আমার বাপের মতন। আর কি না সাত-জন্মেও বোনটির সঙ্গে কথা কবো? দাও, দাও, টাকা দাও শিগ্‌গির করে, ঘুড়ি নাটাই নিযে কানাই বিষ্ণুদেব সঙ্গে ঘুড়ির 'প্যাচ' লাগিয়ে আসি, সন্ধ্যের আগে, কিন্তু আজ বাড়ী আস্‌চিনে, তা বলে রেখে গেলাম।"

দিদিমা হৃষ্ট হইযা একটা আস্ত টাকাই দিয়া দিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, "তা এসো না। ছেলেমানুষ একটু খেলতে না পেলে প্রাণটা বাঁচবে কেন? এলেই তো তোমাব 'লীলাবতী'-'কলাবতী'-সৎমা বই নিয়ে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি লাগিয়ে দেবে। তুমি দেবি কবেই এসো।"

বিমল লাফ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল। টাকাটা একবার ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গিযাছিল, কুড়াইয়া লইল।

সে শব্দটা ইন্দ্রাণীর কানে গিযাছিল। সে ঘরের মধ্যে কি করিতেছিল তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল—"বিমল।"

বিমলের কর্ণে সে ডাক পৌছিলেও তাহার জবাব দেওয়া দরকার সে বোধ করিল না। যেহেতু আহ্বানের কারণ সে না বুঝিযাছিল এমন নয়, বরং বামাল-সুদ্ধ ধরা পড়ার ভয়ে ছুটিয়া পলাইল।

বিমলের বদলে ইন্দ্রাণীর ডাকের উত্তর দিলেন বিমলের দিদিমা। 'মিলি-

টারী' চালে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যেন সেনাপতির মত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা, ওকে পিছু ডাকচো ?"

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ওকে আজও আবার টাকা দিয়েছেন ?"

—মঙ্গলা জবাব দিলেন, "হুঁ, দিয়েছি।"

জবাব-দিবার ধরণ দেখিয়াই ইন্দ্রাণীর এ লইয়া আর কথা কহিতে ভরসা বা প্রবৃত্তি রহিল না। তখন তাহাকে বাক্যবিমুখ ও প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া মঙ্গলাই ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিয়েছি তো হয়েছে কি ?"

ইন্দ্রাণী এবার উত্তর করিল, "কালও একটা টাকা দিলেন, আবার আজও দিলেন,—ছোট ছেলের হাতে অত টাকাকড়ি দেওয়া—" কথাটা সে শেষ করিল না।

মঙ্গলা শান্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, "ওর বাপ কি এমন দুটো টাকাও রেখে যায় নি, যাতে করে ও দুটো-একটা খরচ করতে পারে ?"

ইন্দ্রাণী মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব আর এর কি আছে ?

"বলি, তোমরা তো ওর বাপের সবই লুটে নেবে,—আর ওকে ভিখিরির মতন দুটো দুটো খেতে দেবে—এই ঠিক করেচ। তার উপর আমি যদি আমার নিজের পয়সা থেকে দুটো একটা দিই তাতেও তোমার বুক কেন ধ্বসে পড়ে বলো তো ? কচি ছেলে—মা নেই, বাপ নেই,—এতটুকু একটু সখও করবে না ? বাঁচবে কি করে ?"

এই বলিয়া কান্নাভরা কণ্ঠে "হায় রে সুষি !—পূণ্যু !"—বলিয়া একটা ঝড়ের মত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই চাহিয়া দেখিলেন, ইন্দ্রাণী আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছে !—কি কথা স্মরণে ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো,—শোন শোন ! কালকের টাকাটা দিয়ে দুখে তোমার মেয়েকে যে পুতুলটা কিনে দিয়েচে, তার দামটা তুমি আমায় বাছা, দিয়ে দিও। আর আজকের এই

টাকাটা,—তার নাটাই কেল্‌বার টাকাটাও—দিও আমাকে। ওর বাপ ঢের টাকা বেখে গ্যাছে। যতদিন না সাবালক হচ্চে,—জানি আমি দুঃখ ওকে পেতেই হবে,—তবে অতটা-দিও না, যা সয় রব তাই করো।"

এই ভাবেই তাবা ও বিমল বাড়িতে লাগিল। দিন কাটিয়া বৎসবের পর বৎসব আসা যাওয়া করিতে লাগিল। স্বামী হাবাইযা যেখানে কেমন করিয়া একটি বেলা কাটাইবে এই ভাবনা ইন্দ্রাণীর আত্মীয-জনে ভাবিযা পায় নাই, সেই আশ্রযেই পতিহীনা ইন্দ্রাণীব দীর্ঘ-দীর্ঘ বৎসর গত হইতে লাগিল কেমন কবিযা সেই কথা ইন্দ্রাণীও ভাবিযা পায না! অথচ দিনও কাটিযা যায়। প্রথম কিছু দিন নিজের কথা সে ভাবিতে পাবে নাই,—আচ্ছন্ন মোহ~~বিষ্ট ভাবেই~~ পিতাব আদেশ পালন কবিযা গিযাছে। বামদযাল কন্যাব দুর্দ্দশাব ভয়ে তাকে যেদিন নিজের বাড়ী লইযা যাইতে চাহিলেন, সেই দিনই ইন্দ্রাণীর স্বপ্নাভিভূত চিত্তে বাস্তবেব বেখাপাত হইল। বৈধব্য যন্ত্রণার অসহ্য দাহ-জ্বালা তার কোথাও গিযাই জুড়াইবাব নয সত্য, কিন্তু সেই ক্ষতকে লবণাক্ত করাব যাতনা সেও বড় কম নয! মন তাব কাঙ্গাল হইযা উঠিযা যেন এই প্রস্তাবকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধবিতে গেল। পীড়িত হৃদযটাকে পিতাব স্নেহ-প্রলেপে যদি এতটুকুও সে জুড়াইতে পারে।—কিন্তু পবক্ষণেই সে কি এক অসহনীয অতীত চিত্রই তার অশ্রু-অন্ধ কাতর দৃষ্টিতে আগুনেব দাহ জ্বালাইযা দিয়া ফুটিয়া উঠিল।—উঃ কি সে করুণ আবেদন!—ওরে কি করুণ সে আবেদন! ইন্দ্রাণী যে আর কান পাতিতে পারে না।—"আমি যে আর পারি নে' ইন্দু! আমার পরেও তো তোমাব একটা কর্ত্তব্য আছে।"—সেই দুঃখ-দারুণ হতাশাব স্বর যেন সকরুণ মূর্ত্তি ধরিযা তার দুই কানেব তারে ফিরিয়া-ফিরিযা ওই দুটি কথা বলিয়া যাইতে লাগিল,—'আর যে আমি পারিনে ইন্দু!'—এই না পারার আবেদনটির মধ্যে

একটা অপরিতৃপ্ত তরুণ প্রাণের কত বড় আগ্রহ-আকাজ্ক্ষা যে সুপ্ত ছিল!—সব থাকিতেও সেই সর্ব্ব-বঞ্চিত লোকটির সেই যে শুধু তাহাকেই বুকে টানিয়া লইয়া একটা ভালবাসার শান্তিনীড় রচনার উদ্দেশ্যে সব ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া যাইবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, সেই মুহূর্ত্তেই সে না বুঝিয়াছিল তা'ও তো নয়, কিন্তু আজ তাঁর বিরহ-বেদনার তাপে একান্ত সন্তাপিত চিত্ত সেই উপবাসী ক্ষুধিত চিত্তের কাঙ্গালপনা যেমন করিয়া নিজের বুক দিয়া অনুভব করিল, সে দিন তাহারই বুকের তপ্ত আদরের মধ্যে সে কি তেমনি করিয়া তা' পারিয়াছিল? কর্ত্তব্য স্থির করিতে সেদিনও তার দেরি লাগে নাই, আজও হইল না। নিজের বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণকে সে সেই ছেঁড়া সূতার পাকে জড়াইতে চাহিয়া মনকে এই কথা বলিল, "যখন তাঁকে একটু সুখী করতেই যেতে পার নি, তখন নিজে তুমি শান্তি খুঁজতে যেতে চাচ্চ কোন্ মুখে?"

দুঃখকেই বরণ করিবে স্থির করিয়া বাপের কোল সে প্রত্যাখান করিল এবং এবং দুঃখের সঙ্গেই মুখোমুখি করিয়া স্বামীর ভিটায় পড়িয়া রহিল। এখানে থাকিয়া বিমলের সে যে এমন কিছু উপকারে লাগিবে, এ ভরসা তার ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া যার জন্য স্বামীকে সে সুখী করিতে পারে নাই, তাকেই বা আজ ছাড়ে কি করিয়া? পদে পদে অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিয়া প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যেও একটা জ্বালাময়ী উন্মাদ সুখানুভবে সে স্বামীর স্মৃতির মধ্যে তাঁর কর্ত্তব্যের একবিন্দুও প্রতিপালন-সুখে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া রহিল। কালচক্র আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

যথাসম্ভব আড়ম্বরের সহিত বিমলেন্দুর উপনয়ন কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। দিদিমার সাধে এই বিষাদ-মগ্ন পুরে এই শুভকার্য্যোপলক্ষে রসোন-চৌকির বাজনা পর্য্যন্ত বাজিতে বাকি থাকিল না,—এবং নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও বড় কম হয় নাই। মঙ্গলাদেবীর তরফ হইতে আসিয়াছিলেন কয়েকজন আত্মীয় এবং আত্মীয়া—এ পক্ষের কেহই নয়। সারদা প্রভৃতির উপর ইন্দ্রাণীর বিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলাদেবীর জাতক্রোধ,—তিনি বিশেষ করিয়াই উহাদের এ বাটিতে আসা নিষেধ করিলেন। তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধে কাজ করিবেন—রামদয়াল বা ইন্দ্রাণীর সে শক্তি ছিল না।

ইন্দ্রাণীর পিঠের উপর পড়িয়া বিমল বলিল, "বৌ। তোমার সেই বড় গার্ড-চেনটা আর বাবার হীরের আংটি আর ঘড়ি তুমি আমার পৈতের যৌতুকে দেবে ত?"

ইন্দ্রাণী মৃদুস্বরে জবাব দিল, "দেব।"—কিন্তু—কিন্তু তার বিবাহের সেই আংটি বাহির করিবার সময় সেই আংটি-পরা হাতখানি স্মরণে আসিয়া তার একটা নিঃশ্বাস পড়িল।

রামদয়াল ইহাদের একমাত্র অভিভাবক। কাজেই আজ চারি বৎসর ধরিয়াই মঙ্গলাদেবীর শ্লেষ বিদ্রূপ ও অত্যাচার পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও তাঁকে তাদের সকল প্রকার সুবিধার তদারকে আসা-যাওয়া তাঁকে করিতেই হয়, আদায়-উসুল সবই দেখিতে হয়। অতিবৃষ্টিতে কলিকাতার একখানা বড় বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িলে তার চাপে একটা চলন্ত মানুষ খুন হইয়াছিল,—তার ঠেলায়

এই বৃদ্ধের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিলেও সে সব হাঙ্গামাই তাঁহাকে পোহাইতে হইয়াছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই একদিন মঙ্গলাদেবী তাঁহাকে ও তাঁহার মেয়েকে শুনাইয়া শুনাইয়া নূতন ঝি নিস্তারের কাছে বলিতেছিলেন, "এখন যত পাবেন,—হাতের সুখে লুটে নি'ন—দুখে সাবালক হলে মামলা করে সুদটি সুদ্ধ বার করবে যখন, তখন না টের পাবেন!"

শুনিয়া নিরভিমান বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়াছিলেন, যেন তাঁর জামাইয়ের ছেলেটি সাবালকই হইতে পায়। তিনি সেই দিনেই তাহাকে কয়েক বৎসরের হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় নিকাশ দিয়া যেন নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। ইহার পরেও যথাপূর্ব্ব তিনি নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেই লাগিলেন। আজ সেই উদ্দেশ্যেই এ বাড়ীতে পা দিবা মাত্র ছুটিয়া আসিয়া বিমল হুড়মুড় করিয়া তাঁর ঘাড়ে পড়িল,—"দাদামশাই! আমার পৈতেয় আপনি নিজের থেকে আমায় কি দেবেন?"

রামদয়াল সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে তাই বলো দাদা?"

বিমল যাহা ফরমায়েস করিবে তাহা সে ঠিক করিয়াই আসিয়াছিল, বলিয়া বসিল, "একখানা সাইকেল দেবেন তো?"

"হুঁ-উঁ।"

তখন বিমল বলিল, "আর ষ্টেট থেকে?"

রামদয়াল কথাটা না বুঝিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোত্থেকে?"

বিমল কহিল, "কেন, আমাদের 'ষ্টেট' থেকে?—সে আপনি কত দিচ্চেন আমায়?"

রামদয়ালের বিস্ময় বর্দ্ধিত হইলেও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া সহজ ভাবে জবাব দিলেন, "পৈতের সব খরচই তো দেওয়া হবে ভাই। মার তোমার

চেলি, চন্দন, টোপর, মালা, মঞ্জু-মেখলা—সবই।"

বিমল ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "সে তো ভারী খরচ!"

রামদয়াল নাতির বিরক্তিপূর্ণ মুখের উপর কৌতুক-দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তা'হলে তুমি কি রকম 'বজ্র খরচ' করাতে চাইছো, তাই বলে দাও না ভাই! নেড়া মাথায় কি একটি নাতবৌ এনে দোবো?"

বিমল তাঁর এই রসিকতা আমলে না আনিয়া ফস্ করিয়া বলিল, "তারার বিয়ে কি আপনারা একটুকু খরচেই সারতে পারবেন?"

এবার রামদয়ালের সহাস্য দৃষ্টি গম্ভীর হইয়া আসিল, কিন্তু ঠোঁটের হাসি তাঁর মিলাইল না। শান্ত স্বরেই কহিলেন, "তা' কি আর হবে রে ভাই! তোর মতন চোখ নিয়ে তো আর কেউ ওকে বিয়ে করতে আসবে না।"

বিমলের মুখের ললাট হইতে চিবুক, গণ্ড হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লোহিত-বর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তারা সম্বন্ধে এই যে ক্ষুদ্রতাটুকু বেফাঁস ভাবে তার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহার লজ্জা তার অপরিসীম হইতেও যেন অপরিসীম বোধ হইল। মুহূর্ত্তে অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠিয়া "যাচ্ছি কি না দিদার কাছে,—কি পাজিই হচ্ছে এই দিদাটা!"—অর্দ্ধোক্তির মত এই কথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া পালাইল।

রামদয়াল বড় দীর্ঘ করিয়াই নিঃশ্বাসটা ফেলিলেন। মন তাঁর এই পথভ্রষ্টের জন্য সত্য-সত্যই আজ আবার একবার বড় বেশী করিয়া সমবেদনা অনুভব করিল। ব্যথিত চিত্ত তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার ভাগ্য! আমি করবো কি! আমি তো তোমারই জন্যে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছিলাম। তোমার কপাল মন্দ, তাই নিতে পারলে না, কি করবে—ইচ্ছাময়ের যেমন ইচ্ছা!"

উৎসবের বাদ্য যখন বড় সোরগোল করিয়া বাজিতে লাগিল, তখন ইন্দ্রাণীর দুই কর্ণ চাপিয়া ধরিয়া উপুড় হইয়া পড়িবার জন্য অত্যন্ত লোভ হইতে

থাকিলেও সে তা' করিল না। আঙুলে হীরার আংটি ও গলায় হার পরাইয়া দিয়া ছেলেকে নিজের বুক হইতে ক্ষরিত করিয়া প্রাণ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গেলে ক্রমে ক্রমে যে যার ঘরে চলিয়া গেলেও এক ব্যক্তি এ বাড়ী ছাড়িয়া যে আর কখনও কোথাও যাইবে তার কোন লক্ষণ দেখাইল না, সে মঙ্গলাদেবীর ভাইপো।

ভাইপোটির চেহারা পিসিমার মত নয়।—ফুটফুটে টুকটুকে কার্ত্তিকের মত রূপ। গুণের সম্বন্ধে অন্যের কিছুই জানা নাই,—তার পিসিমারও নয়, তবে সে নিজেই তাঁকে গোপনে জানাইয়া দিয়াছিল যে, বিষয়-কার্য্যের তদারক করিতে মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করিতে,—এ সব বিষয়ে তার শক্তি এবং জ্ঞান দুই-ই নাকি অসাধারণ। অতঃপর আর কিছুই বলাবলির দরকার হয় নাই। বাকিটুকু বুঝিবার এবং বুঝিয়া তাহা কাজে লাগাইবার মত বুদ্ধি দেবী মঙ্গলার ঘটেই আছে।

'শুভস্য শীঘ্রম্'—এই শাস্ত্রবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তিনি রামদয়ালকে নেপথ্য হইতে তারাকে সাক্ষ্য রাখিয়া কথা কহিয়া বলিলেন, "দেখ গা! তুমি বুড় হয়েছ, চার-কাল ধরে পরের ঝক্কি নিয়ে কত খাটাখাটুনি করবে? তার চাইতে আমি বলি কি, এই আদায়-তসিল, হিসেব-পত্তর—ওসব আমার এই পূণ্যির সম্বন্ধী, বিমুর মামা, আমার ভাইপো—এই অমত্তকেই ভারটা দিয়ে দাও। কেমন গা! সেই ভাল হবে না?"—ছেলেটির নাম অমৃত।

রামদয়াল হ্যাঁ-না,—কিছুই বলিলেন না, কিছু করিলেনও না। পুনঃ পুনঃ ঘ্যান-ঘ্যানানিতে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইলেও ইন্দ্রাণী যখন ছলছল চোখে আসিয়া বলিল, "বাবা, ওর হাতেই সব দিয়ে দিলে হয় না?" তখনই তাঁর আসন টলিল। তথাপি যুঝিতে ছাড়িলেন না—বলিলেন, "কেন মা?"

ইন্দু কহিল, "না, এমনি বল্‌ছি। তোমার এই শরীর নিয়ে কষ্টের তো অবধি থাকে না, তা' এত দিন না হয় আমাদের কেউ ছিল না বলে নিরুপায়েই

খাটতে হচ্ছিল। এখন যখন একজন করবার লোক পাওয়া গেছে, আর সে যখন নিজে হতে ইচ্ছে করেই সকল ভার নিচ্ছে, তখন আবার অনর্থক কেন এত দুঃখ পাওয়া?”

রামদয়াল চিন্তিত ভাবে একটু হাসিলেন। মেয়েব মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, “ইন্দু! বিমলের যাতে ভাল হবে, সেইটেই তোমার দেখা কর্ত্তব্য। কে কি বলে না বলে সে শোনবাব তো তোমার দবকার নেই।”

তার পর আবও গোটাকযেক মাস এম্‌নি করিযাই চলিয়া গেল। বিমলের নেডা মাথায় আবার চুল গজাইল। সে পূর্ব্বের মতই দুর্দ্দান্তপনা করিয়া ঘরে উপদ্রব ও বাহিবে অত্যাচাব কবিযা তাবাব সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আডি ও প্রহরে-প্রহবে ভাব কবিযাই চলিতে লাগিল। তাবা তাব হুকুমের চাকরেবও শত গুণ বাডা ভাবে মন যোগাইযা চলিবে,—এই তাব দাবী। ইহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলে পৃথিবী রসাতলে যাইতে বাকি থাকিবে না। একদিন তারার মা তাবাকে বিছানা পাতিবাব আদেশ করিলেন। এদিকে ঠিক সেই সময়ই না কি বিমলেন্দুব চাবাগাছে জল ঢালিবাব কাল। সে যাই আসিয়া দেখিল, উহার কার্য্যে অবহেলা কবিযা তারা মাযের কাজ কবিতেছে, অমনি ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদী মহাক্রোধে তার মাথায় আগুন ধরিযা গেল। রাগে অবরুদ্ধ-বাক্ হইয়াই সে বজ্রধ্বনি অনুকবণে হাঁকিল, “তারা।”

“দাদা!” বলিযাই তাবার অর্দ্ধেক প্রাণ শুকাইয়া গেল।—সে ছুটিয়া আসিযা জোড়হাতে বিনতি কবিযা কহিল, ‘যাচ্চি ভাই, যাচ্চি ভাই,—এই এক্ষুনি আমি গিয়ে জল দিয়ে আস্‌ছি’—বলিতে বলিতেই সে দৌডাইযা চলিয়া যায; পিছন হইতে তার লম্বা চুলে একটা হেঁচ্‌কা টান মারিযা তার ব্যথায় আড়ষ্ট ভীত মুখখানাকে সাম্‌নে করিয়া নির্দ্দয় কণ্ঠে বিমলেন্দু হুকুম করিল, “খবরদার! তুমি আমার গাছে হাত দিও না, বলে দিচ্ছি।”

তার পর তার অলঙ্ঘ্য আদেশের বিরুদ্ধে একটি আঙ্গুলি লেহনেরও সামর্থ্য-

হীনা লজ্জা-বেদনা-বিপন্না বালিকাকে তদবস্থ রাখিযাই সে বিছানা টানিয়া মাটিতে ফেলিযা ফরসা চাদর ধূলা-পা দিযা মাড়াইযা, বালিসের ওযাড়গুলা খুলিয়া ছড়াইযা দিযা, নিজের সযত্নে আহৃত ও বহুযত্নে বর্দ্ধিত ফুলের গাছ কযটিকে টান মারিযা উপ্‌ড়াইল। সেই শিকড-ছেঁড়া চারা-কয়টা আনিয়া তারার গাযে ছুঁড়িযা মারিযা বলিল,—"হযেছে?"

দাদার এতবড় অত্যাচারেও মুখ ফুটিযা কাঁদিবার অধিকার তারার নাই। এর উপর যদি তার চোখে জল পড়ে, তা' হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে? অর্জ্জুনের যেমন প্রতিজ্ঞা ছিল, যুধিষ্ঠিরের রক্তপাতে ভূমি জীবশূন্যা হইবেন—এ ছেলেরও বোধ করি বা সেই রকমই কিছু আছে,—একে তো তারাকে শাসন করার পর সমস্ত পৃথিবীটাকেই তার নখ দিযা ছিঁড়িযা ফেলিতে ইচ্ছা করে।—এমন কি, তারা-ই আবার উল্টিযা বাদ পড়ে না।—আবার তার উপর ব্যথা পাইয়া সে যদি কাঁদে—তা হইলে,—'লণ্ড ভণ্ড হোক বিশ্ব, পুড়ে হোক ছাই ভস্ম'—এমনিই কিছু হযত বা তার ফল হয়।

আবার একদিন এমন ঘটিল,—পাড়ার এক বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ ছিল।—তারা নিমন্ত্রণে গিযা ফিরিতে রাত করিল, তার বিলম্বে বিরক্ত বিমলেন্দু অভিমান-ভরে সেই পূজাবাড়ীতেই যে অনাবশ্যকে গিযা বসিযা থাকিযা অধিক-তর রাত্রে বাড়ী ফিরিল—সে কথা না বুঝিযা ক্লান্ত তারা কাপড় ছাড়িয়া বিছানায ঢুকিযা ঘুমাইযা পড়িল। বিমল বাড়ী ফিরিয়া আশা করিতেছিল, তারা এখনি ছুটিযা আসিযা নিজের বিলম্বের জন্য সমুচিত কৈফিযৎ দিয়া, সারা দিনের সংবাদ তাদের বহুক্ষণের বিচ্ছেদ-নীরবতাকে সঞ্জীবিত করিবে, কিন্তু তেমনটা ঘটিল না।

অন্যদিন বিমলের খাবার তারাই আনে। পাঁচ বছর বয়স হইতেই সে এই কাজ করিতেছে। যখন ধরিতে পারিত না, তখনও দুহাতে বুকের কাছে ধরিয়া ধরিয়া সে থালা বহিযা আনিত। আজ তাহাকে খাবার দিতে আসিলেন

ইন্দ্রাণী। দেখিয়াই তার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। মুখ কালো করিয়া সে গুম্ হইয়া রহিল,—খাইতে বসিল না। কারণ বুঝিয়া ইন্দ্রাণী মৃদু মৃদু স্বরে কহিলেন, "তাবার শরীরটা ভাল নেই, সে শুয়ে পড়েছে বিমু। রাত হয়ে গেছে—তুমিও খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড।"

বিমল গম্ভীর মুখে জবাব দিল, "তাবার শরীর ভাল নেই বলে আমি কি এক্ষুনি খাবার ফেলে ডাক্তার ডাকতে ছুটবো না কি,—যে আমায় শোনাতে এলে? সৎমায়ের মেয়ের জন্যে অত আর কেউ করে না।"

ইন্দ্রাণী নিঃশব্দ-পদে সরিয়া গেলেন। একটুক্ষণ পূর্ব্বে যে বিমলেন্দুর—তাবার অনবধানতার ফল স্বরূপে না খাইয়া উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল,—এখন উহাকে অগ্রাহ্য দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে ভাল করিয়া খাইতে হইল।

এ ঝগড়া মিটিল কখন—বা কেমন করিয়া? সে খবর না রাখিলেও চলে। সূর্য্যের উদয়াস্তের সমতালেই এ ব্যাপার চলিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অমৃত বলিল, "পিসিমা,—আমি তা'হলে বাড়ী যাই; তুমি ত হাবলে।"

পিসিমা বলিলেন, "দাঁড়া না, এত ব্যস্ত হোস কেন?—আমি সব ঠিক করে নিচ্চি কি না। আগে বেমলকে তুই ভাল করে হাত কর দেখি।"

মঙ্গলা বলিলেন, "দেখ বৌ। তোমার বাপকে বলে কয়ে অমৃতর হাতে দুখের সম্পত্তির সব বোঝাপড়া করে দিইয়ে দাও। মিছে বৃদ্ধলোক খেটে খুন হন, সেটাই কি ভাল? আর এক কথা—তারি তো বড় হলো,—ওর সঙ্গে

তারিব বিয়ে দাও না,—তাহলে সকল দিকেই তো ভাল হয়।—বুঝলে গা। সেই তুমি কবো। ছেলের তো রূপ চোখেই দেখচো, কুলশীলও কারো না জানা নয়,—এক কথা পয়সা,—তা' ওবও নেহাৎ ভিক্ষে কববাব মতন কিছু দশা নয়। আর তা ছাড়া তুমিও তো কিছু দেবে। মন্দ হবে কি ?"

ইন্দ্রাণী শুধু মৃদুস্বরে কহিল, "তারা ত এই ন বছরেব।"

মঙ্গলা কহিলেন "ওমা। তবে কি আঠাবো বছবে বিয়ে দেবে না কি গো ? সে বাপু এ বাড়ী বসে তো হবে না। তোমাব বাপ যেমন তোমায় বাইশ বছর পর্য্যন্ত আইবড রেখে আমাব সর্ব্বনাশ টাকছিলেন, তেমন আবার কার মাথাটি খাবে ? পুণ্যি থাক্‌লে আমার অমৃতকে সে 'না' করতো না,—ওকে সে বড্ড ভালবাসতো। ওর রূপটা তো আর সামান্যি নয়।"

ইন্দ্রাণী নিঃপত্তিতে চুপ করিয়া রহিল। বুঝা গেল তার মন টলে নাই। সব অমনোনীত কার্য্যই সে যেমন ধীবতা ও দৃঢতার সহিত নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করিয়া যায়, সেই বকমই যে এই বিবাহের প্রস্তাবটাকেও করিবে ইহা মনে করিয়া মঙ্গলাব অত্যন্ত রাগ ধরিল। কিন্তু অভ্যাস না থাকিলেও, কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া উঠিয়া গেলেন।

অমৃতকে গিয়া এই যুক্তিটা জানাইতে সে হাসিয়া ফেলিল। মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসলি যে ?"

অমৃত উত্তর কবিল, "না হেসে কাঁদাই উচিত ছিল! আমার এই আটাশ বচ্ছর বয়েসে সাত বছবের খুকি যে গলায় গেঁথে দেবে ঠিক করেচ, তা ওকে মানুষ করে নিতেও তো আমার অন্ততঃ আরও সাতটা বচ্ছর বযেস বেড়ে যাবে। তাব পব এর মধ্যে যদি পটল তুলি তা' হলে তো বিয়ে করা আমার সার্থক হয়ে উঠবে।"

মঙ্গলা বলিলেন, "বালাই! ষাট! মরতে গেলি কিসের দুঃখে,—তোর শত্তুর যে, সে মরুক! তা দেখ্, ছোট মেয়ে বড় হতে বাকি থাকে না, কিন্তু

কোট থাকে অত ক'জনাব? পূণ্যুব অর্দ্ধেক বিষয ওই ডাইনী ছুঁড়ী তাকে দিযে লিখিযে নে'য় নি? তা' সে তো ওব ঐ মেযেতেই অর্শাবে। আমাব দুঃখে না পেলেও যদি তুই পাস,—তবু তো আমার প্রাণটায কতকটা স্বোয়াস্তি হবে।"

অমৃত পুনশ্চ হাসিযা ফেলিযা বলিল, "অমৃতে অরুচি কাব? তবে ওর মা যে মত কববে সে তুমি মনেও কবো না। তা যদি মনে কবে থাক, তা' হলে এতদিন একত্রে বাস কবে এখনও ওকে তুমি চেন নি।"

মঙ্গলা একেবারে লাফাইযা উঠিযা চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আমি আবাব ওকে চিনি নি! তুই বলিস কি রে পুঁটে? আমি ওকে খুব চিনিছি। ও মেযেব হাডে হাড়ে ভেল্কি খেলে, পেটে পেটে ওর বজ্জাতি। ওরই নাম 'মিটমিটে ডাইনি',—ওকেই বলে 'ছেলে খাবার রাক্কস!—তা' জানিস তুই?"

পিসিমার ব্যাখ্যা শুনিযা অমৃত হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "ছেলে খাবার মতলব যে ওব বিশেষ কিছু আছে, তা' তো বোধ হয় না, তবে ছেলের বিষযে যে ওরা আর কারুকে দন্তস্ফুট করতে দেবে সে তুমি ভেবো না। ঐ যে দুটি বাপ-বেটি, ওদের হটান বড সোজা নয। ওরা নাবালকের বিষয় ছাডবে না।"

মঙ্গলাব জিদের বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিলেই তাঁব জিদ চড়িযা যায়, তিনি ভাইপোর ঐ উদাস ভাব পছন্দ করিতে পারিলেন না, চটা মেজাজে বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কি রে পুঁটে? পুরুষ বেটাছেলে হযে তোর ঐ একটা টগরাপুঁটে মেযের সঙ্গে লডতে ভয়? আমায় বল না, এক্ষুনি আমি ওদের খপ্পর থেকে বিষয উদ্ধার কবতে পারি কি না পারি দেখিয়ে দিচ্চি। গালাগালির চোটে ভূত ছাড়ে আর—তা দেখ, ঐ ছোঁড়ি ছুঁড়িকে তোর বে'করবার সাধ আছে কি না, তাই বল্?"

উঠিয়া আসিয়া তার হাত ধরিল, "এসো বিমল!—এসো, এসো। আমি এই এতক্ষণ পিসিমাকে বলছিলুম যে, তুমি এখন পর্য্যন্ত একবার কল্‌কাতা যাও নি, একবার তোমায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।"

বিমল হৃষ্টচিত্তে আসিয়া বসিয়া পড়িল, সাগ্রহে বলিল, "তুমি আমায় নিয়ে চলো।"

"তাই যাবো। তবে তোমার দাদামশায়ের আদেশসাপেক্ষ। তিনি যদি দয়া করে মত করেন, তবেই হবে। এ তো আর আমার হাত নয় যে, উচিত বোধ করলেই সেই কাজটা করবো।"

বিমল তিক্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "আমি কারু অনুমতি চাই নে', কালই তুমি আমায় নিয়ে চলো মামা।"

অমৃত জিভ কাটিয়া ত্রস্তে কহিল, "সে কি কথা! ওঁরা হলেন তোমার গার্জ্জেন,—ওঁদের অমতে কোন কাজ কি আমি করতে পারি। ওঁর হুকুমটা আগে আনিয়ে নাও,—তারপর আমি তোমায় খুসী হয়ে নিয়ে যাবো। বেটা ছেলে, বড় হচ্চো;—জগতের সঙ্গে একটা পরিচয়ে আসা দরকার আছে বই কি! এই যে কূপ-মণ্ডুক করে রেখেছেন, এতে 'এনার্জ্জী'টা শুধু 'ওয়েষ্ট' হয়ে যাচ্চে।—কি যে সব ভাবেন।"

বিমল একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়া অমৃত মামার হাত চাপিয়া ধরিল। সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "তুমি আমায় নিয়ে চলো,—আমি কারু কথা শুনবো না,—আমি যাবোই।"

"ব্যস্ত হয়ো না। তা'হলে এক কাজ করো,—তোমার মাকে বলে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে চলো না হয়।—কিন্তু আমি যেন বিপদে না পড়ি দেখো বাপু!"

দিদিমা ব'ললেন, "টাকার ছালাতো ওর জন্যে মা-ঠাক্‌রুণ বার করে বসে রয়েছেন! হতো এ তারির কিছু—তবে না। হায় রে! তবু ওরই বাপের টাকা।"

বিমল ছুটিযা গিয়া ইন্দ্রাণীকে বলিল, "আমি কাল কল্‌কাতায় যাবো,—আমায় টাকা দাও!"

ইন্দ্রাণী বিস্মিতা হইলেন। ছেলেমানুষী আবদাব বোধে সান্ত্বনার সহিত বলিতে গেলেন,—"যাবে? বেশ তো, যেও,—বাবা আসুন, বলবো, তোমাকে আব তোমার বোনটিকে একদিন—"

মধ্যপথে গর্জ্জিযা উঠিযা বিমল তাহাকে থামাইয়া দিল, "তোমাব মেযেকে নিযে তোমাব বাবাব সঙ্গে আমি যাবো?—কক্ষনই যাবো না।—দাও আমায় টাকা,—আমি কালই যাবো, টাকা কেন দেবে না? টাকা তো আমাব বাবাব।"

ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে কে যেন তপ্ত লৌহেব ছেঁকা দিল। হায, হায! এমন কবিযা তার স্বামীব সন্তান,—একমাত্র পিণ্ডদাতা বংশধর, তাবই চক্ষের সাম্‌নে এমন কবিযা নষ্ট হইযা যাইবে,—আঁব সে নিরুপাযেব মত নিজেব অক্ষমতা লইয়া এ দৃশ্যেব দ্রষ্টা হইযা এখানেই বসিযা থাকিবে? অথচ এই ছেলের জন্যই না সে এ বাড়ীতে আসিযাছিল? আজও ইহাবই জন্য সে বাপের শান্তিময ক্রোড়ে পর্য্যন্ত স্থান লয় নাই। প্রকাশ্যে ধীর এবং স্থিব স্বরে কহিল,—"বিমল! টাকা সমস্তই তাঁর এবং তাঁব অবিদ্যমানে এখন তোমারই,—কিন্তু সে টাকা তো নষ্ট করবাব জন্যে নয বাবা! বড হলে তাঁব মত দেশের উপকারী ভাল ভাল কাজে সেই টাকা খাটাবার জন্যে তুমি সমস্ত হিসেব মিলিয়ে ফিরিযে পাবে। এখন থেকে ও-সব ভাবনা কেন? কল্‌কাতা তুমি কাল কা'ব সঙ্গে যাবে?"

বিমল চেঁচাইয়া বলিল, "যার সঙ্গে আমার খুসী আমি যাই না, তোমার তা'তে কি?"

ইন্দ্রাণী কহিল, "যার তার সঙ্গে আমি তোমায যেতে তো দেবো না।"

অমৃত ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি বলিযা উঠিল, "না, না,—যার তার সঙ্গে ও যাবে কেন? আমাব কল্‌কাতা যাবার কথা শুনে বিমল যাবার জন্যে ধরলে। তা আপনার যদি মত না হয় তো এখন থাকই না,—এর পর এক

সময় পিসেমশাইএর সঙ্গেই তখন—"

বিমল প্রবল বেগে মাথা নাড়া দিয়া, পা ঠুকিয়া উদ্ধত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি আলবৎ যাবো,—কেন যাবো না? আমার বুঝি কোন কিচ্ছুর সখ যায় না? আমি বুঝি কিচ্ছুই দেখবো শুন্‌বো না?—বা' রে!"

অমৃত তার পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহ-সান্ত্বনায় মাখাইয়া কহিতে লাগিল, "আহা তা' তো বটেই! তবে দিদিমণির যখন আমার সঙ্গে পাঠানয় আপত্তি হচ্চে, তখন কাজ কি বাবা! এবারটা নাই বা গেলে। মায়ের অবাধ্য কি হ'তে আছে? ছিঃ! মায়ের মনে কক্ষনো কষ্ট দিও না।"

প্রবল রোদনোচ্ছ্বাসের সহিত বিমল কহিয়া উঠিল, "ও কি আমার নিজের মা নাকি, যে ওর কথা আমায় শুন্‌তে হবে? ও তো তারার মা।"

"ছি ছি বিমল! ও কি কথা বল্লে বাবা? নাঃ, এ সব আমার পিসিমায়ের কাণ্ড! কচি বাচ্চা একটা—ও কি জানে,—খাঁচার পাখীর মতন ওকে যে বুলি শেখাবে, ও তাই কপ্‌চাবে বই তো না। রাম! রাম! কাজটা উনি মোটেই ভাল করচেন না।"

ইন্দ্রাণীর মনটা যেন একমুহূর্ত্তে এই সহানুভূতিকারীর উপর গলিয়া পড়িল। নিজের সন্দিগ্ধ অন্তরের সঙ্কীর্ণতায় লজ্জিত হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তার্থ সে তৎ-ক্ষণাৎ বিমলের কলিকাতা গমনের অনুমতি দিয়া ফেলিল। তারার সহিত সেদিন মিটমাট হইল না,—চিরনিয়মের এই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাড়ার ও স্কুলের একটি ছেলের সহিত মারামারি করিয়া শারীর-বলের অভাবে মারার চাইতে মার খাইয়া রক্তমাখা কাপড়ে বিমল বাড়ী আসিয়া দিদি-মার কাছে আছড়াইয়া পড়িতেই তিনি সর্পদষ্টের মত আঁৎকাইয়া উঠিলেন, "ওমা গো! আমি কোথা যাবো মা!—আমার ছেলের এ দশা কোন নচ্ছার করলে গো।"

বিমল কম্পমান কণ্ঠে সকল কথা জানাইলে তিনি তখনই তারস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিয়া ঘোষণা করিলেন,—"আয় দেখি,—সে হতভাগার মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে তাকে চিতেয় শুইয়ে দিয়ে আসি।"—এবং 'রণং দেহি,—রণং দেহি'—বলিতে বলিতেই উর্দ্ধশ্বাসে আততায়ীর উদ্দেশ্যে ছুটিলেন। বিমল পরাজয়ের লজ্জা মাথায় লইয়া কোন মতেই আর বিজয়ী অশ্বিনীর সম্মুখীন হইতে রাজী হইল না। অগত্যা একাই তিনি অশ্বিনী ও সেই অকাল-কুষ্মাণ্ডকে যে গর্ভে ধরিয়াছিল, সেই সুপুত্রবতী তার জননী—দুইজনকার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া রণজয়ী হইয়াই বিলম্বে বাড়ী ফিরিলেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য তাঁর চাইতে এতদঞ্চলে কা'রই বা আছে যে, তাঁহাকে জিনিবে? তিনি ডাল ভাঙ্গিতে হইলে, ডালের গায়ে তো কোপ বসান না, মূল ধরিয়া কর্ত্তন করেন।

অমৃত আসিয়া ইন্দ্রাণীকে বলিল, "মুখ শুকিয়ে বসে থাক্‌লে আর কি হবে দিদি? আমার পিসিমাটি দেখছি তোমার ছেলেটির পরকাল ঝরঝর করে দিচ্ছেন! এখনও তুমি ওকে রক্ষার উপায় করো।"

এই স্বল্প পরিচিতের প্রতি ইন্দ্রাণীর অসহায় চিত্ত ক্রমশঃই কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিতেছিল। আজ যখন নিজের ব্যর্থ কর্ত্তব্যের গুরুভারে তার হৃদয়ে

পাষাণ ভার চাপিয়া বসিয়াছে,—স্বর্গীয় স্বামীর ভবিষ্যদ্‌বাণী তুই কর্ণ-পটহ-বিদীর্ণ করিয়া করুণ তানে বাজিয়া চলিয়াছে,—'ওকে ওর শনিছাড়া করো ইন্দু!—না হলে এর পরে বড় পস্তাতে হবে!'—হায় ইন্দ্রাণী তখন নিজের সুনামটাকেই যে সবচেয়ে বড় মনে করিয়াছিল!—আর আজ? সেই সুনামটাই বা তার কোথায় রহিল? কেন সে তখন নিজের দুর্ব্বলতাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া তার সবল চিত্ত স্বামীর হাতেই এর প্রতিকার ভার ফেলিয়া দেয় নাই? নিরুপায় ভাবে বলিল, "আমি ত কোন উপায় দেখি নে দাদা!"

অমৃত এই বিশ্বস্ত সম্বোধনে প্রীত হইয়া বলিল, "উপায় খুঁজে বার করো,—বুদ্ধিমতী তুমি, হাল ছাড়লে হবে কেন? ওকে শনিছাড়া করতে হবে,—সে কি তুমি বুঝতে পারছো না?"

সেই "শনি-ছাড়া"!—ইন্দ্রাণী সর্ব্বশরীরে চম্‌কাইয়া উঠিয়া ব্যাকুল আর্ত্ত চোখে চাহিল,—"করবার পথ দেখিয়ে দিন, করবো;—তাই করবো এবার। সেবার আমিই পারিনি,—আমারই পাপে ও আজ ডুবে যেতে বসেছে।"

অমৃত পথ দেখাইয়া দিল। সে অনেক উদাহরণ দিয়া বুঝাইল, ওই উচ্ছৃঙ্খল প্রশ্রয়দাত্রীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া কিছুদিন কোন হিতৈষী ব্যক্তির সাহচর্য্যে রাখিলে এখনও বয়সে বালক বিমলেন্দুর এই দুর্দ্দান্ত ভাবটা দূর হইয়া পড়াশুনায় যত্ন আসিতে পারে। কিন্তু ইহার নিকট থাকিলে এই মাইনর স্কুলের চৌকাঠ পার হওয়াই তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাছে রাখা যায় বলুন?"

অমৃত কহিল, "তোমার চেয়ে হিতৈষী ওর আর তো কারুকেই দেখছি নে। তুমি যদি ওকে নিয়ে তোমার বাপের বাড়ী চলে যাও তাহ'লে—"

ইন্দ্রাণী কহিল, "তা'হলেও তো ওর পড়া হবে না। সেখানেও এই মিড্‌ল্ প্রাইমারী ছাড়া অন্য স্কুল তো নেই।—তা' ছাড়া—"

অমৃত চিন্তিত মুখে বাধা দিল, "হ্যাঁ, সে আমি জানি,—'তা' ছাড়া'—

এটা করা একটু বেশী শক্ত,—এই না ? তবে এক কাজ করো দিদি ! তোমার তো অবস্থা তেমন খারাপ নয়, ওর জন্যে একজন গার্জেন-টিউটার নিযুক্ত করে ওকে কল্‌কাতায় একটা বাসা করে সেখানে নিয়ে যাও। এখানে এইবার যদি ক্লাসে উঠতে পারে, আর তো পড়া হবেই না। কেমন ? এ হলে সুবিধা হয় না ? আর পিসিমাকেও সহজে রাজী করা যায়।"

ইন্দ্রাণীর চিন্তাম্লান মুখ একটুখানি উজ্জ্বল হইল। কৃতজ্ঞ নেত্রে চাহিয়া সে ত্বরিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "এ খুব ভাল হবে।" তারপর আবার একটুখানি ভাবিতে লাগিল, "কিন্তু তেমন উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে কোথায় ?"

অমৃত হাসিয়া কহিল, "ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় কি দিদি ? লোক পাওয়া যাবে,—তোমরা প্রস্তুত হও।"

ইন্দ্রাণী আবার দ্বিধায় পড়িল, "মার মত যে কি করে পাওয়া যাবে ! উনিও হয় ত যেতে চাইবেন। আর ওঁকে ফেলেই বা আমি যাই কি করে—"

অমৃত অসহিষ্ণু হাস্যের সহিত কহিল, "তোমার ঐ যে ভালমানুষী,—ঐতেই তুমি মাটি হতে আর মাটি করতে বসেছ ! আমার পিসিমার মত করানোর ভার আমার বৈলো,—তুমি ছোট পিসেমশাইকে আস্‌তে চিঠি লেখো। তাঁর পরামর্শ তো আগে চাই। যদি ছেলেটিকে বাঁচাতে চাও তাহ'লে আর ইতস্ততঃ করে সময় নষ্ট করো না।"

রামদয়ালের অসম্মতির কোন কারণই ছিল না। তিনি আসিয়া সানন্দে স্বীকৃতি দান করিলেন। যেটা সবচেয়ে কঠিন ছিল, সেই কাজটা, মঙ্গলাদেবীর সম্মতি আদায়ের ভারটা অমৃত নিজের ঘাড়ে না লইলে. অবশ্য অপর কাহারও ঘাড়ে দুইটা মাথা ছিল না যে, এমন কথা তাঁর কর্ণগোচর করিতে সাহসী হয়।

মঙ্গলা এই দুঃসংবাদ পাইয়া, প্রথমতঃ একচোট চীৎকার শব্দে কাঁদিলেন। তারপর ক্রোধে-অভিমানে অধীরা হইয়া ভাইপোকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এ যে দেখ্‌ছি আমি খাল কেটে কুমীর ডেকে আমলুম রে !"

অ্যা !—তুই-ও শেষে ঐ চাঁদমুখ দেখে গড়িয়ে পড়ে, ওই চরণের চুট্‌কি হয়ে বাজতে লাগলি পুঁটে ? এই কি তোর ধর্ম্ম হলো,—হ্যাঁ রে ?"

অমৃত দুই কানে আঙ্গুল গুঁজিয়া জিভ কাটিয়া বলিল,—"রামচন্দ্র ! কি যে তুমি বলো পিসিমা,—তোমার মুখের যদি এতটুকু আগল আছে ! আচ্ছা, এই কথা যে তুমি বল্‌চো—তা, এখানে ঐ বাজে ইস্কুলে ফেলে রেখে ওর আখেরটা তুমি যে মাটি করচো, এইটেই বা তোমার কি রকমের ভালবাসা, তাই আমায় বলো তো ? একটা মাষ্টার পর্য্যন্ত ছেলের জন্যে রাখা হয় নি,—সঙ্গী জুটেছে একটা পুঁচকে মেয়ে,—সেইটেকে নিয়ে 'ও তো উন্মত্ত,—পড়ে কখন ? সে সব কিছু দেখ ?"

মঙ্গলার মনটা অনেকখানি নরম হইয়া আসিল এবং এই প্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় অতিশয় হৃষ্টচিত্তে ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "দেখ,—তোরাই সব দেখ,—দশে-ধর্ম্মে দেখুক ! আমি কি আর সাধ করেই জ্বলে মরি ? না, 'ওই মিট্‌মিটে ডাইনীর, আর সেই বুড়ো-ঘুঘুর বাপের শ্রাদ্ধ শুধু-শুধুই করতে ইচ্ছে করে ? যাতে ছেলেটা মানুষ না হয়ে ভূত হয়ে থাকে, ওরা তাই তো চায় রে। তা' না হলে বলে কি না, 'মাষ্টার রেখে কি হবে ?—ওর ওই সামান্য পড়া, ও আমার ইন্দুই পড়াবে।'—ও মা ! মেয়েমানুষ যে আবার ইস্কুলের পড়া পড়াতে জানে, এ তো আমার বাপের জন্মেও কখন শুনিনি।"

অমৃত মৃদু হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, "ও সব চাল্‌।"

মঙ্গলা কহিলেন, "আহা, তাই বল্‌, তাই বল্‌ বাবা। হাজার হোক তোর তো একটা রক্তের টান আছে। তুই যেমন ওর ভালটি খুঁজবি,—সেটি কি আর ওরা পারে। তা, যাতে ওর ভাল হয়, তাই কর্‌ না, গোপাল আমার। চল্‌ তো'তে আমাতে ওকে নিয়ে কল্‌কাতা যাই !"

অমৃত কহিল, "তাই চলো পিসিমা। তবে একটা কথা,—এখানের সংসার-টাকে তুমি যদি হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে চলে যাও, তাহ'লে এটাও তো লণ্ডভণ্ড হয়ে

যাবে।—ফিরে এসে এব মধ্যে ঢোকাই তখন তোমাব পক্ষে দায় হবে নাকি? আপাততঃ ওই না হয যাক্—তুমি কাযেমী ভাবে এটার কিছু বিলি-ব্যবস্থা করে ওখানে যেও, কি বলো?"

মঙ্গলাব এ প্রস্তাবটা খুব মনঃপূত না হইলেও অর্দ্ধ-সম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখি।"

অমৃত ইন্দ্রাণীকে গিযা বলিল, "আব তা' হলে দেরি না,—এইবাব চট্‌পট্ বেডিযে পডো দিদি।—কখন আবাব কি রায বাব হয। তবে গার্জ্জেনটিউটার এক্ষনি পাওযা,—তা' সে কল্‌কাতায গিযে দেখা যাবে।"

বাধা দিযা ইন্দ্রাণী কহিল, "তাব তো কিছু দবকাব নেই,—আমি বাবাকেও বলেছি—তাঁবও মত আছে,—আপনিই ওব গার্জ্জেন-টিউটার হবেন।"

অমৃত সাশ্চর্য্যে চক্ষু বিস্তৃত কবিযা চাহিল। তাব পব দ্রুতবেগে মাথা নাডিযা আপত্তি প্রকাশ কবিয়া বলিযা উঠিল, "ও দিদি না,—না, ও কাজটা কবতে যেও না,—সে কোনমতে হবে না। আমি তোমাদেব অন্য লোক জোগাড় কবে দোব। আমাব চাইতে দুহাজাব গুণে ভাল লোক তোমবা পেতে পাববে।"

ইন্দ্রাণী উহাব মুখে সেই অনিচ্ছুক ভীতি-লেখা পাঠ কবিযা প্রীতিমুগ্ধ কণ্ঠে কহিযা উঠিল, "আমবা আপনাব চাইতে অত ভালকে চাইনে'—আপনাকেই চাই। আপনি এ ভার না নিলে হবে না দাদা।—আপনাকে বোনেব এ আব্দারটি বাখতেই হবে,—'না' বল্লেও আমি ছাডবো না'। আর 'না' বলবেনই বা আপনি কি কবে? আমাদের আব আছে কে?"

নিতান্ত বিপন্ন ভাবে বিষন্ন মুখে অমৃত ঘন ঘন নিজেব গুম্ফ মর্দ্দন করিতে আরম্ভ কবিল, "তাই তো, তাই তো বোন।—এ যে তুমি আমায় বিষম মুস্কিলে ফেল্লে। আমি কি এ দায়িত্ব বইবার যোগ্য? আমি কি ঠিক করে পারবো? দেখ, এ বড় কঠিন দাযিত্ব, ছেলেখেলার ব্যাপার তো নয়। যদি আমার হাতে ওর ভাল না হয়ে কোন রকমে মন্দ হয়ে যায়,—তখন কি তুমিই

আমায় অল্প-বুদ্ধি বলে ক্ষমা করতে পারবে, না আমি নিজেই নিজেকে মাপ করতে পারবো দিদি? কাজ কি? বিশেষ জগতে যখন যোগ্য লোকের অভাব নেই!”

এই ছেলেটির ব্যবহারে ইহার নির্লোভ প্রকৃতিতে ইন্দ্রাণী উত্তরোত্তরই মোহিত হইতেছিল, সে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, “তোমার চেয়ে যোগ্য কারুকে আমি তো কই দেখি নে দাদা!”

অমৃত তৎক্ষণাৎ নত হইয়া দুই হাতে ইন্দ্রাণীর দুই পা চাপিয়া ধরিয়া তাহার উপর মাথা রাখিল, ভক্তি-গদ্‌গদ্ স্বরে কহিতে লাগিল, “ইন্দু দিদি। এই জন্যই আমাদের পক্ষে তোমাদের এতখানি দরকার। এই যে তুমি আজ আমার উপর এত বড় বিশ্বাস দেখালে,—এতেই যে সঙ্গে সঙ্গে কাঠ-খড়ের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এর প্রভাব যে কি সে বোঝান যায় না। নাঃ, আমিই এ ভার নেবো,—আর তোমার এই পায়ের ধূলোর সাহায্যে সে ভার বইবার সম্পূর্ণ যোগ্যও হবো আমি।”—এই বলিয়া সেই নবীন ভক্ত অপরিসীম ভক্তির উচ্ছ্বাসে সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া পুনঃপুনঃই ইন্দ্রাণীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

আকস্মিক এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া ইন্দ্রাণী উহার কার্য্যে বাধা দিতে পারে নাই, যখন বিস্ময়াবেগ প্রশমিত হইয়া আসিল,—ত্রস্তে সরিয়া বসিয়া সে দুই হাতে উহার প্রসারিত হাত ধরিয়া বাধা দিল, “করেন কি? আপনি আমার সম্মানিত ব্যক্তি, এমন করে,—” বলিতে বলিতে কিসের একটু শব্দে মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, কালো অন্ধকার মুখে মঙ্গলাদেবী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন,—সরিয়া যাইতেছেন। অমৃত পিছন ফিরিয়া ছিল, তাঁহাকে দেখিতে পাইল না!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিমলেন্দুকে লইয়া অমৃত কলিকাতায় চলিয়া গেল। সমস্ত উদ্যোগ হইযাও শেষ মুহূর্ত্তে ইন্দ্রাণীর যাওয়া হইল না। রামদয়াল উপস্থিত ছিলেন,—বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! কেন মা?"

ইন্দ্রাণী জবাব দিল, "ইচ্ছে হচ্চে না বাবা।"

অমৃত খবর পাইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, "বিলক্ষণ! যাবে নাকি? তুমি না গেলে কার ভরসায় আমি তোমার ছেলে নিয়ে যাবো, বলো তো? নাও, ওঠো— ঠো,—সে হবে না। তোমারই জন্য আমি এই কঠিন কার্য্যে সম্মত হয়েছি। আর এখন তুমি আমায় অগাধ জলে ঠেলে দিয়ে নিজে সরে পালাচ্চো! কি স্নেহময়ী দিদিটি গো আমার!"

ইন্দ্রাণীর দুই ইন্দীবর নেত্র বাষ্পজলে টলমল করিয়া উঠিল। কোন মতে সে নিজের পতনোদ্যত অশ্রু সম্বরণ করিয়া রাখিয়া সলিলার্দ্র হাসি হাসিয়া স্নেহ-স্বরে উহাকে সান্ত্বনা দিবার হিসাবে বলিল,—"সেই থেকে এ বাড়ীর বাইরে যাইনি, আর বুঝি কখন পার্ব্বোও না,—আমার এই সুখটুকু থাকতে দিন না দাদা! না হয় ছোট বোনের জন্যে এই কষ্ট স্বীকার আপনিই সবটুকু করুলেন। পার্ব্বেন না?"

সেই হাসি ও সেই মিনতি 'না' বলিবার পথ রাখে না। একান্ত ক্ষুণ্ণ ও নিরুদ্যম চিত্তে অগত্যা অমৃত একাই বিমলের সঙ্গী হইতে সম্মত হইল। তবে এই আশাটুকু প্রদর্শন করিয়া গেল, যে ভবিষ্যতে একদিন ইন্দ্রাণীকে তাহাদের শ্রীহীন সংসারের বিশৃঙ্খলা ঘুচাইতে যাইতেই হইবে। সে না গিয়া কোনমতেই থাকিতে পারিবে না, যখন দেখিবে যে সমুচিত খাওয়ার অভাবে তার ছেলের

ও এই অসহায় ভাইটার গলার হাড় বাহির হইয়াছে। ইন্দ্রাণীও ঈষৎ হাসিয়া তাহার কথায় অর্দ্ধসম্মতির ভাবে "সে তখন দেখা যাবে,—আমার ভাইটি অমন অক্ষমই বা হবেন কেন?"—এই বলিয়া কাটাইয়া দিল। কলিকাতা গমনোপলক্ষে বিমলেন্দুর আনন্দ এবং উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু যখন হইতে সে শুনিয়াছে, তারার যাওয়া হইবে না, তখনই তার অর্দ্ধেক আনন্দ ফুরাইয়া গিয়াছে। তারাকে গিয়া বলিল, "দেখ্ বোনটি। তুই খুব কাঁদ, তাহলে মা তোকে আমার সঙ্গে যেতে দেবে।"

তারা ইতিমধ্যেই কাঁদিতেছিল, এই কথায় কান্না তার দ্বিগুণিত হইল। সে রুদ্ধমান কণ্ঠে কহিল, "কাঁদলেও মা যাবেন না।"—বলিয়া অধিকতর আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিমলের নিজেরও কান্না পাইতেছিল, কিন্তু ক্রোধ আসিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলিল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আ মলো। খুকির মতন প্যানপ্যান করিস কেন? চল না, মাকে গিয়ে খুব মে॰ জ্বালাতন করি।"

তারা চোখ মুছিতে মুছিতে মাথা নাড়িয়া বলিল, "মার মনে দুঃখ হবে যে ভাই!"

বিমল দুই চোখ পাকাইয়া বলিল, "হলো তো বড্ড বয়েই গেল। তোর মা কি তোর দুঃখ আমার দুঃখ দেখচে যে, আমরাও দেখবো? না যাস থাক্ গে যা। যেতে পারি না তুই-ই, আমার কি?"

তারা আবার কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "মাকে আমি বলেছিলুম। মা বল্লেন, তাঁর যাবার উপায় নেই।—আবার কি করে বলব আমি?"

বিমল নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাভিমানে কহিল, "তা হলে তোর আমার সঙ্গে যাবার ইচ্ছেই নেই,—সেইটেই হচ্ছে আসল কথা।—বেশ, তবে থাক্।"

কিন্তু এ অভিমান সে বেশীক্ষণ রাখিতে পারিল না। আবার ক্ষণেক পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন সেইখানে উঁকি মারিতে গিয়া নজর পড়িল, যেমন ছিল

ঠিক তেমনি ভাবে বসিয়াই তখনও পর্য্যন্ত তারা নিঃশব্দে কাঁদিতেছে, অমনি তার অপরিমেয় স্নেহের উৎস প্রবল বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া ইন্দ্রাণীর পিঠে পড়িয়া ডাকিল, "মা।"

ইন্দ্রাণীর চোখে হুহু করিয়া খানিকটা গরম জল উথলাইয়া উঠিতে গেল। কষ্টে আত্মদমন করিয়া ইন্দ্রাণী উত্তর দিল, "বিমু!"

বিমল কহিল, "কেন তুমি যাবে না? বোনটি না গেলে কে আমায় খাবার দেবে? কে আমার বিছানা করবে? কে আমার সঙ্গে খেলা করবে? কা'কে আমি পড়াবো?"

ইন্দ্রাণী আঁচলে চোখ মুছিয়া অপরাধ-কুণ্ঠিত স্বরে কষ্টে কহিল, "ও এর পরে যাবে বিমু। —এ বারটি তুমি তোমার মামার সঙ্গেই যাও।"

বিমল কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিতে লাগিল,—"বোনটিকে না নিয়ে গেলে আমি যে গিয়ে থাকতে পারবো না। আমার যে কিছু ভাল লাগবে না। কেন ও যাবে না বলো তো? হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবে,—আমি নিয়ে যাবো।"—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ইন্দ্রাণী আবার চোখ মুছিল। তারা কেন যাইবে না? সে কেন যাইবে না? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো তার সাধ্যায়ত্ত নয়, তাই দিতে পারিল না। কেন যাইবে না? এ যে বড় বিস্ময়েরই কথা। এই সেদিন পর্য্যন্ত যে মাতুল-সম্পর্কীয় ব্যক্তি এ পরিবারের নিকট সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয়ের ন্যায় অপরিচিত ছিল, আজ সম্পূর্ণরূপে তাহারই হস্তে এই মাতৃ-পিতৃহীন অসহায় বালককে সঁপিয়া দিয়া এই যে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখিল, এই ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল, স্বামীর প্রতি এই কি প্রকৃত শ্রদ্ধা? স্বামীর পুত্রাপেক্ষা তাঁর ভূমি কি তৌল-দণ্ডের উপর দিকে উঠিয়া পড়িল না? এরই নাম কি ইন্দ্রাণীর কর্ত্তব্য-পালন?

ইন্দ্রাণী এ কার্য্য যে কত বড় মর্ম্মান্তিক আঘাতে আহত হইয়াই অনুমোদন

করিয়াছে; সে শুধু জানেন তার অন্তর্য্যামী! পিতৃহীন বিমলের প্রতি কর্ত্তব্যে সে তার বৃদ্ধ পিতার সেবার ভার লয় নাই। সেই বিমলকে এমন করিয়া অনিশ্চিতের মুখে ভাসাইয়া দিয়া সে যে এই সুখহীন,—শুধু তাই নয়, দুঃখের নিলয়ভূমি এই গৃহেই বাস করিয়া রহিল, এতে কি বুক তার ফাটিতে চাহে নাই? কিন্তু ফাটিলেই বা উপায় কি। অকাল-বৈধব্যের সহিত অসামান্য রূপ-যৌবন যে তার প্রায়ের বেড়ি হইয়া তার দুটো পা'কে জড়াইয়া ধরিয়া আছে। তার পক্ষে একান্ত অনাবশ্যক দুঃখের এই বোঝা বহিয়া তার যে এই ঘর ছাড়া কোথাও বাহির হইবার উপায় নাই।—এদের লইয়া করে কি সে? তাড়াইলেও এরা তো যায় না। ভিতরের অহর্নিশি অগ্নিদাহে ভস্ম না হইয়া পোড়খাওয়া পাকা সোনার মতই দিনে দিনে যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া, শুভ্র-বেশা, নিরাভরণা, সৌম্যমূর্ত্তি বিধবার চারি পার্শ্বে একটা জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিয়া তোলে। একে পরাভবের চেষ্টায় যতই না ইন্দ্রাণী নিজের শরীরকে কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত-উপবাসাদিতে পীড়িত করিতে চাহে,—অটুট ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়ম-সংযমে ততই তার সুপ্রচুর স্বাস্থ্যসম্পদে ভরা নীরোগ শরীর মানসিক বিপ্লবকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া অনৈসর্গিক রূপ-প্রভা ধারণ করিতে থাকে। এ সমস্যার সমাধান ছিল তখনই,—যখন বিধবার সকল ঐশ্বর্য্য তার স্বামীর চিতায় পুড়িয়া ছাই হইত!

আসল ব্যাপারটা এই,—সেদিনকার সেই ঘটনার অনতিবিলম্বে অমৃত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেই ঝড়ের মত বেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া মঙ্গলা ঠাকুরাণী এক ঝলক অগ্নি বৃষ্টির মতই উদ্গীরণ করিলেন,—"বলি হ্যাঁ গা, গায়ে খানিকটা হলুদে রং আছে বলে কি এমনি করেই চারটেকাল পুরুষগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে? জামাইকে আমার তো পায়ের তলার ছুঁচো করে রেখে কচ-মচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লে, আবার অনেক ভেবে চিন্তে, কত করে ভাইপোটাকে আনালুম যে, বলি, শত্তুর-পুরীতে তো আমার দুখের মুখ চাইতে কেউ নেই,—ও যদি রক্তের টানে একটু ওর মুখ চায়, তাই নয় দেখি।

ওটাকেও আবার তেম্‌নি করেই হাতে ধরে, পাযে ধরিযে, নানা হাবভাবে মেনি-বেবালটি কবে তুল্‌লে যে—এটা কি তোমার ধর্ম্ম হচ্ছে? এই যে তুমি সোমর্থ মাগী, একটা সোমর্থ ছোঁড়া নিযে না জানি কোন্‌ অকূলে ভাস্‌তে চল্লে,—এব কেলেঙ্কারীতে কি আব দেশে মুখ দেখাবার পথ খুঁজে পাবো? ছি-ছি-ছি, বৌ! শুনতে পাই নাকি বেটাছেলেব মতন লেখাপডা শিখেছ—তাতেই কি ধর্ম্মজ্ঞানটা এম্‌ন ধাবা টন্‌টনে হয়ে উঠেছে যে, এওটু হায়া-লজ্জাবও ধার ধাবো না—গলায দডি দাও।"

এই ভর্ৎসনাব উত্তবে ইন্দ্রাণী এতটুকু প্রতিবাদ পর্য্যন্ত না করিয়া কাঠের মত কঠিন হইযা থাকিল। এবপব এতদিনেব সঙ্কল্পই তাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।—বিমলেব প্রতি কর্ত্তব্যকে নিজেব নারী-মর্য্যাদাব চেযে সে নীচেই নামাইয়া দিল। নাবীর আব সব সয,—শুধু তাব নারীত্বের এতবড অবমাননা সহ্য হয় না।

অমৃত ইন্দ্রাণীব মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কবিল। কারণ না পাইয়া সে অকাবণে তাহাব প্রতি ইন্দ্রাণীর এই বিবাগকে তাব সেই আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের ফল মনে করিযা এবং তাহাকে ভুল বুঝিযা, বুদ্ধিমতী ইন্দ্রাণীর এত বড় অবিচার ভাবিয়া—যৎপবোনাস্তি ক্ষুব্ধ, এমন কি, ক্রুদ্ধও হইল। মনে মনে বলিল, 'যার জন্যে চুবি কবি,—সেই বলে চোর,—আমার তাই হলো যে!'

এমনি কবিয়া অনন্য-সহায বিমল, একমাত্র অমৃতকে অবলম্বন করিয়া কলিকাতায নির্ব্বাসিত হইলে মঙ্গলা-ঠাকুবাণীব উচ্চ ক্রন্দনে কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রতিবেশিবর্গ সন্ত্রস্ত হইযা রহিল। তাডনায ও কলহ-ঝঙ্কাবে ইন্দ্রাণীর অবিচলিত চিত্তকে বড বেশি টলাইতে না পাবিলেও ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ-দুঃখাভিভূতা ক্ষুদ্র তারা একেবাবেই অস্থিব হইযা উঠিল। সে যখন বিমলেব চিঠিব জবাব লিখিল, তার মধ্যে লিখিযা দিল, "দিদিমা আমায খুব বকেন, যেন আমাব জন্যেই তুমি কল্‌কাতা চলে গিয়েছ। তুমি নেই বলে আমাব বকুনি খেলে আরও বেশি কান্না পায়।"

অল্পদিন পরেই গুড্‌ফ্রাইডের ছুটি ছিল। অমৃত গৃহ-বিচ্ছেদ ব্যাকুলচিত্ত বিমলকে সঙ্গে লইয়া ছুটির কয় দিন যাপন করিবার জন্য ফিরিয়া আসিল। মাস-দুই কলিকাতায় থাকিয়াই বিমলের পাড়াগাঁর রোদ-পোড়া রং অনেক সাফ হইয়াছে, তার ঘাড়ের চুল সম্পূর্ণরূপে চাঁচা, সাম্‌নে বুলবুলি পাখীর ঝোঁটনের মত খানিকটা চুলে সুচারুরূপে টেরিকাটা। গায়ে তার স্বল্প শীতে আদ্দির চুড়িদার ও পরণে ইন্দ্রাণীর আমলের বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মোটা ধুতির পরিবর্ত্তে ম্যাঞ্চেষ্টারের চক্‌চকে কালাপেড়ে মিহি ধুতি। ছেলে এবং তার বেশভূষা দেখিয়া মঙ্গলা খুসী হইয়া অমৃতকে শতায়ু থাকিবার আশীর্ব্বাদ করিয়া, সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন, যথার্থ রক্তের টান—সে জিনিসই আলাদা। ঢং বাইরে দেখান যায়, কিন্তু তা'তে চিঁড়ে ভেজে না।

তারা দাদাকে একটু 'সমাঃ' করিতে থাকিলেও দাদার এই নূতন সাজ-পোষাকে, আকার-প্রকারে, সেও বিস্ময়ের সঙ্গে প্রীতও যে না হইয়াছিল তা' নয়। বিশেষ যখন সম্পূর্ণরূপেই তার কল্পনাতীত কতকগুলি সুন্দর সুন্দর উপহারবস্তু সে তার নিকট হইতে পাইল, আনন্দের সীমা রহিল না। শুধু একা ইন্দ্রাণীই একটা তপ্ত এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন পূর্ব্বক মৌনী রহিল। এর ভিতর এতটা পরিবর্ত্তন তার চক্ষে ভাল ঠেকে নাই।

গোপনে গোপনে কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ লিখিয়া বেনামীতে মাসিক পত্রে প্রকাশ করা ইন্দ্রাণীর একটা সখ ছিল। পিতা ভিন্ন এ সংবাদ কেহই এত দিন জানিত না। অমৃত সেটা হঠাৎ কি করিয়া আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া সেই মাসের সদ্য-প্রকাশিত একখানা 'তরণী' হাতে করিয়া আসিয়া হাসি হাসি মুখে ডাকিল, "অশ্রুদি।"

ইন্দ্রাণী নিজের ঘরের খাটে শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল,—ধড়-মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বিস্রস্ত বেশ-বাস সম্বরণ পূর্ব্বক তিরস্কারপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া অনুযোগে কহিল, "এ নিষ্ফল ডিটেক্‌টিভি করে কি হলো আপনার?"

তার চক্ষের সেই বিরূত অসন্তোষ এবং কণ্ঠের ক্ষুব্ধ তিরস্কার অনুভব করিয়া অমৃতের হাসি মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। কেনই যে এত সহজে এই তরুণী ব্যথিত হইয়া পড়ে, বিরক্ত হইয়া উঠে, ইহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পায় না। সে তো ইহাকে খুসী করিতেই চায়। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, ইহার হস্ত হইতেই এক দিন নিজের বিজয়-লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করিবে, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই সে যে ইহারই করুণা ভিক্ষা করিতে দাঁড়াইয়াছে। আজ তার মনে হইল, এ তার একান্তই দুরাশা। এই স্বল্প-ভাষিণী, অনবনত গর্ব্বের মহোচ্চ শিখরবাসীনা নারীর চিত্তে বাস্তবিক তাহার প্রতি অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিবার মতও সংসামান্য এতটুকু সহানুভূতি পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। সে যাহা শ্রদ্ধা-ভরে পূজার ভাবে করিতে যায়, এ তাহাকে উড়িয়া আসা তৃণ-খণ্ডের ন্যায় অনায়াস ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া সিংহাসনে সমাসীনা রাজ্ঞীর মতই নিজের অটুট মর্য্যাদার উচ্চাসনে অটল হইয়া থাকে। অমৃত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "কেন, কিছু দোষ করেছি ?"

ইন্দ্রাণী এ কথার জবাব পর্য্যন্ত দিল না দেখিয়া পত্রিকাখানা রাখিয়া ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে গিয়া দেখিল সম্মুখেই তার পিসিমা। পিসিমা মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রাণীও দ্বারপথে তাঁহাকে তেমন মুখ করিয়া যাইতে দেখিল।

এক সময়ে ইন্দ্রাণীকে ডাকিয়া মঙ্গলা একটুখানি নরম সুরে বলিলেন, "দেখ বৌ! তুমি আমায় পর ভাবলেও আমি তো তোমায় তা' ভাবতে পারি নে'। তোমাদের ভাল মন্দ আমাকে তুমি না বল্লেও তো দেখতে হয়,—তা আমি বলি কি, অমৃতর সঙ্গে তারার বিয়ে তুমি এই বোশেখ মাসেই দিয়ে ফেলো। লোকেও তা'হলে আর কোন কথা কইতে ভরসা করবে না। আর ছোঁড়াটাও যাহোক করে কূলে ফিরতে পারবে। বুঝতে পারচো তো, বেশি দিন তো কোন কথাই চাপা থাকে না, বাছা।"

ইন্দ্রাণী সহসা অগ্নিশিখার মত দীপ্ত হইয়া উঠিয়া উর্দ্ধস্বরে ডাকিল, "মা।" —তার পর আকস্মিক বিস্ময়াবেগে বিমূঢ়াবৎ অবস্থিত মঙ্গলার মুখের উপর অকম্পিত দীপশিখার ন্যায় দুই নেত্র তুলিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "অমৃতকে আমি নিজের ছোট ভাইএর মতই বিশ্বাস করেছিলুম, ভালও বাস্‌ছিলুম,—তা' না হলে বিমলের সকল ভার ওর হাতে আমি কিছুতেই দিতুম না। একদিন তারাকেও ওর হাতে দিতে পারলে আমি হয়ত খুসীই হতুম, তবে ওদের বয়সের বড্ড বেশি তফাৎ বলেই শুধু মন আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও সায় দিতে পারছিল না। হয়ত তারা বড় হলে একদিন সে মতও বদ্‌লে যেত, কিন্তু এই যে কথা আর এক দিনও তুমি বলেছিলে, তার চেয়েও বেশি করে আজও আবার বল্লে,—এর পরে অমৃতর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই রৈলো না। এর পর আমার তারা তো নয়ই,—বিমলকে পর্য্যন্ত আর আমি ওর হাতে রাখতে পারি নে'। আর তুমিই বা রাখতে দেবে কি করে, যাকে অত ছোট অতই নীচ বলে মনে করচো?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ইন্দ্রাণী দ্রুতপদে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে খিল লাগাইয়া দিল। তার পর স্বামীর তৈলচিত্রের সাম্‌নে মাটিতে আছড়াইয়া পড়িয়া আকুল হইয়া বুকভাঙ্গা কান্না কাঁদিতে লাগিল।

মনে মনে সেই পরলোক-নিবাসীর নিকট এই আবেদনই সে কাতর প্রাণে জানাইতে লাগিল,—যে, আমায় কি তুমি তোমার কাছে নিয়ে যেতে কিছুতেই পারো না?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ব্যাপার বেশ একটু ঘোরালো হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাণী সে দিনের পর হইতে অমৃতকে একেবারেই এড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে মঙ্গলাঠাকুরাণী ইন্দ্রাণীর এই অনভ্যস্ত উত্তেজিত ব্যবহারে ভয় পাইয়া গিয়া মনে করিলেন, হয় ত এইবার রাগ করিয়া ইন্দ্রাণী অমৃতকে তাড়াইয়া দিবে। এক দিকে ভাইপোর মায়া, অপর পক্ষে তাহার 'ভুখে' যে আবার আসিয়া সেই সংসারেরই পায়ের গোড়ায় আসন পাতিবে, সেই অসহ্য ঈর্ষার জ্বালা, এই দুটি ভয়কে সাম্‌লাইয়া চলিতে গিয়া তিনি একান্ত বিপন্ন বোধ করিতেই মাথায় একটা যুক্তি আসিয়া ঘা মারিল। চুপি-চুপি অমৃতকে ডাকিয়া আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, "আর শুনেছিস্ পুঁটে। আমাদের রাজরাণী তোর ওপর যে বড় চটে গেছেন।"

অমৃতের মনটা সত্যসত্যই বিগড়াইয়া গিয়াছিল,—সমস্তই তার যেন তিক্ত বিরক্ত ধরিয়া যাইতেছে—তথাপি, এই কথাটায় সে যেন বেত খাইয়া চমকাইয়া উঠিল। ব্যগ্র অথচ ম্লান হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অপরাধ?"

মঙ্গলা মুখখানা বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, মহামন্ত্রীর মত গম্ভীর করিয়া তেমনি স্বরেই জবাব দিলেন, "কেমন করে জান্‌বো বাছা! তবে ও-বাড়ীর বেথানের সঙ্গে বলাবলি হচ্ছিল—কানে ঢুকলো,—তাই যেটুকু শুন্‌তে পেলুম, আমাদের গিন্নি ঠাকরুণ খুব রুখে রুখে বল্‌ছেন, 'ওকে আমি দূর করে তবে ছাড়বো। যখন তখন ছুটে ছুটে আমার ঘরে ঢোকেন,—পায়ে ধরে আমায় অপমানের কথা বল্‌তে পর্য্যন্ত বাদ দেন নি,—ওঁর হাতে আমি ছেলে রাখবো? কোথাকার

একটা ছোট লোক ছোঁড়া।'—তাই বলি কি বাবা! কাজ কি তোর অত ঝঞ্ঝাটে।—না হয় ফকির-দুঃখী দুখের অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্,—তুই বাছা মানে মানে নিজের ঘরেই ফিরে যা'। কোন্ দিন হুট্ করে তোর নামে আরও কি নাকি অপবাদই বা দিয়ে বসবে। আমার ওতে বড্ড ভয়। ওসব কথা আমার বাপের রক্তে উঠলে আমি মাথা কুটে রক্তগঙ্গা হয়ে মরবো বাপু, তা তোকে বলে দিচ্ছি।"

একেই মন ভাল ছিল না।—ঘৃতাহুতি-প্রাপ্ত আগুনের মত একমুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া অমৃত উচ্চকম্পিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "বটে! এত ছোট মন ওঁর? উনি না শিক্ষিতা?—আচ্ছা, থাকুন উনি,—দেখি কেমন করে আমায় দূর করেন,—বিমল!—বি-ম-ল!"

বিমল ছুটিয়া আসিলে ক্রোধ-ক্ষিপ্ত অমৃত জ্ঞানশূন্য ভাবে তাহাকে হুকুম করিল, "আজই আমরা কল্‌কাতায় ফিরবো,—যাও, শিগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও।"

বাড়ী আসিয়া বোনটিকে পাইয়া বিমলের কলিকাতায় ফিরিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তার উপর এইরূপ অতর্কিত অন্যায় আদেশে সে ঘোর অসন্তোষের সহিত ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কালও তো আমার ছুটি আছে,—আজ কেন যাবো? আজ আমি যাবো না।"

অমৃত ক্রোধে তখন কাঁপিতেছিল। রুখিয়া উঠিল, "আজ তোমায় যেতেই হবে। আমার হুকুম বলে যাবে।"

বিমলেন্দুকে আজ পর্য্যন্ত কেহ কোন দিন 'হুকুম' চালায় নাই।—এ শব্দটা তাহার সম্পূর্ণই অশ্রুত। সেও ঠিক সেই এক রকমই রোখের সহিত জবাব গাহিল, "আমি কারু হুকুমের চাকর নই।"

তখন অমৃত আসিয়া বিমলের কান ধরিতেই, একদিক হইতে মঙ্গলা হাঁউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অন্য দিক হইতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া

ভাবা ছুটিয়া আসিয়া দাদাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। কেশর-ফুলানো সিংহ-শিশুর মত ফুলিতে ফুলিতে বিমল অমৃতের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। যে সব লোক ভয়ত্রস্ত দৃষ্টি লইয়া, এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনের জন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহাদেরই মধ্যস্থ একজন ভৃত্যকে একখানা গাড়ি আনিতে আদেশ দিয়া অমৃত বিমলের কান ছাড়িয়া হাত ধরিল। এই সময়ে তার চোখ পড়িল সেই মুহূর্ত্তে উপস্থিত ইন্দ্রাণীর মুখের উপর। অমৃত তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া উঁহাকে অবজ্ঞা দেখাইতে চাহিয়া বিমলকে আদেশের স্বরে কহিল, "চলে এসো।"

বিমল পূর্ব্বের মতই তার বজ্রমুষ্টি হইতে নিজের হস্ত মুক্ত করিতে সচেষ্ট থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "আমি তোমার সঙ্গে কিছুতেই যাবো না,—তুমি ছেড়ে দাও আমায় শিগ্‌গির বল্‌চি, ছেড়ে দাও।"

ইন্দ্রাণী অমৃতের সম্মুখীন হইয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ নম্র অথচ দৃঢ় স্বরে কহিল, "কেন ওকে বৃথা পীড়ন করচেন? ও কল্‌কাতায় এখন আর যাবে না, আপনি ওকে ছেড়ে দিন।"

অমৃত ইন্দ্রাণীর আদেশ গ্রাহ্যও করিল না, বরং হিংস্র পশুর হস্তধৃত শিকারের মত বিমলের ধৃত হস্ত অধিকতর বলের সহিত চাপিয়া ধরিয়া আগুনের জ্বালাভরা দুই চক্ষু ইন্দ্রাণীর মুখে সংস্থাপনান্তর কুটিল স্বরে কহিল, "আমি ওর গার্জ্জেন, ওর ভাল মন্দ তোমার চেয়ে ঢের বেশি আমি বুঝি। আমার কাজে কেউ কথা কইতে আসে,—সে আমার পছন্দ নয়।"

শুনিয়া ইন্দ্রাণীর সমস্ত মুখ টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সংযত কণ্ঠেই সে কহিল, "আপনি তো ওর গার্জ্জেন ন'ন,—আমিই সে ভার পেয়েছি। আমি বল্‌চি, আপনি আর ওকে নিয়ে গিয়ে কষ্ট পাবেন না।—আমার হাতেই ওকে ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যান।"

ভৃত্য আসিয়া খবর দিল গাড়ী আসিয়াছে। অমৃত তাহাকে নিজেদের

অল্পসল্প জিনিষপত্র তুলিয়া দিতে হুকুম দিয়া বিদ্রূপ-হাস্তে রঞ্জিত মুখখানা ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে ফিরাইয়া ব্যঙ্গের স্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—"আজ্ঞে না দিদি ঠাকরুণ! মাপ কর্বেন,—বিমলের গার্জ্জেন এখন আর আপনি বা আপনার বাবা নেই।—এখন থেকে আমিই ওর সম্পূর্ণ অভিভাবকত্ব নিজের হাতেই নিলুম। ইচ্ছা হয় নালিশ করে দেখতে পারেন। তবে জেনে রাখবেন, সেখানে ওর এই তের বৎসর বয়সে মিড্‌ল-প্রাইমারী পরীক্ষাতে ফেল করাই আমার সাপক্ষে সাক্ষী দেবে। তা ছাড়া আপনি পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক, আর আপনার বাবা অক্ষম বৃদ্ধ। আর আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার আপনাদের যদি কোন স্বকপোলকল্পিত অপবাদ তৈরি করেও থাকেন তো সে কথা আদালতে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে বার করতে পার্বেন কি?—প্রণাম ভাল লাগে নি, তাই এবার নমস্কার করে গেলুম।—বারান্তরে হয় ত তারও দরকার হবে না।"

এই বলিয়া নত মস্তকে যোড় হাত ঠেকাইয়া নিজের পিসির দিকে একবারও না তাকাইয়াই অমৃত বিমলকে জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

একটা প্রকাণ্ড ঝটিকা বহিয়া গেলে বৃক্ষসঙ্কুল বনস্থলীর যেমন অবস্থা হয়,—কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঠিক সেই রকমই ঝড়ে-ভাঙ্গা গাছগুলার মতই এই বাড়ীর স্বল্প কয়েকজন লোক যেন মুহ্যমান ও বিমূঢ় হইয়া রহিল। তার পর সর্ব্ব প্রথম সেই স্তম্ভিত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মঙ্গলাঠাকুরাণীর শঙ্খধ্বনিবৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সপ্তমে বাজিয়া উঠিল,—"ওরে, আমি এ যে খাল কেটে কুমীর এনে জিওলুম রে! ওরে এক শত্তুরের হাত এড়াতে গিয়ে এ যে মহা শত্তুরের হাতে আমার দুধের বাছাকে সঁপে দিয়েছি রে। ওলো তারা! বাছা যে আমার অনেকক্ষণ কিচ্ছু খায় নি লো! ওলো তুই ছুটে গিয়ে দেখ্‌গে' যা, গাড়ী দেখা যাচ্চে কি না। তা'হলে ঐ গাড়ীর চাকায় আজ আমি প্রাণটা দোব লো।"—বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহার প্রাণ হরণের জন্য একখানা গাড়ীর

চাকাও সুদূর পর্য্যন্ত সমস্ত পথটার উপর দেখা গেল না। উহাদের গাড়ি ততক্ষণে দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।

হ্যারিসন রোডের একটা ত্রিতল বাড়ীর দুইটা ঘর লইয়া অমৃত-বিমলে সংসার পাতিয়াছিল। এর মধ্যে একখানা ঘর রাজপুত্রের বাসযোগ্য করিয়া সাজাইয়া সে তাহাতে বিমলকে রাখিল। সে ঘরে বড়লোকের ছেলের উপযুক্ত কিছুরই অপ্রতুলতা ছিল না। স্প্রিংয়ের-গদি-আঁটা ভাল খাট, নেটের মশারি, মেহগ্নির রাইটিং টেব্‌ল্। শ্বেত-পাথর-আঁটা বৃহৎ আয়না, হালফ্যাসানের একটা কাপড় রাখা আলমারি। তা ভিন্ন, সোনার ঘড়ি, চেন, বোতাম,—রূপার ছড়ি, রেশমী ছাতা, আর যা কিছু সে সকলি। এই সমস্ত দিয়াই সে গৃহহারা আত্মীয়-বান্ধব-বিচ্যুত বালকের বিমুখ চিত্তকে জয় করিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিয়াছে।—এ সবকে অপ্রয়োজনীয় বলা চলে কোন্ হিসাবে? এ না হইলে কিসের জোরে সে এই অশাস্য দুর্দ্দান্ত ছেলেকে বশে রাখিত? এই কয় বৎসরে অমৃত-মামার সাহায্যে বিমলেন্দুর সুখ-বিলাসের মধ্যে জীবন-যাপনটা এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, এসব ছাড়িয়া পূজার ছুটির কয়টা দিনও সে আর নিজেদের পল্লীগ্রামের ভাঙ্গা বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া চিরাভ্যস্ত জীবন যাত্রার মধ্যে নিজের সেই পুরাতন স্থানটি খুঁজিয়া পায় না। গ্রীষ্মের ছুটিতে কোনবারই বাড়ী যাওয়া ঘটে না। ঐ সময় দারজিলিং, কারসিয়াং, সিম্‌লা পাহাড়, পুরী, ওয়াল্‌টেয়ার প্রভৃতি স্থানে হাওয়া খাওয়াই তার ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত বোধ করিয়া বিমলেন্দুর অভিভাবক তাহাকে বাড়ী যাইতে দেয় না। বিমলেরও প্রথম যাত্রার পূর্ব্বাবধিই যা কিছু আপত্তি ছিল,—এখন আর তা নাই, বরং এই অবসরের প্রতীক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। পূজার ছুটিতে প্রথমবার দিন পাঁচেকের জন্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে বৈদ্যনাথ মধুপুরের ফেরৎ মাত্র দিন-তিনেকের মত সে বাড়ী থাকিতে পাইয়া ছিল। পর বৎসরে তাও পাইল না। তা' তখন আর সে পাওয়ার প্রয়োজনও বড় ছিল না। বিমল নিজেই বলিল,

"চলুন, এবার আমরা পূজার ছুটিতে বর্ম্মা সিঙ্গাপুর বেড়িয়ে আসি।"

অমৃত জিঘাংসাপূর্ণ একটা তীব্র সুখানুভব করিয়া কহিল,—"তাই যাওয়া যাক্।"

ইন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলিল, "যেমন কর্ম্ম তোমার! আমায় তুমি নিকৃষ্ট কীটের মত পায়ের তলায় পিশে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলে না? আজ কে' কাকে দূর করলে, তাই দেখ। আমায় আদর করে কাছে টানলে, তোমারও ভাল হ'ত, আর আমাকেও তোমাদের বঞ্চিত করে বিষয়ের ঐ অর্দ্ধেক অংশ লাভ কর্ব্বার চেষ্টা করতে হত না, আপনিই একদিন আসত।—তার সঙ্গে অমন একটি রূপসী কন্যা! অর্দ্ধেক রাজত্ব ও একটি রাজকুমারী,—মেয়েটি ছোট ছিল বটে, কিন্তু এতদিনে সেও ত তের বছরের হয়ে উঠলো। এখন দাও, কোথা থেকে কত বড় সুপাত্র এনে মেয়ের বিয়ে দেবে, দাও। আমি ত বড় মন্দ, - যেহেতু তোমার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়েছিলাম। এখন এই তো তোমার মাথায় পা তুলে দিলাম, কি করতে পারলে?"

রামদয়াল এই বিবাদ-ভঞ্জনের চেষ্টায় নিজের অক্ষম শরীর মন লইয়া বারংবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি নিজে গিয়া অমৃতের হাতে ধরিয়া তিনি বিমলকে পূরা ছুটিটার জন্যও অন্ততঃ তার স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া চাহিয়াছিলেন, —অমৃত সম্মত হয় নাই। সে যে যুক্তি দেখাইল, বাহিরের দিক হইতে তাহাকে মূল্যহীন বলা যায় না। সে বলে, নানা কারণে সে নিজে আর বিমলের সহিত বিমলের বাড়ীতে যাইতে পারে না, অতএব দীর্ঘ দিন বিমলের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া, অনর্থক অস্বাস্থ্যকর পল্লীগৃহে বিমলকে রাখা তার উচিত বোধ হয় না। বিশেষতঃ দিদিমার উদ্দাম আদরে এই ছেলেটির স্বভাব কতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল, সে কথা তো তাঁর অজ্ঞাত নয়। এখন আবার তার মধ্যে গিয়া পড়িলে, আর কি সে উহাকে বশে রাখিতে পারিবে? অনেক কষ্টে, বিস্তর পরিশ্রমে যেটুকু হইয়াছে,—সে সমস্তই মাটি করিতে চাহেন কি?

রামদযাল নির্ব্বোধ না হইলেও সরল ও ধার্ম্মিক লোক। সাংসারিক কূট-বচালে বুদ্ধি তাঁর ছিল না। তিনি এই যুক্তিটার যাথার্থ্য অনুভব করিয়া দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। যথার্থই দেখা গেল যে, অমৃতের তত্ত্বাবধানে অত্যল্প কালের মধ্যেই বিমলের সেই উদ্দাম পল্লী-জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিযাছে, এবং সে পরিবর্ত্তন মন্দের দিকে নয। বিমল পড়া শোনায় অনেক উন্নতি করিযাছে। তার একটা যেন ভব্যতা-বোধ জন্মিতেছে। ছেলের ভালই তো তাঁদের দেখিতে হইবে।

এই ঘটনার প্রায পাঁচ ছয মাস পরেই রামদযাল কঠিন পীড়ায শয্যাগত হইযা পড়িলেন। সংবাদ পাইযা ইন্দ্রাণী পিতার সেবা করিতে রাবীৎপুরে চলিযা গেল। ইহার পর রামদযাল আরোগ্য লাভান্তে শয্যা ত্যাগ করিযা উঠিলেও বৃদ্ধকালের কঠিন রোগ এমন অবস্থা তঁহাকে আর প্রত্যর্পণ করিল না, যাহাতে পূর্ব্বের মত বিষয-কার্য্য করা চলে। এদিকে বিমলেন্দুর তরফ হইতে তার মাসিক বৃত্তি প্রথমে একশত টাকা, ও শিক্ষকের হিসাবে অমৃতের পঞ্চাশ, দ্বিতীয় মাস হইতেই বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিযাছিল। এখন মাসিক দেড়শত এবং মাষ্টারের একশত দিযাও সমস্ত মাস ধরিযাই কোন না কোন উপরি খরচের জন্য বিমলের তাগিদপত্র আসে। সে পত্রে শুধুই বালকোচিত আবদার নয, বিষযাধিকারীর গভীর আদেশের সুরও ধ্বনিত শুনা যায।

অমৃত পত্র লিখিল, "আপনি অক্ষম, তত্ত্বাবধানের অভাবে বিষয নষ্ট হইতে বসিযাছে। বিমলের ইচ্ছা আমার ঘাড়েই সবটি দাযভার চাপায। তবে তার কথার এখনও মূল্য হয নাই,—যেহেতু এখনও সে নাবালক। আমায দিয়া কাজ নাই,—আমার সময়ই বা কোথা? তবে উপযুক্ত রূপ বন্দোবস্ত করা বিশেষ প্রয়োজন, উহাতে সন্দেহ নাই।"

সেই সঙ্গে বিমল নিজেও অমৃতকে বিষযকার্য্যের তদারক ভার দিতে অনুরোধ করিযা স্বতন্ত্র পত্র দিযাছিল।

দ্বিতীয় পত্রে বিমল আরও অনেক কথার সহিত এই কথাগুলি লিখিল,—"আমি নাবালক বলে আপনারা আমার কথা গ্রাহ্য করবেন না, কিন্তু আমি যখন আপনাদের চেয়ে যোগ্যতর অভিভাবক পাচ্চি, তখন কেনই বা আপনাদের অনুগ্রহজীবী হয়ে থাকবো? ওঁর হাতে আমার গার্জ্জেনশিপ যদি না আপনারা সহজে দেন, তা হলে অগত্যাই আমায় জজের কাছে দরখাস্ত দিয়ে সেটা আদায় করতে হবে,—কিন্তু এখনও আমি সেটা করতে ইচ্ছা করছি না। তবে যদি তাই করতেই আমায় বাধ্য করা হয় তো সেজন্য আপনারাই সম্পূর্ণ দায়ী হবেন। অমৃত মামা আমার অতি নিকট-আত্মীয় এবং প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী।"

ইহার পর রামদয়াল ও ইন্দ্রাণী নাবালকের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া নিজেদের সমস্ত দায়িত্বই অমৃতের হস্তে তুলিয়া দিল। শুধু তাই নয়,—ইন্দ্রাণীকে তার স্বামী যে তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দান করিয়া গিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাঁর সেই উইলের প্রোবেট পর্য্যন্ত লওয়া হয় নাই,—সমস্ত সম্পত্তিই এক রহিয়াছে এই সঙ্গে ইন্দ্রাণীও তাই তার নাবালক সপত্নী-পুত্রের আত্মীয় এবং অভিভাবক অমৃতের অনুগ্রহের উপরেই বিশেষভাবে আসিয়া পড়িল।

প্রথম বৎসরে অমৃত হিসাব মত টাকা মাস-কাবারে মাস-কাবারেই পাঠাইয়া দিল। দ্বিতীয় বৎসর হইতে বিমলের খরচ বৃদ্ধির অজুহাতে মা-দিদিমার খরচের টাকায় টান পড়িল। ইন্দ্রাণী ভাল মন্দ কোন কথাই কহিল না। মঙ্গলা ঠাকুরাণী ছন্দে বন্দে ভ্রাতুষ্পুত্রের অতি-দর্পের অবশ্যম্ভাবী ফলে নিশ্চিত সর্ব্বনাশের ভবিষ্যৎ-বাণী গাহিতে গাহিতে, পাড়াপড়সীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া, ক্রন্দনের সহিত এত কাল পরে প্রতি মাসেই একবার করিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন যে, তাঁর নিজের গায়ের রক্ত ওই কৃতঘ্ন ভাইপোকে আনিয়া নিজের নাসিকা স্বহস্তে ছেদন না করিলে তাঁর শশুর-সম্পর্ক যারা,—তাদের হাতেও যে তিনি এর চেয়ে ঢের বেশী স্বস্তিতে ছিলেন। হায়, হায়,—এমন কুমতি তাঁর কেন হইল!

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রাজধানীর ধূম-ধূসর ঊর্দ্ধাকাশে আসন্ন-বর্ষণ-ভয়-ভীত বিহঙ্গের দল সেই মেঘ-চন্দ্রাতপের নীচে আরও একখানা বিচিত্র চাঁদোয়ার মত বিস্তৃত হইয়া গিয়া মেঘ-মলিন দিবসান্তের মলিন মূর্ত্তিকে ম্লানতর করিল। পথবাহী পথিকবৃন্দ ত্রস্তে তাদের শ্লথ গতি চঞ্চল করিল। গাড়ী মোটর ছুটিয়া চলিল। আকাশে চাহিয়া মেঘের ঘটা নিরীক্ষণ করিতে করিতে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাথে খুচরা পুস্তক-বিক্রেতা, মণিহারীর দোকানদার, ফলওয়ালারা নিজেদের পাততাড়ি ক্ষিপ্র হস্তে গুটাইয়া লইতে লাগিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া একটি ছেলে দ্রুতবেগে নামিয়া আসিতেছিল। কলেজের ছুটি অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে। সব ছেলেই প্রায় বিদায় লইয়াছে। কেবল এই দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রটি এতক্ষণ একা বসিয়া কি করিতেছিল, সেই জানে। তবে এমন করিয়া যে ছুটিয়া নামিতেছে, এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। যে কারণে শূন্য পথে কাক চিল ছুটাছুটি করিতেছে, পথে পথিক ও গাড়ি মোটর ছুটিতেছে—কারণ সেই একই। ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত সূর্য্যাস্ত-সমুজ্জ্বল দিগন্তের মসীপুঞ্জ রেখা দেখিতে দেখিতে যে মেঘাবর্ণ্যে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সে খবর সে পায় নাই। যখন তার ঘন কালো জটাজুট পৃথিবীর ভয়ার্ত্ত মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আকস্মিক ভয়ের সন্তাড়নে তার শ্বাস রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, তখনি ঐ ছেলেটির ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং সে ঊর্দ্ধশ্বাসে নামিতে থাকে।

সিঁড়িব সর্ব্ব শেষেব ধাপ হইতে যেমন মাটিতে পা পড়িয়াছে, অমনি তার সমান বেগশালী অপব এক ব্যক্তির সহিত তাহাব সংঘর্ষ হইয়া গেল। মালে ও মেলে নয়,—দুখানা পূর্ণতেজে চালানো মেল গাড়ীতে ধাক্কা লাগিলে যেমন হয় ঠিক তেমনি!

সিঁড়ি দিয়া যে ছেলে এঞ্জিনেব বেগে নামিতেছিল, ধাক্কা লাগানোব দোষ তাবই কম। বোধ কবি সেই হেতু সে সক্রোধে ভ্রূ বাঁকাইয়া চাহিতেই সংঘর্ষিতেব বেদনা-ক্লিষ্ট মুখখানা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে সহসা বলিয়া ফেলিল, "ওঃ আপনি?—মাপ কর্ব্বেন!"

অপব ছেলে,—যেটি সভ্য লাইব্রেবী ঘব হইতে বাহিব হইযা আসিযাছিল, সে এতক্ষণে নিজেব ললাটে প্রাপ্ত আঘাত-ব্যথা কতকটা সামলাইয়া লইতে পাবিয়াছে,—মৃদু হাস্তেব সহিত ডান হাত খানা বাড়াইযা দিল, "বিলক্ষণ। দোষ কল্লাম আমি, প্রাযশ্চিত্ত কবচেন আপনি? নাঃ, বিমলেন্দু বাবু! কাজটা ভাবি অন্যায হযে গ্যাছে মশাই। সমস্তক্ষণ বইটা নিযে বেহুঁস হযে থেকে শেষে যখন বইএব অক্ষব হঠাৎ অন্ধকাবে ডুব মাবলে, তখন মবিয়া হযে মাবি কি মবি করে বাব হযে পড়েছি। এই আব কি!"—বলিয়া ছেলেটি অপবাধ ক্ষালনেব একটুখানি মিষ্ট হাসি হাসিল। সে হাসিটুকু সত্যই বড মিঠে—বড়ই সরেস তাব ঝঙ্কাব।

বিমলেন্দুও সলজ্জ হাস্তে স্বীকাব কবিল যে, তাব ব্যাপাবটাও ঠিক উহাবই সহিত সমান।

"ঐ যাঃ! বড বড ফোঁটায বৃষ্টি নেমে এলো। নাঃ, আজ নাকাল কবাবে দেখছি।—চলুন, চলুন,—চট্ কবে বেবিযে পডা যাক্।"—পুনশ্চ এই কথা বলিযাই সে ছেলে বিমলেন্দুব হাত ধবিয়া টানিতে টানিতে দ্রুত অগ্রসব হইযা সাম্‌নেব পৈঠা কযটা অতিক্রম কবিল।

ফটকের সাম্‌নে একখানা ঘবের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল! সহিস ও

কোচম্যানের মুখ বাড়ীর দিকে ফিরানো। তাদের চক্ষের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি একবার কালো অন্ধকার আকাশে, একবার প্রকাণ্ড বাড়ীখানার ইতস্ততঃ ফিরিয়া ফিরিয়া বিরক্তির বজ্র হানিতেছিল। বহুক্ষণ বোঝা-ঘাড়ে দাঁড়াইয়া থাকা ঘোড়াটাও যে সন্তুষ্ট নয়, তার সাম্‌নের পা দিয়া পুনঃপুনঃ মাটিতে ক্ষুর-ক্ষেপণেই উহা প্রকটিত। ছেলে-দুটি একসঙ্গে বাহিরে আসিতেই সহিসটা গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল,—কোচম্যান ঘোড়ার লাগাম ঠিক করিয়া ধরিল। ছেলেটি গাড়ির পা-দানীতে একটা পা রাখিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বিমলের ধৃত-হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—"ট্রাম চলচে না,—কোথায় ভিজ্‌তে যাবেন,—চলুন আমার সঙ্গে।"

এই বলিয়া উহাকে ভাবিতে না দিয়াই গাড়ির মধ্যে টানিয়া তুলিয়া লইল। গাড়ির দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল, ঘোড়াও ছুটিল, মেঘও গুরু গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হুহু-শব্দে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। বেলগাছিয়ার কাছাকাছি একটা স্থানে, একটা বাগানবাড়ীর মধ্যে গাড়ীবারান্দায় শ্রান্ত এবং শীতার্ত্ত ঘোড়াটা গাড়িখানাকে পৌঁছাইয়া দিয়া থামিল। সহিসটা সটসটে হইয়া ভিজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দরজা খুলিয়া দিলে যাহার গাড়ী সেই আগে নামিয়া বিমলেন্দুকে নামাইয়া লইতেছে, এমন সময় মাথার উপরের ঢাকা বারাণ্ডা হইতে ব্যগ্রকণ্ঠের আহ্বান আসিল, "মঞ্জু এলি ?"

ছেলেটি বিমলের হাত ধরিয়া অকাল-সন্ধ্যার স্বল্পালোকে পথ দেখিয়া সাম্‌নের চওড়া বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে স্বর কিছু উচ্চ করিয়াই জবাব দিল, "হ্যাঁ মা। আমরা এসেছি। তুমি শিগ্‌গির দু'কাপ চা, আর যদি কিছু খাবার থাকে তো আমাদের দুজনের জন্যে পাঠিয়ে দাওগে'। ভারি ক্ষিদে পেয়েছে।"

সিঁড়ির ঠিক সাম্‌নেই উপরের বারান্দায় বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ্‌ খট করিয়া উঠিয়া অন্ধকার সিঁড়ি আলোকিত করিয়া দিল। মা কহিলেন, "হ্যাঁ

রে মঞ্জু! ভিজিস নি তো রে? দেখ বাছা! ভিজে কাপড়ে যেন থেকো না। দরকার হয় তো বলো, কাপড় আর তোয়ালে পাঠিয়ে দিই। ক'জনের জন্যে পাঠাবো?"

মঞ্জু বা অসমঞ্জ হাসিয়া কহিল, "না মা গো!—একটুও ভিজি নি। সে ফোঁটাকত জল যা' মাথায় পড়েছিল, মাথাতেই শুকিয়ে গেছে। তার চাইতে তুমি খাবার ব্যবস্থাটা কর গে' মা লক্ষ্মী! পেটের নাড়ি সুদ্ধু হজম হ'বার যোগাড় করেছে। দুজনের মত দিও।"

"সবই ঠিক আছে,—এক্ষণি পাঠিয়ে দিচ্চি।"

সামনেই একটা বড় হল। ঘরটা কল্‌কাতার বড়-লোকী-কেতায় সাজান। ঘরের দেওয়ালে অনেকগুলো বিদ্যুতালোকের মধ্যে একটা মাত্র জ্বলিতেছে। সেই ঘর দিয়া তার পাশেই আর একটা ঘরে অসমঞ্জ বিমলকে লইয়া প্রবেশ করিল; এবং ঘরের আলোকে জাগাইয়া তুলিয়া দুখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া দুজনে বসিয়া পড়িলে পর বিমলের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া সহাস্যে কহিল, "বিমল-বাবুর বোধ করি এতটা উপদ্রব সহ্য হচ্চে না,—না?"

বিমল নিজের বিজড়িত বিব্রত ভাবটা গোপন করিতে চাহিয়া উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া কহিল, "সে কি?—না, না,—কেন?"

অসমঞ্জ পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, "এতটা চুপচাপ কিজন্যে? মনে করচেন, হঠাৎ এ লোকটা মাথা ভাঙতেই বা এলো কেন,— আবার চিলের মত ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে এসেই বা তালগাছে তুল্লে কিহেতু? মনে নিশ্চয়ই এর কু-মতলব আছে, তাই না?"—বলিয়া শিশুর মত মুক্ত কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

উহার কথার ভঙ্গি ও হাসির সুরে কি ছিল,—বিমলের অনভ্যস্ত লজ্জিত ভাবটা যেন ইহাতে দূরে সরিয়া গেল, এবং কোয়াসা-কাটা রৌদ্রের মত তার সারা চিত্ত ভরিয়া একটা অননুভূত আনন্দ ঝলমল করিয়া উঠিল। সে তার সম্মুখস্থ মুখখানার দিকে এবার পূর্ণচক্ষে চাহিতেই তার শরীর মন যেন সহসা

কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মেঘের অন্ধকারে যে চোখের সার্চলাইটের মত দৃষ্টি এতক্ষণ লুকান ছিল, আলোর আভায় তাহা বিদ্যুতোজ্জ্বল হইয়া প্রকটিত হইয়াছে,—সে চোখের দিকে এক নিমেষের চেয়ে বেশি চাহিয়া থাকা অসম্ভব! বিমল কি বলিতে গিয়া সেই চোখের দিকে চাহিয়া নিজের দৃষ্টি নত করিয়া লইল। তার পর ঈষৎ হাস্যের সহিত উত্তর করিল, "বিলক্ষণ! এই বৃষ্টিতে কোথায় ভিজে মরতুম, সঙ্গে করে এনে—," এই সময় একজন ভৃত্য একখানা চিত্র-বিচিত্র মুরাদাবাদী বড় খুঞ্চেতে দুই পেয়ালা চা এবং দুখানা রেকাবে নানাবিধ খাদ্য লইয়া ঘরে ঢুকিল। বিমল সেই দিকে চাহিয়া কথাটা শেষ করিল, "আশ্রয় এবং আহার দুই-ই যোগাচ্চেন,—আবার উল্টে বল্‌চেন কি না, আমিই অত্যাচারিত হচ্চি? এ রকম অত্যাচার মন্দ বলি কি করে?"

অসমঞ্জ সাম্‌নে রাখা চায়ের পেয়ালা বিমলের দিকে সরাইয়া দিতে দিতে হাসিয়া মুখ তুলিতেই আবার সেই হীরক দ্যুতি সমুজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সহিত বিমলের দৃষ্টি সম্মিলিত হইয়া গেল। তার সারা দেহ আবারও যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল।—অথচ অন্তরের মধ্যে এই নব পরিচিতের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব না করিয়াও যেন পারিল না। নিঃশব্দ-কৌতুকে গরম চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া সে যথাকার্য্যে মনোনিবেশ করিল,— অনুরোধের অপেক্ষা রাখিল না। তার মনে হইল এর মুখ দিয়া উপরোধের চলিত ভাষা বাহির করাইতে চাহিলে নিজেরই দীনতা প্রকাশ পাইবে। এ যেন স্বভাবসিদ্ধ রাজা,—তার অনেক ঊর্দ্ধে।

ভারি জুতা পায়ের সদর্প চলনে কেহ চলিয়া আসিতেছে জানা গেল। অসমঞ্জ কথা বন্ধ করিয়া ডাকিল, "মিষ্টার পল্!"

"উঁ!"—বলিয়া জবাব দিয়া যে জন গৃহে প্রবিষ্ট হইল তার দিকে চাহিতেই বিমলেন্দুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল! অসমঞ্জর রহস্যময় জ্যোতিঃ-বিস্ফারিত আয়ত লোচনের অপেক্ষাও এ যেন বিস্ময়কর!—যে আসিল সে অসঙ্কোচে চলিয়া

আসিযা অসমঞ্জের পার্শ্বে একখানা আসন টানিযা নিতান্ত সহজ ভাবেই বসিয়া পড়িল। সে ঘরে যে কোন অপরিচিত তৃতীয ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেছে, এমন একটু সঙ্কোচ পর্য্যন্ত না দেখাইযা প্রশ্ন করিল, "·········ফুটবল ম্যাচ আজ তা' হলে হলো না ?"

অসমঞ্জ উত্তর করিল, "সম্ভব বটে ! আর এখানে কি হয়েছিল তা' বুঝি জানিস্ নে ?—এই ঝড়ের মুখে দুখানা প্যাসেঞ্জারে মস্ত বড একটা কলিসন্ হয়ে গেছে যে।" বলিয়া তার স্বভাবসিদ্ধ সেই শিশু-সুলভ উচ্চহাস্যে কক্ষ মুখরিত করিযা দিল।

অসমঞ্জ যাহাকে 'পল্' বলিযা সম্বোধন করিযাছিল, দেখিযা তাহাকে মেয়ে বলিবে, কি ছেলে বলিবে,—বেচারা বিমলেন্দু ইহার কিনারা খুঁজিযা পাইতে-ছিল না। সেই জাবটির পরণে হাফ প্যান্টেরই মত হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা নরুন-পেড়ে ধুতি, গাযে পুরুষালি ঢংএর উচুঁ কলার ও চওড়া কফের প্রান্তে বোতাম-আঁটা সার্টের মত জ্যাকেট। পাযে হাফ মোজা এবং ভারি ওজনের ডর্বি-জুতা। মাথার চুল কাঁধের একটুখানি মাত্র নীচে নামিযাছে, ডানদিকে সিঁথে কাটা, —অর্থাৎ এক কথায, মেযেলী চেহারাকে যত দূর পুরুষোচিত করা চলে এ মেয়ে তার কিছুই বাকি রাখে নাই। ইহাকে দেখিলে,—সে কেমন দেখিতে ? —সুন্দরী না কুৎসিত ? বযস এর কত ? এ সকল প্রশ্ন দর্শকের মনকে কৌতূহলী করিতে পারে না,—এই এই একটি মাত্র কথাই মনে হয, অদ্ভুত।

পল অসমঞ্জের কথায তড়াক্ করিযা লাফাইযা উঠিযা দাঁড়াইল। তার দুই বাঁকা ভুরু গুণ-চড়ানো ধনুকের মত উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিযা কঠোর কণ্ঠে কহিযা উঠিল,—"সেই খবর নিযে এসে তুমি মজা করে চা, সন্দেশ পেটে দিচ্চো ?—জানো, আজ কত হাজার জ্যান্ত লোক মড়া সেজে মালগাড়ী ভর্ত্তি হযে নদীগর্ভে স্থান লাভ করে ভ্রান্ত-পরিচালকদের ভ্রান্তি-নিরসন করতে বাধ্য হবে ?"

বিমলের মাথার প্রত্যেক চুলের গোড়া শরীরের প্রত্যেকটি রোমকূপ পর্য্যন্ত

সেই বজ্রকঠোর কণ্ঠস্বরের অমানুষিক চিত্রাঙ্কনে খাড়া হইয়া উঠিল। সে দেখিল হহার চোখেও সেই বিদ্যুদগ্নির ঝলক,—তবে অসমঞ্জের চোখের মত সে চোখ আশ্চর্য্য ও অভিনব নয়, উহা শুধুই আগুনে ভরা। অসমঞ্জের চোখে যেন অনল এবং অমৃত দুই-ই পাশাপাশি ঠাসাঠাসি করিয়া আছে।

অসমঞ্জ ঝর্ণাঝরার মত সকৌতুক কলহাস্য রুদ্ধ না করিয়াই বিমলের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল,—"মাভৈঃ! পল! চেয়ে দেখ, কলিসনে'র হত এবং আহত ওই একটিমাত্র ব্যক্তিকে ওযাগন নয়, ঘোড়াগাড়ি চড়িয়ে অবশ্য প্রেতহত হ'বার জন্যেই সোজা নিয়ে চলে এসেছি। কর্ত্তব্যে অবহেলা কিছুমাত্র হয় নি,—স্থিরা ভবঃ। বিমলেন্দুর নাম তুমি নিশ্চয়ই বাধিকা, অপরেশদের কাছে কম হলেও হাজারবার শুনে থাকবে। বিমল! তুমি অবশ্য আমার বোনের সম্বন্ধে আশা করি একেবারেই অজ্ঞ? এর নাম উৎপলা ছিল, কিন্তু আমরা একে ছোট্ট থেকেই "সেণ্ট পল" নাম দিয়েছি, সেই নামই খুব পাকা ওর হয়ে গ্যাছে।"

বিমলের মনে চিত্রাঙ্গদা-রূপিণী এই অর্দ্ধনারী লজ্জার আভাসও জাগায় নাই, সম্পূর্ণ অপরিচিতা কোন কিশোরীর সান্নিধ্য অপর কোথাও হইলে লজ্জার উত্তাপে তার ললাট ঘামিয়া উঠিত, কিন্তু নারীত্ব এর এত প্রচ্ছন্ন যে ইহার সম্বন্ধে লজ্জা করিবার কথা মনে করিতেই লজ্জা হয়। তথাপি 'উৎপলা' নামটাতেই বিমলকে ঈষৎ বাঙ্গাইয়া তুলিল। এ অবস্থায় কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে সে কথাও তো তার জানা নাই!

উৎপলা চৌকী ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবেই নিজের হাত বিমলের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সহজ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ভারি সুখী হলেম! আপনার কথা আমরা রাধিকাদের কাছে শুনেছি।"

তার পর উৎপলা ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বুঝেছি! তোমাদের দুজনে বুঝি কলিসন হয়েছিলো?—আচ্ছা মজার লোক

তো তুমি! কি ভাস্কর ভাবনা যে আমায় ধরিয়ে দিয়েছিলে! এই ঝড-জলে বাডীর বার হতে দিতে মা সাতশো আপত্তি করতো,—অথচ সব দলবল জুটিয়ে ছুটতেও তো হতো। এঁকে আমাদের সভার কথাটা বলা হয়েছে?”

অসমঞ্জ কথায় জবাব না দিয়া বোনের চোখের উপর চোখ রাখিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিল, বিমল তাহা বুঝিল না। সে কেবল বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, যেন দুখানা তড়িতের একত্র সমাবেশ হইয়াছে,—এখনি উহা হইতে হয় ত বা কি একটা স্ফুরিত, চ্ছুরিত, অথবা প্রবসিত হইয়া যাইবে।—নিজেরও অজ্ঞাতে তার বুকটা একটু দুলিয়া উঠিল।

গভীর রাত্রে বৃষ্টি থামিলে বিমলেন্দু যখন এই নবপরিচিতদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গাড়ী চাপিয়া নিজের নিঃসঙ্গ ঘরখানার উদ্দেশ্যে বাহির হইল; তখন সেই সুপ্তিমগ্ন নিশীথ অন্ধকারে, মধ্যযামিনীর নীরব মৌনতার মধ্যে অনন্তকোটী গ্রহ-তারকার দীপ্ত নেত্রের ভাষাহীন জ্বলন্ত সাক্ষ্যে, সে নিজের উচ্চকিত, সম্মোহিত চিত্তের কাছে মনে মনে স্বীকার করিল, এমন দুটি প্রাণী এর পূর্ব্বে সে কল্পনাও করে নাই, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে এদের সঙ্গ ও সখ্য সে নিজের পক্ষে একান্ত স্পৃহণীয় ও বরণীয় বলিয়াই অনুভব করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রমহলে একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ‘পোলিটীক্যাল ইকোনমি’র একজন প্রোফেসর তাঁর পড়ানোর ঘণ্টায় কোন একজন ছেলেকে কি একটা তুচ্ছ বিষয়ের জন্য, কি-না-কি একটা মস্ত শক্ত

কথা বলিয়া ফেলিযাছিলেন। তাই লইয়া গুরু-শিষ্য দলে চটাচটি হয় ; এবং তাহাকে তাঁব ছাত্রের কাছে 'এপোলজী'-(ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে হুকুমজাবি কবা হইলে তিনি যখন উহাতে সম্মত হইলেন না, তখন তাবা 'গুরুমাবা' বিদ্যা জাহিব কবিল ও কলেজ ছাড়িয়া চলিযা গেল। 'গুরুমারা' ঐ ছাত্রদলের পাণ্ডা ছাত্রেব নাম অসমঞ্জ রায়।

বিমল কলেজ হইতে অ-স্বস্থ চিত্তে মেসে ফিবিযাই পুনশ্চ বাহিব হইতেছিল,—অমৃত আসিযা পথ আগুলিযা জিজ্ঞাসা কবিল, "খেলে না, কিচ্ছু না,—ব্যস্ত হযে যাচ্চো কোথা ?"

বিমল বাধা পাইযা বিবক্ত চিত্তে উত্তব কবিল, "সবদিনই কি খাই ? দিন, যেতে দিন, - বিশেষ একটা দবকাবে যাচ্চি।"

অমৃত দবজা ছাড়িল না, ববং হাত দিযা সঙ্কীর্ণ পথটুকুও চাপিযা বাখিযা কহিল, "সেইজন্যেই তো আবও জান্‌তে চাই যে, বোজ বোজ কোথা থেকে খেযে আসো ? কাব গাড়ীতে চেপে অত বাত্রে মেসে ফেবো ?—কোথায যাও ?"

বিমলের স্বভাবে কোনদিনই প্রতিবোধ সহ্য করা লেখা নাই। সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হইযা অভিভাবকেব মুখেব উপবেই বলিযা বসিল, "যেখানেই যাই না কেন,—সে খোঁজে আপনাব কিসেব দবকার ? দোব ছাড়ুন আপনি,—আমাব নষ্ট কববাব মত সময় নেই।"

অমৃত অ-নড় হইযা থাকিযা প্রশান্ত স্ববে কহিল, "এ তো আব সংমা পাও নি, যে চোখ-বাঙানীতে ভয পাওযাবে। আমি আইন-মতন তোমাব গতি-বিধিব উপব নজর বাখতে বাধ্য,—সে কথা তো তোমাব ধমকানিতে ভুলে যেতে পাবিনে। আমাব অনুমতি না নিযে অথবা আমাব সঙ্গে ভিন্ন তুমি কোথাও যেতে পাবে না,—সে আমিও তোমায় বলে দিচ্চি।"

বিমল মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায অমৃতকে চিনিযা লইতে তারও বাকি ছিল না। নম্র মূর্ত্তি ধরিয়া বিনয়ের

সহিত কহিল, "সে দিন তো বলেছি আপনাকে, তাঁবা খুব ভদ্রলোক। সেখানে গেলে আমার পক্ষে ভাল ভিন্ন মন্দ হবেনা। একদিন আমি আপনাকে নিয়ে গিয়ে তাঁদেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দেবো,—দেখবেন সত্যি কি না।"

অমৃত বলিল, "বেশ, তা যদি হয আমাবও আপত্তি হবে না। এই চেক-খানায একটা সই দিয়ে যাও দেখি। চৌবঙ্গীব বাড়ী মেবামতের জন্যে অনেক-গুলো টাকাব দরকার।"

বিমল অত্যন্ত ব্যস্ত,—ইহাব কবল হইতে উদ্ধাব পাইলে বাঁচে, পকেট হইতে ষ্টাইলো পেন বাহিব কবিযা দ্রুতহস্তে সই কবিযা দিযা জিজ্ঞাসা কবিল, "আজকাল আমাব সই সবেতেই নে'ন যে বড? এব মানে?"

অমৃত মৃদু হাসিযা কহিল, "কি জানো বাবা! এখন তুমি বড হযেছ,—আমাব সই থাকলেও তোমাব একটা সই থাকাও আমি উচিত বোধ কবি। কাজ যা কববো একেবাবে পাকা করাই ভাল নয কি? ভবিষ্যতে ঠক্‌তে হবে না।"

দোর খোলা পাইযা বিমলেন্দু ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিব হইযা পডিল। কাঁচা পাকা উপদেশেব আধখানাব বেশি তাব কানেও ঢোকে নাই,—যাও বা ঢুকিযাছিল, সেও নিষ্ফল ভাবে, সিঁডি নামিতে নামিতে মনে মনে বলিল, "একবাব সাবালক হতে পাবলে বোঝা যায! তোমাব ঘাডটা তাহ'লে ভাল কবে ভেঙ্গে, আমাব ঘাড ভাঙ্গাব শোধটা নিই!"

বিমলেন্দু বেলগাছিযাব সেই বাড়ীতে পৌছিয়া সোজা উপবে উঠিয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে আরও বাবকযেক আসিযা এ গৃহেব খোলা অভ্যর্থনা সে লাভ কবিযাছে। অসমঞ্জ ও উৎপলা তাকে পুনঃ-পুনঃ বলিযাছে, যখন ইচ্ছা আসিযা অনাযাসেই উপবে উঠিযা যাইবাব অধিকার তার রহিল। একপ না কবিযা পবেব মত যদি বাহিবে অপেক্ষা করে, উহারা নিজেদের অবমানিত বোধ কবিবে। এই বিদেশী চালটাকে অন্তরের সহিতই তারা ঘৃণা করে। সিঁড়ি

দিয়া উঠিতে-উঠিতে অসমঞ্জর সেই ঝরণাস্রোতের মত অপরূপ হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইল। সে হাসি যেন বিমলের দুশ্চিন্তাপীড়িত অন্তরের সমস্ত উদ্বেগ দূর করিয়া দিয়া আনন্দ-প্লাবনের মত, সর্ব্ব-দেহ মনে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। সঙ্কোচে মৃদু শঙ্কিত পদক্ষেপ উৎসাহে চঞ্চল হইয়া তাহাকে অতি দ্রুত গম্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিল।

ঘরে শুধু ভাইবোনই নয়,—আরও জনদশেক ছেলে খানদশেক চৌকি জুড়িয়া বসিয়াছে। এদের মধ্যে সাদা পাথরের টেবিলটা,—সেইটের উপর জন-পিছু একটা করিয়া চায়ের পেয়ালা এবং মধ্যস্থলে একখানা বগিথালা ভর্ত্তি করা কচুরি সন্দেশ প্রভৃতি গৃহ-প্রস্তুত সুখাদ্যের রাশি। বিমলেন্দু বুঝিল,—ছেলে-গুলি আজিকার সাহেব-মারা কাণ্ডের অভিনেতৃবৃন্দ,—অসমঞ্জের এখানে এদের অনেকেরই গতিবিধি আছে, এর ভিতর রাধিকা ও অপরেশ এই দুজন বিমলেন্দুর পরিচিত এবং বন্ধুও।

বিমল ঘরে ঢুকিতেই আবার একটা আনন্দধ্বনি উঠিল, এবং স্বল্প পরে সেটা থামিয়া আসিলে অসমঞ্জর পাশে কোনমতে স্থান সঙ্কুলান করিয়া লইয়া বিমল বিস্মিত কণ্ঠে তাহাকে প্রশ্ন করিল, "সে সব মিটমাট হয়ে গেছে না' কি ?"

অসমঞ্জ ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব ?"

বিমল কহিল "আজ যা' তোমরা কাণ্ড করেছ,—কি করে মিটলো ?"

অসমঞ্জ মুক্ত কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। আবার সেই সানন্দ, সরল, মধুময় হাস্য-তরঙ্গে ঘরদ্বার তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়া বিমলের প্রাণের পর্দ্দায়-পর্দ্দায় সেই সঙ্গীত-ময় হাস্যলহরী বিস্ময়ানন্দে বাজিয়া উঠিল। সে বিকসিত নেত্রে চাহিয়া, সাগ্রহে কহিয়া উঠিল, "কি, বলো তো ? অত হাসছো কেন ? যা'হোক, অমনি অমনি যে এত শীঘ্র মিটে গেল—"

বাধা দিয়া সহাস্যে অসমঞ্জ কহিল, "পাগল! কে' বল্লে তোমায় মিটে গেল ?

এত সহজই কি ব্যাপারটা, যে এমন চুপি চুপি অকস্মাৎ মিটে যাবে? কারুর ফাইন হবে না,—কাউকে রাষ্টিকেট করা হবে না,—দুটো চারটে খবরের কাগজ হৈ চৈ কর্ব্বে না ; গাল খাবে না—না ঘরের, না পরের ? এ'ও কি হয় কখন?” বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিমলেন্দু সাশ্চর্য্যে কহিয়া উঠিল, “তাতেই তোমার এত হাসি ? কি কাণ্ড করলে বলো তো ? নিশ্চয় ওরা তোমাকে রাষ্টিকেট করবে,—কত দিনের মত, তাই বা কে' জানে। উঃ, কি ক্ষতিটাই হলো ! ক'টা মাস পরেই তো এক-জ্যামিনেশন্, দু-দুবার ফার্স্ট হয়েছ তুমি—এবারও হয় ত হ'তে।”

অসমঞ্জ কথায় ইহার জবাব না দিয়া তেমনি হাসিমুখে নিজের সঙ্গীতময় উচ্চ কণ্ঠে আবৃত্তি করিল,—“বন্ধু !

“রিক্ত যারা সর্ব্বহারা, সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা,—
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস,
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করবো মোরা পরিহাস !”

বিমল হার মানিবার ভাবে সবিষাদে কহিল, “আশ্চর্য্য !”

“কিছুই আশ্চর্য্য নয় বিমল ! মানুষ মানুষের মতন দুঃখ পাবে, ক্ষতি সইবে, সে কি শুধু মাটির পুতুলের মতন সাজান থাকবে ? পশুর মতন বাঁধা থেকে চারটি চারটি খেতে পাওয়ার চাইতে বেশী কিছু কর্ব্বে না—পারে না ?”

বিমলের সর্ব্বান্তঃকরণের বেসুরা বিকল যন্ত্র সেই বিপুল-গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ কণ্ঠে ও বাক্যে সঘনে বাজিয়া উঠিল। সে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইয়া নত দেহে অসমঞ্জের পদধূলি তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল, ইতিপূর্ব্বে এ শ্রদ্ধা সে জীবনে কাহাকেও করে নাই।—গদ্-গদ্ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, “আমায় তুমি তোমার মতন 'মানুষ' করে নাও। পুতুল বা পশু জন্ম থেকে উদ্ধার কর।”

“সঙ্কল্প স্থির ?”

“স্থির।”

বিমলেন্দুর হাত ধরিয়া অসমঞ্জ কহিল, "সাক্ষী ?"

সম্মোহিতের মত বিমলেন্দু জবাব দিল, "বল ?"

অসমঞ্জ তার হাত তেমনি শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিয়া চোখে-চোখে মিলাইয়া কহিল,—"নিজের অন্তর-পুরুষ।"

বিমল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "তাকে তো আমি চিনি নে'।"

স্নিগ্ধ, শান্ত হাস্যে সমস্ত মুখ প্রভাময় করিয়া অসমঞ্জ কহিল, "চিনবে পরে।"

সম্মোহিতবৎ বিমলেন্দু উত্তর করিল, "তবে,—সাক্ষী রইলো আমার অন্তর-পুরুষ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একান্ত অধৈর্য্যে সারাদিন কাটাইয়া বেলা তিনটা বাজিতে না বাজিতে, সেইটাকেই অপরাহ্ণ কাল ধরিয়া লইয়া দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্যের মত বিমলেন্দু একখানা ট্যাক্সি চড়িয়া অসমঞ্জদের বাড়ী আসিল। এরচেয়ে আরও বেশী বিলম্ব সে ভদ্রতার কোন খাতিরেই সহ্য করিতে পারিল না।

ঘরে সেদিন কেহ ছিল না। পথেও কোন ভৃত্য-জাতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে নাই, সামনের ফটক হইতে, দ্বিতলের ঘর পর্য্যন্ত সমস্তই খোলা। বিমল কিছু বিস্ময় বোধ করিতে যাইতেই এ বাড়ীর আরও অনেক জিনিসের কথা তার স্মরণ হইল, যার কাছে এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার একান্তই তুচ্ছ।

ঘরে একটা চলন্ত ঘড়ি ছিল,—সেটার দিকে নজর পড়িলে দেখা গেল, তখন ঠিক তিনটে। চারিদিক প্রায় স্তব্ধ। শরতের পীতাভ রৌদ্র চারিদিক

আচ্ছন্ন করিয়া জ্বলিতেছে। ঘরের একটা জানালার গা ঘেঁষিয়া একটি পুষ্পিত শেফালিগাছ খাড়া হইয়া আছে। তার ডালে ডালে অসংখ্য কুঁড়ি ও ফুল তপ্ত হাওয়ায় ঝিল্‌মিল্ করিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। সেই গাছের উপরেই দুইটা চড়ুই পাখী কিচির মিচির শব্দে কি জানি কিসের গান গাহিতেছিল। বিমলেন্দু একবার মনে করিল ফিরিয়া যায়।—এখনও তো এ বাড়ীর কেহ তার আগমন বার্ত্তা পায় নাই।—ফিরিয়া গেলেই বা কে' জানিবে? মন কিন্তু অনিচ্ছুক রহিল। যে টেবিলটায় প্রতিদিন তাদের খাবার দেওয়া হয়, আজ সেখানে শুধু একখানা লাল রংয়ে বাঁধান বই মাত্র পড়িয়া আছে। চৌকি টানিয়া বসিয়া বইখানা হাতে তুলিতেই নূতন বিস্ময়ে বুকটা তার ধক্ করিয়া উঠিল। কোন বিদেশী প্রসিদ্ধ পুস্তকের ইংরেজী তরজমা। বিভলবারের গুলির চেয়েও এর ভিতর ধ্বংস-শক্তি সঞ্চিত আছে,—এম্‌নি একটা আশঙ্কা নাকি কর্ত্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। বিমল বইখানা তুলিয়া লইল এবং অজ্ঞ বালক যেমন বিষ ও অমৃতে বিন্দুমাত্র পৃথক বোধ না করিয়া, পরম পরিতোষে নিজ মুখে তুলিয়া দেয়, তেমনি করিয়া পরম আগ্রহে পড়িতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হইয়া আলোর আভাসটুকু পর্য্যন্ত আড়াল করিয়া দাঁড়াইলে বইএর সাড়ে তিন ভাগ যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তেমন সময় বিমলেন্দু পুস্তক হইতে চোখ তুলিয়া চাহিতে, নূতন বিস্ময়ে চম্‌কাইয়া উঠিল। দ্বিপ্রহরিক সেই খর-রৌদ্রজাল ধূর্জ্জটির সেই দীপ্ত নেত্রানল, সরমরাগ-মধুর নব বধূ পর্ব্বতরাজ-তনয়ার সপ্রেম সলজ্জ শঙ্কিত চাহনিটির সহিত মিলিয়াই কি অমন স্নিগ্ধ শশিকলারূপে পরিণত হইয়া জুড়াইয়া গিয়াছে? শরতের প্রসন্ন নীলাকাশে তারার লহর স্তবকে-স্তবকে সাজান, কিন্তু তার মধ্যেও কি শুধু আগুন, শুধুই কি জ্বালা? আর কি কিছু নাই? না,—না, কোথায় দাহ? কোথায় জ্বালা? মানুষ অত্যাচারীও নহে,—অত্যাচারিতও নহে। প্রকৃতির মধ্যে দাহও আছে, তার প্রলেপও আছে,—তেম্‌নি মানুষের মধ্যেও বিদ্রোহ-

সন্ধির, ভালর মন্দর তরঙ্গ চির তরঙ্গায়িত,—নিছক মন্দ কেমন করিয়া তাকে বলা যায় ? উঃ কি উত্তপ্ত,—কি উন্মাদনাময় সাহচর্য্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কাটিয়াছে। আর একটু হইলেই বিমলের সমস্ত জীবনটাতেই যেন ওই তপ্তস্পর্শ ওই অগ্নিশিখা আগুন ধরাইয়া দিত !—

সহসা আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গের মতই বিমল তার সম্মুখে উৎপলাকে দেখিতে পাইল। দুজনের চোখে চোখে মিলিল,—বিমলের বোধ হইল, দীপ-শলাকার মুখে যে একটুখানি আগুন জ্বলে, প্রদীপের পলিতাকে মুহূর্ত্তে যেমন তাহা উজ্জ্বল করিয়া দেয়, তেমনি সেই দুটি দীপ্ত চক্ষু হইতে অগ্নির দুটি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া আসিয়া তাহাকে যেন আবার জ্বালাইয়া দিল। কোথায় শান্ত-মধুর সন্ধ্যা,—কোথায় হরশির-স্থিত কনক-কিরণবর্ষী সুবিমল চন্দ্রলেখা !—বইখানা হাত হইতে সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল, সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। সেই আলোতে বইখানার দিকে বারেক চাহিয়া উৎপলা জিজ্ঞাসা করিল, "পড়া হয়ে গেছে ?"

বিমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

"শেষ হয়ে এসেছে বোধ হয় ? বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? আমি তিনবার এসে ফিরে গেছি। নিবিষ্ট চিত্তে পড়ছিলেন।"

বিমলেন্দু আসন গ্রহণ করিয়া একটু বিজড়িত ভাবে কহিল, "মাপ কর্ব্বেন, জানতে পারি নি, আমি।"

উৎপলা স্নিগ্ধ চক্ষু বিমলের মুখে নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "আপনাকে যদি ওই বই হাতে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখতাম, তা'হলেই আপনাকে মাপ করতে পারতাম না।"

মেয়েদের মুখে এরকম কথা শোনায় বিস্ময় যথেষ্ট আছে, সে অবশ্য মিথ্যা নয়, কিন্তু এ মেয়ের মুখে এ ভিন্ন আর কি বাহির হওয়ার আশা করা যায় ?

আশ্চর্য্য হইয়াও বিমল তাই আশ্চর্য্য হইল না। তা' ভিন্ন অভ্যাসে সবই সহিয়া যায়। এমন দিন ছিল, যে দিনে হিন্দুঘরে এত বড় মেয়ে আইবড় রাখিলে নিজেদের ছাড়িয়া দশের মুখেও অন্ন রুচিত না, আজ তাও রুচিতেছে।—আবার এ সবও হয় ত একদিন সহিয়া যাইবে! বিমলেরও এই অর্দ্ধ-নারীশ্বর মেয়েটিকে কতকটা সহিয়া গিয়াছে।—আরও একটা কথা, বিমল কোনদিনই এ বয়সের মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ নয়। তার জ্ঞানে সে দিদিমা মঙ্গলা-দেবীকে, বিমাতা ইন্দ্রাণীকে ও ভাল করিয়া জানিয়াছে তারাকে। তা'ও আজ ছয় সাত বৎসর সে এদের সঙ্গচ্যুত। একমাত্র স্বল্পভাষী রুক্ষভাষী অভিভাবক অমৃতকে লইয়াই তার চপল বাল্য-জীবন কৈশোরের সীমা ছাড়াইতেছিল। এর মাঝে কোন কল্যাণময়ী নারীর মঙ্গল হস্ত তার জীবন গঠনে সহায়তা করিতে পারে নাই। শুধু এতটুকু ক্ষুদ্র, অথচ তারার মতই দীপ্ত আলো সে জীবনটাকে নিকষ কালো হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে তারার মুখ, কিন্তু সে তারা সুদূর গগনোদ্যানের মত বহু দূরেই ফুটিয়া রহিল,—তাই সে আলো শুধু তার পথের আলো হইয়া রহিল, প্রাণের অমৃত-নিষেক হইতে পারিল না। তার পর এই কলিকাতা সহরে পথে যানে এবং সভাসমিতিতে মধ্যে মধ্যে যে সব নারী বিমলের চোখে পড়িয়াছে, তাদের সঙ্গে উৎপলার কতটুকু প্রভেদ, তার পরিমাণ বিমলের জানা নাই। বাহিরের বেশভূষা ছাড়িয়া ভিতরের কোন মাল-মসলার পার্থক্য আছে কি না, বিমল সে কথা বুঝিবে কিরূপে? সে তো তাদের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে নাই। এর উপর পুরাণ-ইতিহাসে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যে, যে সব নারীচরিত্রের সহিত তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাদের সঙ্গে নব-পরিচিতার বড় বেশি প্রভেদ দেখা যায় না। যে ভদ্রা অর্জ্জুনের রথে সারথ্যকারিণী, যে চিত্রাঙ্গদা পিতৃরাজ্যের প্রজা-পালয়িত্রী, যে প্রমীলা নারী-সেনা সঙ্গে অর্জ্জুনের সঙ্গে সমর-ঘোষণা করে,—আবার পদ্মিনী, যশোবন্ত-মহিষী, কূট রাজনীতিবিদ্ অকুতোভয় রাজপুত মহিলাদ্বয়,—কর্ম্মদেবী ও লক্ষ্মীবাই,—তবে উৎপলা এতই

কি বিস্ময়কর? বিশেষ মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকারের জন্য সমগ্র পাশ্চাত্য-জগৎ-নিবাসিনীগণ যখন আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন।

তথাপি একটুখানি বিস্ময়ের সুরেই বলিয়া ফেলিল, "আপনি এ বই পড়েছেন না কি?"

"অনেকবার।"—বলিয়া উৎপলা হাসিল,—"কেন, আপনার মতে কি এ সব বই আমাদের পড়বার যোগ্য নয়?"

বিমল ঈষৎ সপ্রতিভ ভাবে, নিজের সাশ্চর্য্য ভাবটা সংবরণ করিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উত্তর কহিল, "না, তা' নয়। তবে এতে অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা বলেছে। পড়তে পড়তে এক একটা জায়গায় বুকের রক্ত চমকে যায় না?"

উৎপলা তার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বিদ্রূপের সুরে কহিল, "আপনার ভয় করছিল না কি? তার পরও আপনি কি সাহসে এখানে বসে রইলেন?"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বিমলেন্দু কহিল, "সে কি? কেন?"

উৎপলা তেমনি সুরেই কহিল, "যারা এই সব সাংঘাতিক বই পড়ে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে আপনার ভয় করলো না? জানেন এই বইটা সরকার থেকে 'ফরফিট' করা হয়েছে,—এটা এখন বোমার সরঞ্জাম, রিভলভার, কার্টিজ প্রভৃতিরই সামিল। ঐ বই নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে কি হয় জানেন? ইন্টার্ণ, অথবা জেল।—আচ্ছা, যদি এই মুহূর্ত্তে সি আই ডির পাঁচটা লোক সিঁড়ি দিয়ে টপ-টপ করে উঠে এসে, ওই দোরের সামনে দাঁড়ায়,—আপনি কি মনে করেন যে তারা বিশ্বাস করবে এই বই হাতে নিয়েও আপনি ওদের হাতে পড়বার যোগ্য শিকার ন'ন?—ও কি! চমকে উঠে দোরের দিকে চাইচেন যে? না—না, এখনও আসে নি কেউ,—হয় ত কোন দিনই আসবে না,—আবার ধরুন, যদি এক্ষণি এসেই দাঁড়ায়,—সবটাই তো ভেবে দেখতে

হয়। ধরুন, যদিই পুলিশ এসে ওই বই যারা রাখে, যারা পড়ে, তাদের মধ্যে থাকতে দেখলে আপনাকেও ধরে নিয়ে যায়, দুঃখ দেয়, নির্ব্বাসিত করে—”

বিমল সহসা কি যেন একটা গুপ্ত বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। তার নির্ব্বাক শুষ্ক-প্রায় অধর-ওষ্ঠ যেন কোন গোপন সরসতার রসে সিক্ত হইয়া আসিল, সে ঈষৎ জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—“সে যদি আপনারা সইতে পারেন,—আমিও পারবো,—তা'তে নিজেকে দুর্ভাগা বোধ করবো না।”

“পারবেন কি সত্যি-সত্যি? পুলিশের হাতের নির্য্যাতনের খবর জানেন কিছু? সে সইবে আপনার?”

“অতটুকু শক্তি আমার মধ্যে নেই বলে আমার মনে হয় না। যদি অবিচারের দণ্ড মাথায় পড়ে, সে আমি মাথা পেতে নিয়ে বইতেও পেরে উঠ্‌বো,—কিন্তু ওসব কাল্পনিক চিন্তার কাজ কি? আমরা বাস্তবিকই তো আর কোন অপরাধে অপরাধী নই, পুলিশই বা হঠাৎ আমাদের পিছনে লাগবে কেন? একটুখানি দোষের গন্ধ না পেলে তারাও একেবারে নির্দ্দোষীকে পীড়ন করে না,—অন্ততঃ আমার তো এম্‌নি বিশ্বাস।”

উৎপলা মৃদু হাসিল,—সে হাসিতে ও কণ্ঠস্বরে বিশেষ করুণা ধ্বনিত হইয়া উঠিল, সে কহিল,—“আপনি এখনও নেহাৎ ছেলেমানুষ। ‘অপরাধের গন্ধ' আপনি কা'কে বলেন? কলেজে দলবদ্ধ হয়ে সাহেব মারা, নিষিদ্ধ পুস্তক ঘরে রাখা,—এর চেয়ে আর বেশি কোন্ অপরাধে পরাধীন দেশের লোকে দণ্ডনীয় হয়ে থাকে?”

বিমলের মুখ আবার একবার একটু শুখাইয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতেই একবারের জন্য তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মুক্ত দ্বারের দিকে ফিরিল, ক্ষণকাল সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিল না,—গঠিত মূর্ত্তির মতই স্তব্ধ রহিল।

“বিমলবাবু!—”

বিমলেন্দু নীরব বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল। তার মুখের উপর তপ্ত

শোণিতের গতাযাতে মানসিক সংগ্রাম প্রকটিত হইতেছিল।

প্রশান্ত স্বরে উৎপলা কহিল, "বিমলবাবু! কাল আপনি ছোড়দা'র কাছে যে আত্মদান করে বসেছিলেন, সে একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। তা' নইলে যাদের ভাল করে চেনেন না, যাদের জীবন কি,—কি তার উদ্দেশ্য,—কোন-কিছুর সঙ্গেই পরিচয় নেই,—সেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকে যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে এলেন, এটা কি স্বাভাবিক? ছোড়দা'ও এটা ঠিক বুঝতে পেরেছিল,—তাই আমাদের যে নিয়ম আছে, যে,—যে আমাদের দলভুক্ত হবে, তাকে এই খাতায় নিয়মাবলী পাঠ করে সেই সব দায়িত্বের বশ্যতা অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিজের নাম সই করে দিতে হয়। কাল সেই সাময়িক একটা মত্ততার মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সে-সম্বন্ধে বাধ্য করেনি। আজ সে দরকারী কাজে দূরে গেছে,—কিন্তু আমার উপর ভার দিয়েছে, যদি আপনি নিজের সেই ক্ষণিক উচ্ছ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে দূরে সরে যেতে চান, যদি……"

বাধা দিয়া বিমল উঠিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, "খাতা কই?"

উৎপলা কি বলিতে যাইতেছিল,—ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া অসহিষ্ণুভাবে পুনশ্চ কহিল, "আমার সংকল্প স্থির,—দিন,—কোথায় কি লিখ্‌তে হবে।"

উৎপলা নিঃশব্দে উঠিয়া গেল এবং মুহূর্ত্ত পরেই একখানা মার্ব্বেল-কাগজে বাঁধা মোটা খাতা লইয়া ফিরিয়া আসিল,—সেখানায় 'মৃত-সঞ্জীবনী' সভার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বহু সংবাদ ছিল। কয়েকটি কঠিনতর নিয়মাবলীর পরিশেষে এই কয়টি কথা লিখিত আছে:—'এই সভা-সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি এই নিয়ম কয়টির মধ্যে যে কোন একটি নিয়মভঙ্গ করিলে, তাহাকে নিশ্চিতরূপে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্বাস-ভঙ্গের অথবা শপথ-ভঙ্গের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু

এই পর্য্যন্ত পড়া হইতে বিমলের হাত একটু কাঁপিল,—তার কণ্ঠ ভেদ

করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বহিয়া গেল। সেটা যে উহার অজ্ঞাত ছিল না, তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ উৎপলা মৃদু হাস্যের সহিত তার মুখে স্থির চক্ষে চাহিয়া বলিল, "এ খুব কঠিন প্রতিজ্ঞা বিমলেন্দুবাবু। আপনার হয় ত এতে সাহস হবে না,—আপনি এখনও সরে যান।"

খাতাটার যেখানে আরও কয়েকটা নামের স্বাক্ষর ছিল, তার সর্ব্বশেষে নূতন আর একটা নামের সংযোগ হইল—শ্রীবিমলেন্দুপ্রকাশ সেনগুপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিকালের ডাকে এই পত্র বিমলেন্দুর হস্তগত হইল—

"শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,

বিমল। পূজনীয় পিতৃদেব মৃত্যুশয্যায়। তোমায় একবার শেষ-দেখা দেখতে চান। তাঁর বিশেষ অনুরোধ—অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিও না। এই পত্র তোমার অমৃত মামাকে দেখাইলে তিনি তোমার এখানে আসায় আপত্তি করিতে পারিবেন না। আশা করি, তাঁর এই শেষ ইচ্ছাটি তুমি পূর্ণ করিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আশীর্ব্বাদ লইও।

তোমার চির-শুভার্থিনী মা

ইন্দ্রাণী।"

এই পত্রের অপর পৃষ্ঠায় সুচারু ছাঁদে সুন্দর অক্ষরে তারার লিখিত দীর্ঘ পত্র। সে পত্রে রামদয়ালের মুমূর্ষু-প্রায় অবস্থার জন্য বিলাপ, বিমলেন্দুর দীর্ঘ-

কাল উহাদের বিস্মৃত থাকার জন্য অভিমান ও মৃদু তিরস্কার এবং একবার মাতামহের মৃত্যু-শয্যায় শেষ সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ—ছত্রে-ছত্রে প্রকটিত। অবশেষে লিখিয়াছে,—"তোমার কি মনে পড়ে না দাদা, দাদু আমাদের কত ভালবেসেছেন? তুমি বোধ হয় বুঝতে পার নি, তিনি তোমার কতবড় শুভাকাঙ্ক্ষী। এই অসহ্য রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে রয়েছেন,—তবু প্রত্যেক দিন ডাক এলে একবার করে খবর নেন, তোমার কোন চিঠি এসেছে কি না? আমার মামাবাবু মারা গেলে মা যখন শোকে অত্যন্ত কাতর, তিনি নিজের সে শোক সম্পূর্ণ চেপে রেখে, তোমায় আনতে গিয়েছিলেন.—সে কথা মনে পড়ে কি? তুমি এলে না। অমৃত মামা আসতে দিলেন না,-[illegible]। তিনি ফিরে এসে মাকে বল্লেন, 'মা, সেবার বিমলকে নিয়েই তুই তোর সবচেয়ে বড় দুঃখকে জয় করেছিলি, তাই ভেবেছিলুম, এবারও তাকে এ দুর্দ্দিনে তোর কোলে এনে দিতে পারলে তাকে দেখে তোর বুক একটু ঠাণ্ডা হবে,—কিন্তু পারলাম না।' দাদা। কতবড় স্নেহময় মহৎ-প্রাণ আত্মীয় তুমি হারাচ্চো, তা হয় ত বুঝতেও পারচো না,—কিন্তু এক দিন হয় ত পারবে। কি জানি কেন, আমার এই কথাই কেবল মনে হচ্চে!—একবার আসবে না কি?—ইতি—তোমার বোনটি'—তারা।"

বিমলের শিরায় শিরায় খর রক্ত-স্রোত ছুটিয়া গেল। কি মিষ্ট ভর্ৎসনাপূর্ণ ব্যাকুল অনুযোগ! কি বেদনাময় সকরুণ আহ্বান।—তারা। তারা! বোনটি আমার! কতদিন যে তোকে দেখি নাই রে! তুই নিজে ডাকিতেছিস, তবু যাইব না? দাদু আজ মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছেন।—ওই বৃদ্ধ তাহার কেহ না হইয়াও যে কত স্নেহ—কত আদরই তাহাকে করিয়াছেন,—সে-সব কথা অকস্মাৎ আজ যে মনে পড়িয়া যাইতেছে! না গিয়া কি সে থাকিতে পারে?

অমৃত পত্র পড়িয়া একটু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তার পর জিজ্ঞাসা

কারল,—"তা'হলে কি কবা ঠিক করেছ ?"

বিমল দৌরবেব সহিত জবাব দিল, "যাবো—আজই, এক্ষণিই যাবো !" বলিতে-বলিতে চিন্তিত হইয়া পড়িল। ইতঃপূর্ব্বে একা কোন দিনই সে কলিকাতাব বাহিবে পদার্পণ কবে নাই। বাবীৎপুব কোন্ পথে কোথা দিয়া যাইতে হয়—সে সকলেব কিছুই সে জানে না।

অমৃত কহিল, "যাবে, তা' যাও,—তবে কি না, তোমার সৎ-মাযেব এ একটা মস্তবড চক্রান্ত,—এটা জেনে যাওযাই ভাল। রামদযাল গুপ্ত মরচে না কচু করচে! মববাব ভান কবে এই সমযে মেযেব বিষযটার বন্দোবস্ত করে ফেলবার বেশ একটা ফন্দি বাব কবেছে বটে। আচ্ছা পাকা লোক যা' হোক।"

বিমল পথেব বিডম্বনা ভাবিযা ঈষৎ নিরুদ্যম বোধ কবিতেছিল ; সে এই মন্তব্যে কিছু আশ্বস্ত হইযা বলিযা উঠিল, "কিন্তু তা যদি না হয ?"

অমৃত মুচ্কিযা হাসিয়া কহিল, "বাপু! সাপেব হাঁচি বেদেয় চেনে! তুমি একটা কচি ছেলে,—তোমায ঠকানো যত সোজা, আমায ঠকানো তো আব তেমন নয। ওই চিঠি,—তুমি কি মনে কবো, সেই এক ফোঁটা মেযে তাবাব মাথা থেকে বাব হযেছে ? তা'হলে সে এতদিন এনি বেসাণ্ট হযে টাউনহলে টাউনহলে বক্তৃতা কবে বেডাত,—ঘবেব কোণে বসে থাকতো না।

একটু পবেই সাজসজ্জা করিযা বিমলেন্দু বাহিব হইযা গেল এবং ইদানীং তাব যেমন নিযম হইযা দাঁডাইযাছে, সেইরূপ গভীর রাত্রে ফিরিয়া আসিল। নিদ্রিত অমৃতকে জাগাইযা, অধৈর্য্য-কৌতূহলে প্রশ্ন কবিল, "মামা! আচ্ছা বলুন দেখি, আমার বাবাব যা' সম্পত্তি আছে, সে সমস্তই কি আমার একলার ? তা'তে আব কারু কোন অংশই তো নেই ?"

অমৃত নিদ্রা-জডিত অলস চিত্তে ক্ষণকাল মূঢেব মত থাকিয়া পরে সজাগ হইযা উত্তর করিল, "যা' দাঁড়িয়েছে, তা'তে সেই রকমই হয়ে পড়েছে বটে! তবে তোমার বাপের উইলে লেখা আছে যা, তা'তে তোমার সৎ-মা তাঁর অর্দ্ধেক

বিষয়ের অধিকারিণী।"

বিমল সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "তা'হলে তিনি সেটা পেলেন না কেন?"

অমৃত কহিল, "তাঁর বাপ সে সময় আদালত থেকে উইলের প্রোবেট নেওয়া দরকার বোধ করেন নি। গেঁয়ো লোক,—আইন-আদালত না জানার দরুণই হোক, অথবা ও'দের যেমন একটা সঙ্কীর্ণতা সকল কাজেই পা বেঁধে রাখে,—তার জন্যই হোক, ওটা করেন নি। তার পর যখন আমার হাতে সব ভার পড়লো, তখনও ওই আলস্যে—বা আর কিছু বড় নাম দিয়ে তার গৌরববৃদ্ধিই করো —ঐ সঙ্কোচ তাঁকে মেয়ের টাকার দাবী রাখতে দেয় নি। তা' আমরা বছর-তিনেক ধরে যতদিন উনি দৌলতপুরে থেকেচেন, মাসহারা পাঠিয়েছি, যখন থেকে বাপের বাড়ী চলে গেছেন, তখন থেকে আর সেখানে উপযাচক হয়ে খরচ পাঠাবার দরকার মনে করি নি।"

বিমলেন্দু ও কথায় কান না দিয়া নিজের চিন্তা-ধারার অনুবর্ত্তনে কহিল, "তা'হলে এর পরে যদি কখন বউ সেই টাকার দাবী তোলে, তা'হলে তো অর্দ্ধেক বিষয় সে পাবে?"

অমৃত উত্তর দিল, "উইল যে জাল নয়, এখন সেটা আরও ভাল করে প্রমাণ করতে হবে অবশ্য।—করতে পারলে তখন হয় ত পেতে পারে। অনেক ফ্যাঁসাদ সইতে পারলে তার শেষে।"

বিমল কি ভাবিতেছিল,—সেইরূপ চিন্তিত চিত্তেই, আত্মগত কহিল, "তা'হলে তারার বিয়ের জন্যে কিছু বেশি টাকা দিয়ে দিলেই তিনি হয় ত সব বিষয়টার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, না?"

অমৃত সংক্ষেপে কহিল, "সম্ভব!" বলিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "হঠাৎ তোমার এসব কথা জিজ্ঞাসা করবার করণ কি?"

বিমলেন্দু নিজের ঘরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিয়া উত্তর দিল, "এসব কথার আমি তো কিছুই জানতুম না,—তাই একটু জিজ্ঞেস করছিলুম।"

বিমলেন্দুর আকস্মিক উদ্রিক্ত এই অনুসন্ধিৎসা যাহা মানুষের মধ্যরাত্রের সুখ-নিদ্রাকেও খাতির করে না,—ইহা অমৃতকে যে খুব সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, ইহা সপ্রমাণ করিয়া, বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে সে কহিয়া উঠিল, "এ জানবার জন্যে সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কি চল্‌তো না বিমু?"

বিমল ততক্ষণে নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর দিন কোথা হইতে শুনিয়া আসিয়া বিমলকে গ্রেফ্‌তার করিয়া অমৃত তার অভিভাবকের মর্য্যাদার উপযোগী গম্ভীর ভাবে কথা কহিয়া বলিল, "এ সব কি শুন্‌তে পাচ্চি, বিমল? তুমি না কি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছ?"

বিমলও নিজের স্বভাবানুযায়ী গরিমা-দৃপ্ত ভাবে জবাব করিল, "দিচ্ছি কেন, দিয়েছি।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া অমৃত কহিল, "কারণ?"

বিমল কহিল, "কারণ অনেক, তার মধ্যে একটা—অবিচার।"

"অ-বি-চার! কার ওপরে কে' অবিচার করলে শুনি?" অমৃতের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুর সীমাতিক্রম করিতেছিল। বিমল কহিল, "আপনি কি দুনিয়ার কোন খবরই রাখেন না?... ..সাহেবকে মারা নিয়ে যে গোলমাল হলো, তা'তে ছেলেদের ওপর কি কঠোর ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা দেখতে পান নি?"

অমৃত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, "একটা প্রফেসরকে ধরে বেদম মার দিলে—আর তাদের ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করা হয় নি বলে তুমি পড়া ছেড়ে দিচ্চো? সেই গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষা ক'টাকে যে শাস্তি দিয়েছে, সে কি তাদের পাপের উপযুক্ত হয়েছে মনে করো তুমি? দু'বছর, চারবছর কি,—আমি হলে ক্লাসকে ক্লাস সুদ্ধ রাবরের জন্যে রাষ্টিকেশানের হুকুম দিতুম। এ ত শুধু ঐ গুণ্ডা-দলের সর্দ্দারটাকেই চিরকালের মত করেছে!"

বিমলের শিরায়-শিরায় বিদ্যুদগ্নি ছুটিয়া গেল। অপরাহ্ণ বেলার লোহিতাভা-দীপ্ত সূর্য্যরশ্মির মত আ-ললাট চিবুক লাল করিয়া সে তার আত্মীয়-অভি-

ভাবকের মুখে নিজের অগ্নি-দৃষ্টি স্থাপিত করিল। তার মুখ হইতে এক ঝলক আগুনের ফুলকির মত নির্গত হইল,—"খবরদার! তাঁর সম্বন্ধে সাবধান হ'য়ে কথা বলো!"

অমৃত নিজের অজ্ঞাতসারেই বাবেকের জন্য মাথা নত করিযাই পরক্ষণে আত্মসম্বৃত হইল, জোর করিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে কহিল, "কেন বল দেখি?—তিনি কি গবর্ণর জেনারেল?"

তীব্র পরিহাসের স-ঘৃণ হাস্যে বিমলের সমস্ত মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অবজ্ঞার সহিত সে উত্তর দিল, "তিনি গবর্ণর জেনারেল না হ'তে পারেন, কিন্তু তুমি কে' তার ঠিক রেখেছ কি?"

অপমানিত ক্রোধে অমৃতের সুন্দর মুখ কালিবর্ণ হইয়া উঠিল। সক্রোধে ডাকিল, "বিমল!"

বিমল তার ক্রোধে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া পুনশ্চ সেই ঘৃণাপূর্ণ হাসি হাসিল, "তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক, পরের অন্নদাস,—কেমন করে তাঁর মহিমা তুমি বুঝবে? চাঁদকে কলঙ্কী বল্লে তার গৌরব লুপ্ত হয় না।—জানো কি অমৃত মামা!"

বিমল কোন দিনই কাহারো মর্য্যাদা রাখিয়া চলে নাই,—অমৃতেরও না। তবে ইদানীং বড় হইয়া কলেজে ঢুকিয়া তার গ্রাম্য ভাব অনেকখানি শোধরাইয়াছিল। এমন স্পষ্ট ভাষায় অপমানও সে অমৃতকে অনেক দিন করে নাই। বিশেষ ঐ "বিশ্বাসঘাতকতার" কথাটা তার মর্ম্মসন্ধিতে গিয়া বিঁধিয়াছিল তাই বিদ্ধ বরাহের হিংস্র গর্জ্জনে ঘর কাঁপাইয়া নিজেদের বংশ-শোণিতের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই অমৃত গর্জ্জিয়া উঠিল, "এইজন্যেই কি এত বৎসর ধরে সব ছেড়ে তোমায় মানুষ করলুম, বিমল? তোমার ভালর জন্যে নিজের পিসির মনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ দিয়েছি,—নিজে বিবাহ পর্য্যন্ত করি নি, যে, তা'তে তোমায় এমন সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে দেখতে পারবো না,—তারই কি এই ফল?"

বিমল উত্থলিত ক্রোধ দমনে রাখিয়া বিদ্রূপের তীব্র হাসি হাসিল। অমৃতকে আরও একটু আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া তার অভিযোগের জবাব দিল, "সে যে তুমি আমায় ভালবেসে করো নি, সে কথা যেমন আমিও জানি,—তেম্‌নি তুমি নিজেও জানো। যার জন্যে করেছিলে, সে সম্বন্ধে তুমি যে একটুও ঠকোনি, সে কথা আমি হলপ করেই বল্‌তে পারি। যেমন তোমার সাত্ত্বিক উদ্দেশ্য, ফল কি আর তার চাইতে শুদ্ধ হবে ভেবেছিলে? তা'হলে তোমার হিসাবে মস্ত বড় ভুল হয়েছে বল্‌তেই হবে!"

বিমল চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রোধাতিশয্যে ও বিস্ময়বিমূঢ়তায় অমৃতের মুখ দিয়া কোন শব্দই বাহির হইল না। যখন হইল, তখন সে গুম্‌ হইয়া শুধু বলিল,—"হুঁ!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বারীৎপুর গ্রাম হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্রগ্রাম নয়। গঙ্গাতীর হইতে একে নেহাৎ হতশ্রী দেখায় না। গ্রামের মধ্যে কিছু মধ্যবিত্তের বাস থাকায় এই গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক স্কুল, একটি ছোট-খাটো লাইব্রেরী ও সম্প্রতি গ্রামের মেয়েদের জন্য একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। রামদয়াল গুপ্ত পুরুষানুক্রমে এই গ্রামেরই বাসিন্দা। অবস্থাপন্ন বলিয়া তাঁদের একটি খ্যাতি ও প্রতিপত্তিরও ছিল। সেটা রটিয়াছিল এঁদের দান-শক্তির প্রভাবে।—ঐশ্বর্য্য-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া নয়। সাধারণের সকল কার্য্যে,—যথা,—স্কুল-সংস্থাপন ও পরিচালনে, লাইব্রেরী-স্থাপনায়, মিউনিসিপ্যাল যে কোন

ব্যাপারে,—সর্ব্ব বিষয়েই রামদয়াল অগ্রণী ছিলেন। এর জন্য পয়সা খরচ তাঁকে সামান্য করিতে হয় নাই। তার পর আজ দুই বৎসর হইল, তাঁর একমাত্র পুত্র তাহারই জামাতা প্রদর্শিত পথে এক বিধবা তরুণী-বধূ তাঁর গলায় গাঁথিয়া দিয়া দীর্ঘ-রোগ ভোগান্তে অনন্তের অজানা পথে যাত্রা করিয়াছে। দুশ্চিকিৎস্য রোগের বহুব্যয়সাধ্য চিকিৎসায় তাঁর স্বল্প সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় এই গ্রামে এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাঁর অবস্থা বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে সমানে সমানে দাঁড়াইতে বড় বেশি বাকি থাকিল না। সে কথাটা বলার পূর্ব্বে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গ্রামের অবশ্য একজন জমিদার ছিলেন। বহুকাল তিনি অন্যান্য জমিদার-জাতীয় জীবদের মত অসভ্য পল্লীজীবনের মায়া কাটাইয়া সহরবাসী। তাঁদের পুরানো ফ্যাসানের অট্টালিকার সদর দেউড়ী খোলা থাকিলেও ভিতরে একটি দুঃস্থ আত্মীয় পরিবার ব্যতীত বড় কেহ বাস করিত না। এই পরিবারটির দারিদ্র্য-খ্যাতি এ অঞ্চলে সর্ব্বশ্রুত। জমিদার-গৃহে বাস করিয়াও এঁরা একাহারী অনাহারী থাকিয়া দিনপাত করিতেছেন,—সে কথা তাঁরাও গোপন করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিতেন না।

একদা বহুকাল-বিস্মৃত পিতৃ-ভূমে এক জমিদার পুত্রের আবির্ভাব ঘটিল। দেশের লোক কৌতূহলী হইয়া জমিদারপুরে ভিড় জমাইল, কিন্তু বিরক্তি ও নৈরাশ্য লইয়াই ফিরিয়া গেল। জমিদার-পুত্রের চেহারাটা ছাড়া আর কোন-খানেই তার জমিদারত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছেলেটির ঘাড় চাঁচিয়া কামানো,—সামনে কোঁকড়া চুলের সুন্দর স্তর,—উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় সোনার চশমায় মণ্ডিত,—গায়ে তার সাদাসিদা পিরাণ ও পরণে তেমনি ধুতি। সে আসিয়া বড়রকম একটা ভোজ দিল না,—খাজনা মাপ দিল না,—একদিন বাহিরের বারান্দায় লোক জড়ো করাইয়া গ্রামবাসীর নিকট—কলিকাতায় যে পল্লীতে সে বাস করে, সেখানেরই কি একটা অজ্ঞাত প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত যে সাহা-

তারা করিয়াছে, (যার সঙ্গে এ গ্রামের কোন লাভ-ক্ষতির সম্বন্ধ নাই), তাহারই জন্য চাঁদার খাতা বাহির করিল। গ্রাম্য-বৃদ্ধগণ প্রকাশ্যে নিন্দা করিলেন, অপ্রকাশ্যে গালি দিলেন। যুবার দল কেহ বা সামান্য কিছু চাঁদা দিয়া জমিদারের সহিত সখ্য করিল, কেহ বা জমিদারের এবং তাঁর সাথীদের সঙ্গে বচসা আরম্ভ করিল। জমিদার বলিলেন, "এ দেশের কাজ,—এতে সকলের যোগ না দিলে অপরাধ এবং পাপও হইবে। অতএব তোমাদের আত্মার কল্যাণের জন্যই তোমাদের ইহাতে যোগ দিতে ডাকিতেছি।"

উহারা বলিল, "দেশের যদি কাজ হইত তা' হইলে দেশ ইহার ফলভাগী হইত। তোমার কলিকাতার রাস্তায় গিয়া তুমি হাত-পা নাড়িয়া বক্তৃতা করিবে তাহাতে আমার ঘরে কি অর্থ আসিবে?—না, আমার গ্রামের ম্যালেরিয়া দূর হইবে?—না, ভাত কাপড় সস্তা হইবে?" জমিদার ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেশের আইডিয়াটা তোমাদের কত সঙ্কীর্ণ! দেশ বলতে কি এই গ্রামখানিকেই বোঝায়? সমস্ত ভারতবর্ষই তো আমার দেশ, ভারতলক্ষ্মী আমার দেশ-মাতা। শুধু গ্রামের উন্নতি, ঘরের উন্নতি খুঁজলে দেশের কাজ করা হয় না। আমাদের এখন স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই, নিজেদের সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, ঐ বিষয়েই চেষ্টা করতে হবে।"

অপর পক্ষ চটিয়া বলিল, "রেখে দিন আপনার স্বরাজ! রেখে দিন স্বাধীনতা! নিজের গাঁয়ের ভিটে মাটি হচ্ছে, গাঁয়ে খাবার জলের অভাবে লোকে পচা জল খাচ্চে। মড়কে মানুষ মরে গ্রাম শ্মশান হয়ে যাচ্ছে,—একটা ডাক্তারখানা নেই, অতিথিশালা নেই,—এইটুকুই পেরে ওঠেন না।—আর সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন কর্ব্বেন। ছেলের হাতের মোয়া কি না।"

জমিদারের দল উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, "ছোট কাজ কর্ব্বার অবসর অনেকেরই হয়। একটা মহত্তর ব্যাপার সংঘটিত করে তোলা চাট্টিখানি কথা না। আগে স্বরাজ আদায় হোক, এসব—তখন আপনিই হয়ে যাবে।"

বিপক্ষগণ এ কথা মানিতে চাহিল না। তারা সেকালের নিস্তরঙ্গ দেশ-প্রীতির দু'একটা উদাহরণ দিতে বসিল,—যখন সভা-সমিতির জাঁক ছিল না, কিন্তু সত্যকার কাজ ছিল। ধর্ম্মের মাধ্যমে সহজেই জনহিতকর কার্য্য হইত। জমিদার বাড়ীতে চিকিৎসালয়, অতিথিশালা থাকিত, দরিদ্র আত্মীয় প্রতিপালিত হইত, নিত্য নিত্য ক্রিয়া-কলাপে গরীবসাধারণ ভালমন্দ খাইতে পাইত, পুণ্যের লোভে লোকে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা হইত। বৃক্ষ প্রতিষ্ঠায় বৃক্ষ-ছায়ায় পথিকের তাপ দূর করিত এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ করিত। কেহ কেহ দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গ্রামের রামদয়াল গুপ্তের নাম করিল, বলিল—"এখনও ঐ একটি বৃদ্ধ বেঁচে রয়েছেন, কোন ধূমধাম না করেই সমস্ত হিতকর কাজের মধ্যে আছেন তিনি। 'স্কুল চাই?—আচ্ছা,—স্কুল নাও। পুকুর মজে উঠেছে? কাটিয়ে দিচ্চি। রাস্তা মেরেমেরামত,—তা'ও তৈরি হলো।' তা' যতটা শক্তি—অর্থ দিয়ে, যতটা শক্তি—সামর্থ্য দিয়ে, আর যতটা পারা যায় দৃষ্টান্তে ও মিষ্টি কথায় পাঁচজনের মন ভুলিয়ে। একেই বলি দেশের কাজ! প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক পল্লীতে যদি এরই অনুকরণ করা হয়, তবে দেশে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা আপনি হবে।"

নবীন জমিদার দলবলকে বলিল, "ওহে! রামদয়ালের কাছে গেলে হয় ত বড় রকম চাঁদা আদায় হবে। ধরে করে পাঁচজনের কাছে থেকেও কিছু কিছু—"

বাড়ীতে পা দিয়াই জমিদারের ছেলেটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সূর্য্যের প্রথমোদিত রক্ত-রাগের নবীনালোকে যেন তার দু' চোখ ধাঁধিয়া গেল। এমন দর্শনীয় পদার্থ তাদের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়নের মধ্যে স্থান-লাভ তো করেই নাই, —বরঞ্চ মায়ার বিকার বোধে বিদূরিতই হইয়াছে। তথাপি সেদিন ইহার দিকে চোখ পড়িতে তার অন্তরের নিগূঢ় আনন্দের তুফান তার সারা মনে-প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া সারা চিত্ত দুলিয়া উঠিল,—সমস্ত বিশ্ব যেন সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখের আলোয় ঝলক দিল। কিন্তু সে নিমেষের মত। সদ্যস্নাতা রাঙা-চেলী-পরা,

তারা অপরিচিত যুবকের প্রশংসমান নেত্রের সহিত দৃষ্টি মিলিতেই সচকিতে সরিয়া যাইতেই লজ্জার মেঘে তরুণ সন্ন্যাসীর অন্তরের সমস্ত আলোকোৎসবের মুখ ঢাকিয়া দিল। নিজের এই ক্ষণিক আত্ম-বিস্মৃতি তার মনে নিরতিশয় বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। অন্তরের এই লুব্ধ তন্ময়তা তার সারা চিত্তকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। ছি ছি—প্রথম প্রলোভনের কাছেই কি সে পরাভূত হইল নাকি? এই শক্তি লইয়া সে এত বড়,—না, এ তার পরাজয় নয়। মহাদেব যেদিন দেব-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া ভস্মীভূত কন্দর্পের পার্শ্বোপবিষ্টা নিরুপমা উমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিলেন, সেই দিনেই বিজিতেন্দ্রিয়তা তাঁর জনপূজ্য হইয়াছে। সম্মোহন-শক্তি যত প্রবল, মোহ কাটানোর মহিমা ততই জয়যুক্ত। প্রলোভন যেখানে ক্ষুদ্র,—সেখানে তাহাকে জয় করার মহত্ত্ব মহত্ত্বরও নহে।

বৃদ্ধ জীর্ণদেহ রামদয়ালের সহিত এই নবীন এবং জীবনের উদ্দাম চাঞ্চল্যে সতেজ তরুণটির অনেক কথাই হইল। রামদয়াল উহার চাঁদার খাতায় সই দিলেন না, তবে পঁচিশটি টাকা নগদ গণিয়া উহার হাতে দিলেন। ছেলেটি খুঁৎ খুঁৎ করিয়া জানাইল, তাঁর বদান্যতা সম্বন্ধে সে এর চাইতে অনেক বেশী শুনিয়াছিল। রামদয়াল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, লোকে সাধারণতঃ একটু বেশি করিয়াই বলে। আপাততঃ এখানে একটি মেয়ে-স্কুল করিবার কল্পনা আছে; সেজন্য কিছু টাকার প্রয়োজন। গ্রামের কাজ ফেলিয়া গ্রামান্তরের কাজে হাত দেওয়া তাঁর মতে সঙ্গত নয়, অবশ্য যদি সেটা বেশী প্রয়োজনীয় না হয়।

ছেলেটি বুঝিল, ইতঃপূর্ব্বে যারা এই গ্রাম্য-প্রীতি লইয়া তর্ক করিয়াছিল, তারা এই বৃদ্ধেরই ছাত্র। কিছু বিরক্ত হইয়া কহিল, "দেখুন 'আইডিয়ালটা' 'হাই' হওয়ার দোষ কি? এই যে সব সঙ্কীর্ণ মতগুলো আপনারা প্রচার করেন, দেশের এই নূতন উদ্যমের দিনে এটা কি ভাল?"

দয়াল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্‌টা?"

ছেলেটি উত্তর করিল, "এই—গ্রামকেই সর্ব্বস্ব মনে করা? এক তো আমাদের দেশের লোকে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাওয়াকে 'বিদেশ যাত্রা' মনে করে, নিজ-শ্রেণীর বাইরেই ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে এক পংক্তিতে খায় না,—ব্রাহ্মণ-কায়স্থে তো নয়ই।—এখনও যদি আপনারা এই সব জটিল এবং কুটিল শিক্ষার কুহক থেকে দেশকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করে তাকে এক বিশাল ভারতবর্ষ,—এক বৃহত্তম ভারতীয় নেশনে পরিণত হ'তে না দিয়ে শুধু নিজের পরিবারে—স্ব-গ্রামে বদ্ধ রাখতে চান, তা'হলে আমাদের স্ব-রাজ প্রাপ্তির আশা কি আকাশ-কুসুমেই পর্য্যবসিত হবে না?"

বৃদ্ধ ব্যক্তি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছেন এমন বোধ হইল না। মৃদু-হাস্যে তাঁর শীর্ণ মুখে এক অপূর্ব্ব দ্যুতি বিভাসিত হইল। তিনি তরুণের আবেগোত্তেজিত আরক্ত-সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া স্নেহ-মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা! তুমি যা' বল্‌ছো, সব ঠিক,—কিন্তু নিজের পরিবারকে,—স্ব-গ্রামকে যদি দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলে রাখতে চাও, তা'হলে তোমার স্ব-রাজকে তুমি প্রতিষ্ঠা করবে কোন্ সহরের কোন্ টাউন হলে? প্রত্যেকে যদি তোমরা তোমাদের দরিদ্র আত্মীয়ের দরিদ্র মূর্খ প্রতিবেশীর অজ্ঞতা, রোগ, অভাব বিদূরিত কর্ব্বার জন্য বদ্ধ-পরিকর হও,—যদি সহস্র সহস্র অশিক্ষিতকে বিদ্যা দান করো, নৈতিক চরিত্রে উন্নতি দানের চেষ্টা করো,—শত শত অনাচরণীয় জাতিকে মানুষ করে গড়ে নেবার জন্যে আত্মোৎসর্গ করো,—যে ম্যালেরিয়া সোনার বাংলাকে যমের দক্ষিণ দুয়ারে পরিণত করে তুল্‌ছে, তার উচ্ছেদকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম তপস্যা করে তোল,—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শক্তি সাধনার সঙ্গে প্রাচ্যের ধর্ম্মপ্রাণতায় অলঙ্কৃত করে তোল,—তা'হলে তার চেয়ে বড় স্ব-রাজ আর কে' কোথায় পেয়ে থাকে?

ছেলেটি গভীর ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "কিন্তু এসব পরেও তো হ'তে পারে,—আপাততঃ যারা জোঁকের মত রক্ত শোষণ কর্ব্বার

জন্যে আমাদের গায়ের উপর বসে আছে, তাদের—"

বাধা দিয়া রামদয়াল কহিলেন, "তাদের গায়ের উপর দুটো পট্‌কা ছুঁড়ে দিলেও তারা তোমাদের গায়ের রক্ত বজায় রেখে পালিয়ে যেতে ব্যস্ত হবে না। অতএব, সেদিকে ঝোঁক না দিয়ে, যাতে তোমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করে—রাজরাজ্যেশ্বর—যিনি প্রকৃত নেওয়া দেওয়ার কর্ত্তা—তাঁর কাছ থেকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে স্বাধিকার পেতে পারো, সেই দিকেই মনোযোগী হও। যে চেষ্টা অনুচিত পথে—"

ছেলেটি সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "থাক্। আপনার এই টাকার জন্যে অনেক ধন্যবাদ! আমাদের দুজনকার মতের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশটি বছরের তফাৎ থাকাই স্বাভাবিক। আর সেটা থাকাই ভাল!"—ছেলেটি পিছন ফিরিতে গিয়া পশ্চাৎ হইতে সঙ্গীতমগ্ন কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনিল, "দাদু! মা জিজ্ঞেস করলেন খাবার আন্‌বেন কি?"

ফিরিয়া চাহিতেই সেই কিশোরী উমার মত তন্বী ও গৌরী মেয়েটির কৃষ্ণপল্লবে অর্দ্ধাবরিত স্নিগ্ধ দুটি চোখের উপর দৃষ্টি পড়িল। মেয়েটি ঈষৎ বিব্রত ভাবে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তার পরণে এখন আর সেই লালচেলী ছিল না, হাতে কাটা সূতার মোটা সাড়ী মাত্র, কিন্তু তা'তেও তার রূপের প্রভা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই।

ছেলেটির নির্ভীক দ্রঢিষ্ঠ-চিত্ত ঈষৎ চাঞ্চল্যের ভরে বার কয়েক তার বুকের মধ্যে দোলা দিয়া গেল। সে চকিতে চোখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকিয়া মেঘের মধ্যে লুকাইলেও দ্রষ্টার মনের আকাশে যেমন কিছুক্ষণ তার খেলা চলিতে থাকে, তেমনি সেই তড়িল্লতাবৎ রূপসী তন্বীর মূর্ত্তি কয়েকটা দিন ধরিয়াই ইহারও মনে জাগিয়া উঠিতে ছাড়ে নাই।

এরপর আরও দু' একবার আসিয়া সে তার প্রতিপক্ষ বৃদ্ধের সহিত বিরুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগে প্রবল তর্ক করিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই মেয়েটিকে সে আর একটি

রাবও দেখিতে পায় নাই। তবে ইহার পরিচয় পাইয়াছিল। সে এই বৃদ্ধেরই দৌহিত্রী। তাঁর বিধবা কন্যার কুমারী মেয়ে,—নাম যে তার তারা তাও শুনিয়াছে।

যে লোক এই মেয়েব নামকবণ করিয়াছে, তাব সূক্ষ্মদর্শিতাব উপব ছেলেটির শ্রদ্ধা জন্মিল।—এই ছেলেই কলিকাতাব সেই সাহেব মাবিয়া ব্যাষ্টিকেট হওয়া অসমঞ্জ বায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জমিদার বাড়ীতে যাঁবা আশ্রিত থাকিযা জমিদাবের ভিটায দীপদান কবিতেন, জমিদাবদের তাঁবা দূব আত্মীয। জমিদাব-নন্দন বাব কযেক যে দেশে গতাযাত কবিলেন, উহার দরুণ ঐ পবিবাবেব দুঃখ-দাবিদ্র্য যে কিছুমাত্র কম পডিল, এমন সন্দেহ করিবাব কাবণ নাই; বরঞ্চ ঐ সৌখীন বড়লোক আত্মীয—যাঁব ঘবেব আশ্রযে মাথা গুঁজিবাব ঠাঁই জুটিযাছে,—তাঁহাকে অতিথি রূপে যতটুকু সম্ভব আপ্যাযন কবিতে উহাঁদেব ঘাড ভাঙ্গিবাব উপক্রম ঘটিল। উনি তো একা নন,—উঁহাব সহিত আবও দু' তিনটি লোক;—দিন-দুইচার করিযা এঁদেব স্থিতি। ইঁহাবা অনায়াসে আসিযা ঘরের চৌকাঠ চাপিযা বসে। এই আত্মীয পবিবাবটি উঁহার খুড়া সম্বন্ধীয। গৃহিণীকে হাসিমুখে ডাকিয়া বলে, "খুডিমা! তোমার কইমাছের ঝোল, লাউ-ডগাব ডালনা সকাল সকাল চড়িয়ে দাও বাপু,—ভারি ক্ষিধে পেয়েছে।" সারা গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে তর্কযুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া উঁচু গলায় অর্দ্ধেক পথ হইতে ডাক দিতে দিতে

আসে, "খুড়িমা গো! লুচির কত দেরী? দেরি করলে পেটের জালায় নিশ্চয় মারা যাব।" ধার করা পয়সায় কই মাছ ও ঘি কিনিয়া গরীব খুড়িমা এই স্নেহের দৌরাত্ম্য হাসি মুখেই সহিতেন! দেশ-ভক্তির উচ্ছ্বাসে এ সব ছোট কথা উদ্যমী ছেলেটির মনেও পড়িত না, আর অযাচিত ভাবে তার কাছে গরম লুচির দাম চাহিতেও ইহাঁদেরও মাথা কাটা যাইত। তাই এই রসনা তৃপ্তিকর ক্ষুধা-নিবৃত্তির উপাদানগুলির যোগান দিতে তাঁদের উপর যে কতবড় চাপ পড়িতেছিল, সে কথা এঁরা বাহ্য-প্রকটিত কাষ্ঠহাসির অন্তরালে সযত্নেই গোপন রাখিতেন। এমন করিয়া দিন চলিতেছিল,—এমন সময়ে তাঁদের আতিথেয়তার যোগ্য পুরস্কার মিলিল। যে ছেলেটি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকরী করিত, সে একদিন তাদের ধনী ও দেশহিতৈষী বন্ধুর প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া বিড়ম্বনাময় দাসত্বরূপ চাকরীটাতে 'রিজাইন' দিয়া ঘরে ফিরিল এবং অসমঞ্জের নিকটে শেখা কয়েকটা বাঁধা বুলি কপচাইয়া বাড়ীর এবং পাড়ার লোকের সহিত তর্ক করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিধবা মা, স্ত্রী, পুত্র, ছোট ছোট ভাই বোনেরা অর্দ্ধাহারী ছিলই,—অনাহারী হইলেও সে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। কেহ এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বা তিরস্কার করিলে বলিল, "মহৎ দুঃখ ব্যতীত মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হয় না।" কথাটা অসমঞ্জেরই,— তবে প্রয়োগটায় কিছু ভ্রম ঘটিয়াছিল এই যা'! যাই হোক, ছেলেটি নিজের এবং পরের দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে যখন গুটিকতক ছেলেকে দলে টানিয়া, তাদের একটু ভদ্র করিয়া আনিতেছে,—এমন সময় দল সুদ্ধ একটা ডাকাতি মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িল। খুব সম্ভব সেসম্বন্ধে সে দোষীও নয় এবং পুলিশও সে কথা জানে।— তথাপি এই নূতন দলটাকে যখন পুষ্ট হইতে দেওয়া চলিবে না, তখন ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হয় অঙ্কুরেই ইহাকে নষ্ট করিয়া ফেলা বুদ্ধিমানের— বিশেষতঃ, পুলিশের মত বেশী বুদ্ধিমানের নীতি।

ছেলের মা সারা পৃথিবী অন্ধকার দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া রামদয়ালের পা জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যতই রুগ্ন, যতই বৃদ্ধ হৌন, উঁহার দ্বারা সকলের সব কাজই সর্ব্বাবস্থায় ঘটিতে পারে। বিপন্নাকে কোন মতে শান্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা রামদয়াল দুঃস্থের সহায়তা করিতে, অসম্ভব জানিয়াও প্রতিশ্রুত হইলেন। বহু চেষ্টায় নিজের স্বল্প সঞ্চিত অবশিষ্ট সম্পত্তির বিনিময়ে বিধবার ঐ একমাত্র পুত্রকে চার বৎসরের নির্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেন। এর উপর আবার ঐ পরিবারটির ভার তাঁর উপরই বর্ত্তিল। পূর্ব্বে কতকটা থাকিলেও সম্পূর্ণ ছিল না, এই ঘরেরই একটি মেয়েকে তিনি নিজের একমাত্র কৃতবিদ্য পুত্রের সহিত বিবাহিতা করিয়া উহার বিবাহ পণের চিন্তা হইতে নিঃসম্বল বিধবাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। অর্দ্ধাহারে যার শৈশব কাটিয়াছে, যৌবনে আজও সে ব্রহ্মচারিণী বিধবা।—এর পর এ দেশের জমিদার-পুত্র, প্রায় এক বৎসর হইতে যায় কি ভাবিয়া বলা যায় না,—আর দেশে আসেন নাই।

গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিন বৎসর কাটিয়াছে। বিমল যে দিন অমৃতের হস্তে বন্দী হইয়া কলিকাতা যায়, তার পর সাত বৎসর অতীত হইল। এই দীর্ঘকালে কত ভাঙ্গা গড়াই না হইল। মহাকাল চিরকালের মতই সমস্ত বিশ্বজগতের অঙ্গে চলিষ্ণুতার তুলিকা বুলাইয়া চলিয়াছে। ফলে অঙ্কুর মহাবৃক্ষে পরিণত, মহাবৃক্ষ মহাঝড়ে সমূলোৎপাটিত হইতেছে। এই দীর্ঘ দিনে সেই ক্ষুদ্র তারা আজ ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ পূর্ণচন্দ্রে পরিবর্ত্তিতা। কলঙ্কহীন চাঁদের মত তার শুভ্র সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া অভাগিনী মায়ের চিত্ত হর্ষ-বিষাদে নূতন চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। তারাকে পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে। তারার বয়স ষোড়শ পূর্ণ।

সংসার এদিকে অচলপ্রায়। ইন্দ্রাণী যতদিন স্বামীগৃহে যাওয়া আসা

করিয়াছে, তার মাসিক বৃত্তির টাকা অমৃত পাঠাইত। তিন বৎসর হইতে যায়, স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে একটি কপর্দ্দকও সে পায় নাই। একবার বড় টানাটানির সময় ইন্দ্রাণী বাপকে বলে, "আমাদের একটা ভাগ আছে তো,—সেটা কি আর পাওয়া যায় না? বিমল তো এখন সাবালক হয়েছে।"

রামদয়াল বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া জবাব দেন, "সাবালক হলেও সে অমৃতের হাতে। ও যে নালিশ মোকদ্দমা না করলে টাকা দেবে তা' মনে হয় না। বলো তো আমি তাকে একখানা চিঠি লিখে দেখতে পারি।"

ইন্দ্রাণীর সমস্ত চিত্ত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মুহূর্ত্তেই একটা বিরাট ঘৃণার ভরিয়া উঠিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে গভীর বিতৃষ্ণাভরে কহিয়া উঠিল, "কা'কে? অমৃতকে? না, বাবা, না, সে আপনি লিখবেন না।"

রামদয়াল মেয়ের আরক্ত মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সস্নিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তবে কি করবে? একেবারেই কি আদালতে যেতে চাইচো?"

একহাত জিব্ কাটিয়া শিহরিয়া ইন্দ্রাণী কহিল, "বিমুর সঙ্গে বিষয় নিয়ে মামলা! বাবা, আপনি তো জানেন, আমি তাকে তারার চেয়ে কম ভাবি নে'।"

হৃষ্ট হইয়া সেই নিঃস্ব-দাতা এবং কপর্দ্দকশূন্য ধনী ব্যক্তি আস্তে আস্তে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে মেয়ের শ্মশান-সৈকতের মত বৈরাগ্যময় এবং দেবার্চ্চিত গন্ধপুষ্পের মতই নির্ম্মল মুখের দিকে চাহিয়া প্রসন্ন গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন "এই তো চাই মা! এই তো চাই। ক'দিনের এ পৃথিবী? কতটুকু বস্তু টাকা? ধর্ম্মপথে থাকলে অর্দ্ধেক রাত্রেও অন্ন জোটে,—এতে তুমি কোন সন্দেহ করো না। তোমার তারার বিয়ে? আমরা হিন্দু,—আমরা জন্মান্তরের কর্ম্ম মানি, অতীত জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফলে সে যদি এ জন্মে পতি-লাভ ভাগ্য নিয়ে এসে থাকে,—সে তোমার ধন থাকলেও ওকে এসে বিয়ে করবে, না থাকলেও পালাতে পারবে না। আর যদি বিয়ে না-ই-ই হয়, তাতেও বড় বেশী ক্ষতি হবে না মা,—বরঞ্চ তার চেয়ে ঢের বেশী পাপ হবে ওর বিয়ে উপলক্ষে যদি

তোমার মাতৃ ধর্ম্মে আঘাত পড়ে।—" এই সময়ে কার্য্য-ব্যপদেশে আগত তারার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "তারাদিদি!"

"ডাকচেন দাদু?" বলিয়া তারা আসিয়া মাতামহের পিঠ ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল এবং তাঁর কাশকুসুম-বিনিন্দিত মাথাটিতে নিজের চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি সযত্নে প্রবেশ করাইয়া দিয়া পরিচর্য্যা আরম্ভ করিল। রামদয়াল ক্ষণকাল করুণাপূর্ণ স্নেহে তার বালিকাসুলভ সরল মুখখানির প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অর্দ্ধ আশ্বাসে, অর্দ্ধ পরিহাসে, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি বলি কি তারাদিদি! তুই ভাই উমার মত পতিকাম্যতপস্যা কর, একদিন না একদিন 'বৃষরাজকেতন'—বর স্বয়ং এসে ধরা দিয়ে, নিজ মুখে বলতে বাধ্য হবেন। 'অদ্য প্রভৃত্যনবদাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ,—ক্রীতস্তপোভি'—কি বলিস ভাই?"

তারা যথাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া সহাস্যমুখে বিরাগ দেখাইয়া কহিল, "যান, তা' বৈ কি।—"

সে তার মাতামহের কাছে কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' পড়িয়াছে, তথাপি বরের কথায় লজ্জায় রাঙ্গা হইবার বয়স হইলেও স্বভাবে সে বালিকা, কাব্যার্থ গ্রহণ করিলেও কাব্যরসোপলব্ধি করিতে পারে নাই।

ইহার পর রামদয়ালের যত্নে ও ইন্দ্রাণীর চেষ্টায় বারীৎপুরে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। তার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হইল রামদয়াল গুপ্তের বিধবা কন্যা ইন্দ্রাণী। বারীৎপুরের দক্ষিণপাড়ানিবাসী রামদয়ালের জ্ঞাতিভ্রাতা নবদ্বীপচন্দ্র আসিয়া বলিলেন, "ভায়া! তুমিও এই বয়সে ব্রেহ্ম আচার নিয়ে বসলে? আমরা বিদ্যমানে আমাদের ঘরের মেয়ে 'গুরুমা' হয়ে মেয়ে পড়াবে, এতে গুপ্তবংশের মাথাটা মাটিতে ঠেকবে না?"

রামদয়াল অভিযোগের উত্তরে উত্তর দিলেন, "ইন্দু-মা এ কাজ সখ করে নে'ননি, না নিলে অন্ন জোটা কঠিন হ'ত। উনি বরাবরই তো আমাদের

উঠোনে, পাড়ার মেয়েদের নিয়ে দু'এক ঘণ্টা করে একটু পড়াশোনা করানই, পৈতে কাটতে, কাঁথা সেলাই করতেও শিখিয়েছেন। এখন সেটা একটুখানি বিস্তৃত ভাবে করা হচ্ছে, আর যাঁরা সক্ষম, তাঁদের কাছে কিছু মাইনে নেওয়া হবে, এই যা'। জাত ব্যবসা তো মেয়ের দ্বারা হ'বার নয়—বড় কঠিন কিনা।"

নবদ্বীপ বিরুদ্ধে দু'চারটা যুক্তি দেখাইলেন, রামদয়ালের অন্নাভাবের কল্পনাটাকে অবজ্ঞার সহিত উড়াইয়া দিলেন। তার পর এদের কৃতসঙ্কল্প বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া গেলেন। সম্পর্কে বাধিলেও, রাগের মাথায় এই দিঙ্গী বিধবার নামে এমনও দু' একটা কটু বাক্য তাঁর মুখ দিয়া নির্গত হইতে লাগিল যে, যারা ইন্দ্রাণীকে জানে, সকলেই প্রায় প্রতিবাদ করিল। দু' একজন লঘুচিত্ত পুরুষ এবং নারী অবশ্য মুখ বাঁকাইয়া হাসিলেন।

কোন কোন প্রৌঢ়া গ্রামিকা এমনও বলিল, "একে রূপ,—তায় বিদ্যে,—ও মেয়ে যে বিবি সেজে সাহেবের সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যায় নি, সেই ওর বাপের ভাগ্যি!"

কেহ বা জবাব দিল, "সবুরে মেওয়া ফলে দিদি! দু'দিন মুখ বুজে সবুর করেই দেখ না,—যায় না যায়। বলি, রূপ কি আর ওর একলারই আছে? আমাদের দেখলেই কি লোকে থুথু ফেলে? আর বইও যে দু'পাঁচখানা না পড়েছি এমন নয়,—তবে অত আদিখ্যেতা করতে কোন দিনই পারলাম না, একরকমেই চারকালটা কেটে গেল!"

স্কুলে ধনীর চেয়ে দরিদ্রের সংখ্যাই বেশি। কাজেই আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্কটাই বড় হইল। তথাপি যা দশ পনের টাকা পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া পিতার ও মেয়ের সহায়তায় ইন্দ্রাণী এই স্কুলটিকে নিজের আদর্শ মত গড়িয়া তুলিতে ইহার উপর যেন বুকের রক্ত ঢালিতে লাগিল। উত্তম রূপে বাংলা, সামান্য সংস্কৃত ও ইংরাজী পাঠ্য রাখিয়া, সে প্রাণ দিয়া ছাত্রীগুলির নৈতিক চরিত্র গঠন এবং তাদের অবস্থা নির্ব্বিশেষে কার্য্যকরী শিক্ষায় শিক্ষিতা

নতুবা যিনি জাল বুনিতেছেন, তাঁর কাজ যে অসমাপ্ত থাকে।

বিমলেন্দু কলেজ ছাড়িয়াছে। মেস ছাড়িয়া অমৃতের কর্তৃত্বের দায় এড়াইয়া বাহির হইবার জন্য যখন নানা যুক্তির ভাঙ্গাগড়ায় পাক খাওয়াইয়া জট পাকাইয়া তুলিয়াছে, এমন সময় অসমঞ্জ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "এইবার আপনার কাজের সময় এসেছে বিমলবাবু। বিশেষ দরকার,—আপনাকে হাজার তিন টাকা দিন পাঁচেকের মধ্যেই দিতে হবে।"

বিমল সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "বেশ তো"।—কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখ ছাই হইয়া গেল। পাঁচ দিনের মধ্যে হাজার দু'তিন টাকা কি রকমে দেওয়া সম্ভব সে কথা মনে পড়িতে মনের নিভৃতে দুশ্চিন্তার সঙ্ঘাত বাধিয়া উঠিল। অমৃত দাদা এত টাকা আনিয়া তার হাতে দিবে, সে সম্ভাবনা কোথায় ?

অসমঞ্জ অত লক্ষ্য করে নাই,—সে ওই একটি 'বেশ তো'—জবাবেই কৃত-নিশ্চয় হইয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিল, "যা হোক, খুব সময়ে আপনাকে পাওয়া গেছে বিমলবাবু! টাকা আমাদের হাতে মোটে হাজার খানেক মজুদ। অথচ ভয়ানক দরকার। বিষম সমস্যায় পড়েছি,—এমন সময় পল্টার মাথায় চট্ করে এই বুদ্ধিটা খেলে গেল। ওই বল্লে, বিমলবাবু হয় ত টাকা দিতে পারেন। ওঁর শুনছি অনেক টাকা—"

উৎপলা কোন্ সময় ঘরে ঢুকিয়া নির্দ্দিষ্ট চৌকিটায় আসন লইয়াছিল। অসমঞ্জর ভাবের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া কহিয়া উঠিল, "কি যে পাগলের মত করছো! বিমলবাবু টাকা দিতে পারবেন, সে কথা তো তিনি বলেন নি। উনি নাও তো দিতে পারেন।"

অসমঞ্জ বিমলের বিবর্ণ মুখে দ্রুত কটাক্ষ করিয়া তার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বিমলের টাকা দেবার সুবিধা হবে না বুঝি ?"

বিমলের পূর্ব্বেই উৎপলা কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা মজার লোক তো তুমি ছোড়দা! টাকা দেওয়া চলবে না সে তুমি বিমলেন্দু বাবুর মুখের চেহারা

থেকেই দেখ্তে পাচ্চো না? অত টাকা উনি তোমায দিতেইবা যাবেন কেন?"

অসমঞ্জ কি বলিবাব উপক্রম কবিতেছিল, কিন্তু তাহাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়া বিমল অভিমানাহত স্ববে বলিযা উঠিল,—"আপনি আমায় সন্দেহ কবে দুঃখ দেবেন না। সম্ভব হলে আমাব সর্ব্বস্বই আমি সভার হাতে উৎসর্গ কবে দিতুম, কিন্তু অমৃত মামাব কাছ থেকে আদায করবো কি বলে তাই ভাবছি।"

ভাই বোনেব সম্মিলিত কণ্ঠে বিস্ময ধ্বনিত হইল,—"অমৃত মামা! তিনি আবার কে? তাঁব কি দাবী আপনাব টাকাব উপব?"

বিমল কহিল, "আমাব গার্জ্জেন-টিউটাব।"

উৎপলা চট্ কবিয়া বলিযা উঠিল, "আপনি কি এখনও নাবালক আছেন না কি? কি বলচেন?"

তাহার কণ্ঠে যে সুবিপুল কৌতুকের সুব ঝঙ্কৃত হইল, তাহাতে বিমলেন্দুর সাবামুখ সিন্দূর মাখা কবিযা দিল। লজ্জাপীড়িত বক্ষে অবমানিত বেদনা যেন কল্লোলিত হইযা উঠিল। মনে হইল, নাবালকত্বেব চাইতে মানুষের পক্ষে রিভলভাবেব গুলি বুকে মারিযা মবিয়া যাওয়া ভাল।

অসমঞ্জ কহিল, "নাবালক বলচেন! কিন্তু আপনাব কি আজও আঠারো বৎসব বযস হযনি?"

বিমল ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত উত্তব করিল, "গত জুলাই মাসে আমার কুড়ি বৎসব পূর্ণ হযে গেছে।"

উৎপলা আবাব হাসিযা উঠিল, "মোটে,—সাড়ে কুড়ি! আমি তো মনে কবেছিলেম, আপনার বযস চব্বিশ বছর!"

আবাব একবাব অল্প বযসেব বিড়ম্বনায় বিমলেব মনে খোঁচা লাগিল,—তাব রাঙ্গা মুখ আবও লাল হইল।

এদিকে অসমঞ্জ এমন কবিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে,—সেই সহসা উৎসাবিত

হাসির ফোয়ারার সন্ধান না পাইয়া দু'জন শ্রোতাই অবাক্ মুখে চাহিয়া আছে। দেখিয়া অসমঞ্জের খেয়াল হইল,—সে কৌতুক-হাস্য রুদ্ধ করিয়া বলিল, "আপনার অমৃত-মামাটির ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে দেখছি,—ওটিকে পেলে আমাদের পক্ষে মন্দ হয় না।"

বিমল সভয়ে বাধা দিল, "অমন কাজও করবেন না। অমৃত-মামা যদি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারেন, পর দিনই আপনি সদল-বলে আন্দামান যাত্রা করেচেন বলে স্থির জান্‌বেন! অবশ্য এক হিসাবে আমার কিছু উপকার সে করেছে। দেশে দিদিমার আদরে এটুকুও শেখবার সুবিধা হতো না, কিন্তু সে যেমন করেছে,—তেমন আমার বিস্তর টাকাও লুটেছে।"

অসমঞ্জ তেমনি করিয়া হাসিয়াই বলিল, "ফাঁকি তো অনেকেই অনেককে দেয়, বিমলবাবু! কিন্তু আপনার মামাটির ফাঁকির মধ্যে বেশ একটু ওরিজিন্যালিটী আছে,—তার জন্যে আমি কনগ্র্যাচুলেট করচি! আপনার নাবালক দশা দুটি বৎসর পূর্ব্বেই গত হয়েছে। একুশ বৎসরের বিধান সাধারণের জন্যে নয়, সেটা অসাধারণদের প্রাপ্য। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তি স্বীকৃত হয় অষ্টাদশে। এই দুটি বৎসর আপনার 'এক্‌সেস্' লেগেছে।"—এই বলিয়া সে পুনশ্চ সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল।—কিন্তু বিমলের মুখে সে হাসি প্রতিচ্ছায়া বিম্বিত করিল না। তার বুকের মধ্যে তখন দুটি বৎসরের সঞ্চিত ব্যর্থ-বেদনার স্মৃতি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেকার উৎপলা-দত্ত পরাভবের লজ্জা—জ্বালা, এই দীর্ঘ দিনের প্রভাবিত থাকার অবমাননা—এক সঙ্গে ধূমায়িত হইয়া উর্দ্ধ শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যে অদম্য আত্মাভিমান ও প্রচণ্ড অহঙ্কার একটা হিংস্র দৈত্যের মত তার জন্মশোণিতের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে, সেইটে আবার শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছিল।

সেদিন সকাল সকাল উৎপলাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা বন্ধ করিয়া উৎপলা অসমঞ্জের কাছে আসিয়া বলিল, "জানলে ছোড়দা, অমৃত-মামার দফা এবার রফা হলো!"

অসমঞ্জ কি ভাবিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমিও ওই কথাই ভাবছি। শেষে একটা বেশি কিছু না করে বসে। বিমল ছোক্‌রাটার মধ্যে শক্তি আছে, ধৈর্য্য নেই।"

উৎপলা তার স্বভাব-সিদ্ধ খপ্‌ করিয়া বলিয়া দিল, "ঠিক ঐ জন্যেই আমি ওকে যা' এতটুকু শ্রদ্ধা করি।"

অসমঞ্জ তখনও ভাবিতেছিল। চিন্তা-গম্ভীর মুখে সে পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু পলা! গোঁয়ারতুমি করে অনেকেই অকালে নষ্ট হয়ে গেছে সে ত জানো,—তাই ভয় হয় আমাদেরও না শেষটায়—"

দীপ্ত চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক্ হানিয়া কঠোর কণ্ঠে উৎপলা বলিয়া উঠিল, "ছোড়্‌দা! ভয়ই যদি করবে,—তবে এ পথে কেন? যখন সঙ্কটে পা দিয়েছ, তখন ভয় ভাবনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে চোখ বুজে চলতেই হবে।—একবার এগিয়ে দুবার পেছুতে গেলে কোন দিনই আমাদের গম্যস্থানে গমন করা ঘটবে না।"

অসমঞ্জ মনের মধ্যে তৃপ্ত হইতে না পারিলেও চুপ করিয়া রহিল। নামে সে তাদের সভাপতি হইলেও কার্য্যতঃ উৎপলাই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রণী! তার মতামতও সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। অন্যে যদি ধরিবার পক্ষপাতী হয়, সে বাঁধিবার। এই একান্ত উত্তেজিতস্বভাবা নারীর নিকট দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাওয়া কাপুরুষতা বোধে নিজ নিজ মতের বিরুদ্ধেও অনেক সময় অনেককেই উহার সহিত সমমতাবলম্বী বলিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে। নারী হস্তে পরাভব ঘটা তো আর পৌরুষ নয়, অসমঞ্জরও এ দুর্ব্বলতা আছে।

তারও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা চাই! কোথা হইতে একদিন সহসা-উদিত নৈদাঘ ঝটিকার মত সবেগে তার জীবনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে তাহাকে তাহার সমস্ত পরিচিত সমস্ত পুরাতন হইতে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া, এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা রাজ্যের নব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিল! ইহাতে তার পক্ষে মন্দ না হইয়া ভালই হয় ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু প্রথম দিকের সেই দুঃসহ বিরহ বেদনা, সে দুর্ব্বহ অধীনতার নাগপাশ,—উঃ! সেও যে এক চির-অবিস্মৃত দুঃস্বপ্নেরই মত তার মর্ম্মের মধ্যে গাঁথা আছে। কিজন্য একমাত্র এই অর্দ্ধ-পরিচিত আত্মীয়ের অনুগ্রহজীবী হইয়া তার জীবনের সুদীর্ঘতম বৎসরগুলা কাটাইতে হইল? না তাহাকে নিজের অধীনে রাখিয়া, তার অর্থ লুণ্ঠন করাই যে অমৃতের একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? সেই লুণ্ঠিত ধনের পরিমাণ কতটা, সে সম্বন্ধে বিমলের কোনই আন্দাজ নাই! তবে একদিন অমৃতের অসাবধানতায় বাহিরে রাখা তার ব্যাঙ্কের খাতা বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে দেখিতে পায়, তাহাতে বৎসর-পাঁচের মধ্যে হাজার পনের টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। একখানা বাড়ী কেনার গুজবও তার কানে ঢুকিয়াছিল, সেও আজ মনে পড়িল।—যাক টাকা,—কিন্তু জুয়াচুরি! ওই ঘৃণিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তার সমুদয় স্বাধীন সত্তাকে সুদ্ধ অস্বীকার করিয়া সে তাহাকে দুই দুইটা বৎসর নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে দাবিয়া রাখিল,—ইহারই লজ্জা ঘৃণা সে যেন সহিতে পারিতেছিল না।

এই সঙ্গে আর দুজনের মুখ মনোদর্পণে বড় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। একজন তার বন্ধু, তার পরমপ্রেমাস্পদ, তার গুরু, তার বান্ধবহীন, উদ্দেশ্যবিহীন, জীবন-তরণীর কর্ণধার অসমঞ্জ। আর একজন,—সে কি উৎপলা? বিমলেন্দু সবিস্ময়ে অনুভব করিল, এই অদ্ভুত-স্বভাব নারী তার দীপ্ত তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি, নির্ম্মম পরিহাসপ্রিয়তা,—এ সব সত্ত্বেও তার জীবন-খাতার শূন্য পাতার অনেক খানিই যেন ভরাইয়া ফেলিতেছে! ইহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি

যেন ডাক্তারের ছুরীর মত হাড় কাটিয়া ভিতরে ঢোকে, ইহার মর্ম্মভেদী বাক্য-বাণে ক্ষতের মুখে শোণিতক্ষরণ করে, কিন্তু এ' কি রহস্ত ? সেই রহস্তময়ীর রহস্তাঘাতে জর্জ্জরিত চিত্ত—সেই হাতেরই মৃত্যু-শেলের মুখে বুক পাতিয়া দিয়া মরণ-খেলা খেলিতে চায় ! পতঙ্গ যেমন আগুন ঘিরিয়া মরণ-কান্না কাঁদে,—ব্যাকুল হইয়া মৃত্যুরূপিণীর আলিঙ্গন কামনায় বনান্ত হইতে ছুটিয়া আসে,—এও ঠিক তেমনি কি ? কিন্তু সে যদি হয়, তবে সংসারে এত মেয়ে থাকিতে এই যোদ্ধবেশিনী ভৈরবী কেন ? না,—বিমল তো সেদিক দিয়া ভাবে নাই,—সে শুধু জানে ওই চণ্ডীরূপিণী মেয়েকে সে তার অপরাজেয় চিত্ত দিয়া ভয় করে ; অথচ তার প্রভাবকে সে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিতে পাবে না !

বিমল বাসায় পৌছিয়া দেখিল, অমৃত নাই। খবর পাইল বায়স্কোপে গিয়াছে। সেও বায়স্কোপে গেল। যখন অসমঞ্জর সহিত আলাপ হয় নাই, বায়স্কোপ দেখার কি ঝোঁকই না তার ছিল !

পথ অনেকখানি নির্জ্জন। দুসারি আলোর মালা গাঁথা পড়িয়া আছে। ট্রাম বন্ধ হওয়াতে পথিক একটু ইচ্ছাসুখে পথ চলিতেছিল। পাশাপাশি চলিতে চলিতে বিমল ডাকিল, "অমৃত মামা !"

"কি রে ?"

বিমল একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে এতবড় জোচ্চুরি করলে কেন ?"

অমৃত যেন ঘাড়ের উপর সজোরে লাঠি খাইয়াছে এমনি করিয়া চমকাইয়া উঠিল, অচল হইয়া গিযা বলিয়া উঠিল,—"জোচ্চুরি !—তোর সঙ্গে ?—আমি ?"

বিমলও দাঁড়াইল। দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ,—জোচ্চুরি ছাড়া কি তুমি বল্‌তে পার,—এই দুটো বৎসর ধরে যা' তুমি করে এসেচো ?"—তার কণ্ঠে অকথ্য ঘৃণা ব্যক্ত হইল।

অমৃত তখনই আত্মসম্বরণ করিয়া লইল। সে জোর করিয়া খানিকটা হাসিয়া লইয়া অত্যন্ত লঘু ভাবেই জবাব দিল ;—"ওঃ, সেই কথাটা তুমি জানতে পেরেছ ? সে তুমি এতদিন জান্‌তে পার নি বাবা! সেই ত তোমার বোকামি!—বলবে,—আমি নিজে থেকে তোমায় কেন বলি নি ? হঠাৎ সম্পত্তি হাতে পেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেবে হয়ত কি কর্‌বে সেই ভয়ে বলিনি। —এ ছাড়া আমার স্বার্থ কি! আমি তো দুবৎসর হ'তে তোমার নামেই চালিয়ে আসছি। প্রত্যেক চেকের উপর তোমার সই নিয়েছি। সে কথা তুমিও জানো।"

বিমল একটুক্ষণ স্তম্ভ হইয়া থাকিল। তার পর মাতুলের মুখের দিকে সোজা চাহিয়া অকুন্ঠিত স্বরে কহিল, "কাল থেকেই আমরা যেন স্বতন্ত্র হয়ে যাই।"

এই বলিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া সে নিজেদের বাসার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। অমৃত বজ্র-স্তম্ভিত থাকিয়া যখন অকস্মাৎ সমুদিত প্রবল ক্রোধোচ্ছ্বাসে সর্ব্বশরীরে কম্পিত হইয়া কিছু বলিবার জন্য মুখ তুলিল, তখন আর পথের উপর বিমলকে দেখা গেল না।

সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া ভোর বেলা বিমলের ঘরে আসিয়া অমৃত ডাকিল, "বিমল!"

বিমল হয় ত জাগিয়া ছিল। কিন্তু সদ্য ঘুম-ভাঙ্গার ভঙ্গী করিয়া মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "উঁ ?"

"সত্যি সত্যিই কি তা'হলে আমার এই সাতটা বৎসরের প্রাণান্ত শ্রম ও যত্নের এই গুরু-দক্ষিণা নিয়ে আজকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে ? সত্যিই কি এই তোমার ইচ্ছা ? এই কথাই কি যথার্থ তোমার মুখ থেকে গত রাত্রে আমায় শুন্‌তে হয়েছিল ? না, যেমন তুমি রাগের মুখে অনেক কথাই বলে থাকো,—এ'ও তাই ?"

বিমলেন্দু পাশ ফিরিয়া সামনের দিকে মুখ ফিরাইল।—"এ কথা যে রাগের মাথায়ও বলতে পারে, তার অন্ন তোমার গলা দিয়ে আবারও নামবে? যার চোখে তুমি ঘোর স্বার্থপর, অত্যাচারী, জুয়াচোর, পরস্বাপহরণকারী মাত্র,—গচ্ছিত ধনের অপহর্ত্তা,—তার সঙ্গে এক ছাতের নীচে মাথা রাখতে—"

"বিমল! বিমল! আমি কি তোমার জন্যে কোন কিছুই করি নি?—এই কথা তুমি বলতে চাও?"

"আমার জন্যে, না স্বার্থের জন্যে?"

"বেশ তাই! তোমার সব তুমি বুঝে নাও।—এই দেখ, তোমার বাপের উইল। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তোমার সৎমার। তাঁকে তাঁর ভাগ আমি বুঝিয়ে দেব,—তোমার ভাগ তুমি নাও।"

বিমল উঠিয়া বসিল। উইল লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই অমৃত ত্রস্তে হাত সরাইয়া লইল। নিদারুণ কোপে ও অপমানে তখন তার মাথার রক্তে বাড়বাগ্নি জ্বলিতেছে। যেটুকু পারে এই অপমানের জ্বালা প্রত্যর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "বাঃ। এ আমি তোমার হাতে দিই, আর তুমি ছিঁড়ে ফেলে দাও—সে হচ্চে না! তোমার বাপের উইলের কথা তুমি পূর্ব্বেও শুনেছ।—এই দেখ তাঁর সই,—সে'ও তোমায় আমি চিনিয়ে রেখেছি,—দরকার হয় আদালতে এ উইল বার করা হবে। এখন এই নাও,—তোমার দলিলের বাক্সর চাবি,—তোমার চেক বই, বাড়ীর পাট্টা, সবই তা'তে আছে। তোমার সৎমার অংশের যা কিছু সে সব আমি নিয়ে যাচ্চি,—তাঁকেই দোব। আমি চল্লুম। যাবার সময় একটা উপদেশ দিয়ে যাই,—যে এনার্কিষ্টের দলে ঢুকেছ,—পারো তো তাদের সঙ্গ তুমি ছেড়ে দিও,—পারো তো হুঁসিয়ার থেকো। সেখানে থাকলে একদিন না একদিন পুলিশের হাতে না পড়ে তোমার গতি হবে না,—এটা আমার ভবিষ্যদ্বাণী, একথা মনে রেখো।"

বিমল তড়িৎ বেগে উঠিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া ঘরের দরজা আটকাইয়া

ধবিল। কম্পিত ওষ্ঠাধর তার কোন মতে উচ্চারণ করিল, "আমার সমস্ত হিসেব ?—"

বিমলেব হাত জোব কবিয়া ঠেলিয়া সবাইয়া দিয়া, বাহিবে আসিয়া ঘৃণাপূর্ণ উচ্চ হাস্যে অমৃত সেকথাব জবাব দিল,—"হিসাব করবাব জন্যে তোমাব তবফ থেকে আমায কেরাণী বাহাল কবা হয় নি।—যদি সাহস করে আদালতে দাঁড়াতে পারো, হয ত সেখানে হিসেব নিকেশেব চুক্তি হতে পারবে! কিন্তু তোমাব বন্ধুদেব ইতিহাস যদি সেখানে বার হযে যায,—হিসাব-নিকাশে হাব জিত যারই হোক, হিসাবেব কড়ি যে পোর্টব্লেযাবে বসে গুণ্‌তে হবে, সেই হিসেবটা শুধু আপাততঃ কবে বেখো।"—এই বলিয়া হেঁট হইয়া দরজার পাশ হইতে একটা বড হাতব্যাগ তুলিয়া লইযা আব কিছু না বলিযাই অমৃত দ্রুতপদে সিঁড়ি দিযা নামিযা চলিযা গেল। জিনিষ পত্র বোধ কবি পূর্ব্বেই চালান দিযাছিল।

বিমল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইযা বহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন হইতেই যে এ পবিবাবেব কযটি প্রাণী উন্মুখ আগ্রহে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা তাঁদেব সচকিত ভাবে পথ চাওয়া একটু-খানি শব্দ শোনা গেলে উৎকর্ণ হইয়া ওঠা,—এই সব লক্ষণেই ব্যক্ত হইতেছিল, অথচ মুখে মুখে কোন আলোচনা হয় নাই।

মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাণী তারাকে ডাকিয়া বলিল, "আজ আমি একবার ইস্কুলে

যাচ্ছি, তুই বাবার ওষুধ, বেদানার রস, সব ঠিক ঠিক দিয়ে যাস। আর যদি—যদি কেউ আসে, তখনই খবর পাঠাস্।"

কে' আসিবে,—কার আসার আশা করা হইতেছে,—সে কথা বলা এবং শোনা ব্যতীতই উভয়ের বুঝিবার কোন ভুল হইল না! যেহেতু দুজনেই একই ব্যক্তির আগমন প্রত্যাশা করিতেছে।

নীচে জুতাপায়ের চলন জানা যাইতেই তারা যেমন ছিল তেম্‌নি আলুথালু কেশবেশে ছুটিতে ছুটিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া সাম্‌নে যাকে দেখিতে পাইল, তাহারই উদ্দেশ্যে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—"দাদা! দাদা তুমি এলে?"—কিন্তু অর্দ্ধমুহূর্ত্তের মধ্যেই তার সমস্ত উৎসাহের স্রোত যেন শৈবাল-প্রতিহত হইয়া অচল রহিল। ঠোঁটের কোণে যে মন্দ হাস্য নিজেদের আসন্ন বিপদের ভীতিচ্ছায়ায় সদাই ম্লান ও মূর্চ্ছিত থাকে, সেও অকস্মাৎ নিজের যে বৈদ্যুতিক শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল,—চকিতেই উহা আবার আত্ম-গোপন করিল। সন্ধ্যাতারার মত উৎসাহদীপ্তনেত্রে ত্রস্ত-বিস্ময় ঘন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। দুই পা পিছাইয়া সে গায়ে কাপড় টানিয়া দিল।

আগন্তুকের অবস্থাও খুববেশী প্রকৃতিস্থ নয়। বিস্ময়ের একটা নির্ব্বাক্ তরঙ্গ তাহারও উপর দিয়া বহিয়া গিয়া তাহাকেও যেন বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে। অলৌকিক রূপে ভরা, পরিপূর্ণ যৌবনের তেজে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল, বিধাতার সৃজন-কলার মধ্যে আশ্চর্য্যতর, নবীনতর সৃষ্টি এই মোহিনী-মূর্ত্তি যেন তার কল্পনাকেও পরাস্ত করিয়াছে,—এম্‌নি একটা কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হতবুদ্ধি ভাব তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিল এবং সে শুধু অবাক্ মুখে তাহার পানেই চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রাণীকে দেখিয়াও অমৃতের মনে হইল, সে যেন আর এক নূতন সৃষ্টি দেখিল! শুভ্র-বসনা, নিরাভরণা পরিণত-বয়স্কা বিধবা মূর্ত্তি যে এত সুন্দর হইতে পারে,—এ যেন ধারণা করিতেও পারা যায় না। কাশাংশুকা শরৎ-শোভা স্মরণে আসিল। শ্বেত পদ্মাসনাকেও মনে পড়িল। ইন্দ্রাণী আসিয়াই

ব্যগ্রস্বরে কহিয়া উঠিল, "অমৃতদা! বিমল?"

ততক্ষণে অমৃত নিজের বিস্ময়াবেগ সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল। সে তারাব দেওয়া চৌকিখানায বসিয়া হাতপাখায় হাওযা খাইতেছিল। চৌকি ছাড়িয়া উঠিযা হাত তুলিযা ইন্দ্রাণীকে নমস্কাব কবিল। পরে তাহার কথার উত্তর দিল, "তার কি আস্‌বাব কথা ছিল? শুনিনি তো। পিসেমশাইএর অসুখ শুনে ওঁকে একবাব দেখতে এলুম।—কেমন আছেন তিনি?"

অসহিষ্ণু ভাবে ইন্দ্রাণী জবাব দিল, "একই রকম। কিন্তু বিমলকে দেখবার জন্যে বড্ডই যে ব্যস্ত হযেছেন। কেন তাকে সঙ্গে করে আন্‌লেন না? আবাব ফিরিযে নিয়েই যেতেন।"

এ খোঁচাটা অমৃতকে বিঁধিল, কিন্তু সে তাহা আমলে না আনিয়াই বলিল, —"দিদি! তুমি ভুল করচো। বিমল দুবৎসব পূর্ব্বে সাবালক হয়ে গেছে, তার উপর আমার আর কিসের অধিকার? সে কি আমায় তোমার চাইতে একটুও বেশি মানে?—সে প্রকৃতিই তার নয়,—সে কারু নয। তোমাদের নয়,— আমার পিসিমার নয়,—আমার নয,—সে স্বাধীন স্বতন্ত্র। মিথ্যে তার পথ চেয়ে আছ,—সে আসবে না।"

অমৃতের এই হঠাৎ আসা ইন্দ্রাণীর ভাল লাগে নাই। যার জন্য সে জীবনে একবারমাত্র নিজেকে অবমানিত বোধ করিযাছে, যে তার সংসারের সর্ব-প্রধান কর্ত্তব্য হইতে তাহাকে জোর করিয়া অপসৃত করিয়াছে, তার স্বামীর সন্তানকে যে তাদের নিকট হইতে নিষ্ঠুরতার সহিত ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়া তাহাকে—তার শোকাতুরা অসহায়া দিদিমার সহিতও কোন সম্বন্ধ রাখিতে দেয় নাই,—আজ তাদের এই আসন্ন বিপদের মাঝখানে সে ব্যক্তি তার কোন্ কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া দেখা দিল? না জানি কি উপদ্রবই বা সে ঘটায়! ঐই সন্দেহে মনে তার বিরক্তির একটা ঘন মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল, এই সব হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় সে সংশয় বাড়িল ভিন্ন কমিল না। এ আলোচনা বন্ধ করিয়া

দীপা কহিয়া উঠিল, "আপনাব খাওয়া হয় ত হয় নি ?—ভাত দুটি চড়িয়ে দিই গে'। আপনি ততক্ষণ মুখ হাত ধুয়ে নিন।"

ইন্দ্রাণীব মনেব ভাব অমৃতের অবিদিত ছিল না। সে ঈষৎ হাসিযা বাধা দিল, বলিল,—"থাক্, —ভাত চডাতে হবে না। দুটি ভাত মুখে দিতে আমি এত দূব ছুটে আসি নি। তোমাব সঙ্গে আমাব কথা আছে। তুমি যদি একটু মন দিযে শোন, তা' হলে সেগুলো চুকিযে ফেলে চলে যাই।"

ইন্দ্রাণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতে থাকিলেও বাহিবে সংযত ভাব বজায বাখিযা স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে কহিল, "বলুন।"

অমৃত নিজের হাত ব্যাগ খুলিযা একখানা কাগজ বাহিব কবিল,—"এ' কাব লেখা,—আব কি জিনিষ চিনতে পাবচো ?"

ইন্দ্রাণীব বক্ষভেদ কবিয়া ধীবে ধীবে একটা দীর্ঘশ্বাস বহিয়া গেল,—এ লেখা তাহার আর চেনা নয় ? কথায় উত্তব না দিযা সে শুধু মাথা হেলাইযা জানাইল,—চেনে।

অমৃত বলিতে লাগিল, "এই তোমাব স্বামীব উইল। এটা আদালতে বাব করলেই তোমাব অংশেব অর্দ্ধেক সম্পত্তি তুমি ফেবৎ পাবে। তোমার পক্ষ থেকে একটা দবখাস্ত দেওযা দবকার। তাব পর যা' করতে হবে,—আমিই কববো।"

ইন্দ্রাণীর মুখটা একবার একটুখানি চক্‌চকে দেখাইল। ইহার এই আকস্মিকোদিত ধর্ম্মবুদ্ধিব হেতু কি, না বুঝিলেও প্রস্তাবটা তার কর্ণে এই অভাবগ্রস্ত দুর্দ্দিনের পক্ষে দৈববাণীব মতই মধুব ঠেকিল। সাগ্রহে ও সানন্দে সে বলিযা উঠিল, "তা' যদি হয, এখনি আমি দরখাস্ত লিখে দিচ্চি। বাবার এই অসুখে আমি তাঁর ভাল করে চিকিৎসা পথ্য দিতে পারচি না,—" আরও কিছু বলিতে গিযাই সে নিজের আকস্মিক হৃদযোচ্ছ্বাস সংহত করিয়া লইল।

অমৃত তার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া কহিল,

"টাকার যদি দরকার থাকে, এখনি তুমি নাও না,—নিজের টাকা পেলে ও থেকে শোধ দিও।"

ইন্দ্রাণীর জিব ঠেলিয়া বাহির হইতে গেল, "আমার বড্ড দরকার, আমি নেব।"—কিন্তু ঠোঁট সে কিছুতেই খুলিতে পারিল না। ঋণ গ্রহণ করিতে যে তার মাথা কাটা যায়,—বিশেষ করিয়া ইহারই নিকটে,—যার জন্য আজ অবস্থাপন্নের স্ত্রী হইয়াও তাহাকে সৎকর্ম্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থে উদর পোষণ করিতে হইতেছে! সূতা কাটা, সূচি-শিল্প প্রস্তুত, মাসিকপত্রে প্রবন্ধ-গল্প লেখা,—এমনি কত উপায়েই নিজেকে ও বালিকা কন্যাকে অর্দ্ধরাত্রি সারাদিন খাটিতে ও খাটাইতে হয়। সব সময় পেটের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় মুমূর্ষু পিতার সমুচিত সেবাই হয় ত বা ঘটিয়া উঠে না। সব চাইতে সেই ব্যথাই যে ইন্দ্রাণীর বুকে বজ্রবলে বাজিতে থাকে। তথাপি এই দুর্দ্দশার দিনে সাহায্য সম্ভাবনায় সেই ইহাকেই সে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইল।

অমৃত ব্যাগের মধ্য হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া সেগুলা ইন্দ্রাণীকে দেখাইয়া বলিল, "এতে পাঁচশো টাকা আছে। অত কি হবে? তা'লাগবে বৈ কি! তোমার বিষয়টা মীমাংসা হতেও তো সময় লাগবে কিছু। বিমল যে এটা সহজে ছাড়বে, তা মনেও করো না। রীতিমত মকদ্দমা চালিয়ে আমাদের এই উইলকে প্রমাণ করে বিষয় দখল করতে হবে, সে তো দু'দিনের কর্ম্ম নয়।"

ইন্দ্রাণী নোটগুলা হাতে করিয়া অবাক্ হইয়া অমৃতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি শুনিল, যেন বুঝিতেই পারিল না।

অমৃত তার এই হতবুদ্ধি ভাবের অর্থ বুঝিল। বুঝিয়া মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রকাশ্যে একটুখানি জোরের সঙ্গে বলিল, "তুমি বোধ করি এখনও সবটা বেশ তলিয়ে বোঝ নি? কথাটা হচ্ছে এই যে, বিমল এখন সাবালক হয়েছে, আর সেটা সে খুব ভাল করেই বুঝে ফেলেছে। আমায় কুকুর শেয়ালের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে আজ থেকে সে স্বয়ম্প্রভু! এইবেলা নিজের অংশ যদি না

ধন্ন করে নাও আর কখন জন্মেও তা' পাবে না। এখনি পাওয়া কঠিন! তবে এখনও সে আমার কতকটা হাতে আছে, দরকারী দলিলপত্র সব আমারই কাছে। উইলও আমার হাতে। কমিশনে তোমার বাপেরও সাক্ষ্য নেওয়া হবে। তা'ছাড়া, আরও একটা কথা আছে;—তাদের দলের ক্ষতি হ'বার ভয়ে হয় ত সে মকদ্দমা নাও চালাতে পারে। সে এখন ঘোর এনার্কীষ্ট!" অমৃতের চক্ষু দুইটা ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল;—যেন দুইটা গাড়ীর বাতি জ্বলিতেছে!

ইন্দ্রাণীর হাঁটু দুইটা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।—হাত হইতে নোটের গোছাটা তার অজ্ঞাতসারেই মাটিতে পড়িয়া গেল। মুখ দিয়া তাহার বাহির হইল, "বিমল—এনার্কীষ্ট। না,—না, তা' নয়! এ আপনি রাগ করে বলচেন!"

অমৃতের সাদা মুখ টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত সহানুভূতি প্রকাশের ভাবে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কেন, ছেলেটি কি তোমার বড্ডই নিরীহ প্রকৃতির, যে, একেবারেই এটা বিশ্বাস করতে পারা যায় না? তা' বেশ, আমিই না হয় রাগ করে বল্‌চি। অবশ্য রাগ কর্ব্বার আমার তার ওপর যথেষ্ট কারণ যে আছে, তা' আমিও অস্বীকার করচিনে,—তবে এটা শুধু আমার ক্রোধ-কল্পনা নয়! আজ না হয় অবিশ্বাস করলে; একদিন হয় ত তার আন্দামানে যাবার সময়কার বেড়ির বাজনা তোমারও কানকে বাঁচাতে পারবে না,—এ আমি এই জোর গলায় তোমার মুখের উপরেই বলে রাখলুম! আমি যতই যা' হই, মিথ্যাবাদী নই,—এটা বিশ্বাস করো।"

ইন্দ্রাণীর মুখের সমস্ত রক্ত তার মুখখানাকে মরা মুখের মত সাদা করিয়া দিয়া কোথায় যেন উবিয়া গেল। ক্ষণকাল সে একটি কথাও কহিতে পারিল না। তার পর অনেক কষ্টে আপনাকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া সমুদয় আত্ম-গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া যোড়হাতে বলিল,—"অমৃতদা! আপনিই তাকে এই সঙ্কটের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গেছেন,—আমাদের কাছে থাকলে সে আর যাই হোক

এনার্কীষ্টের সঙ্গে মিশতো না। কিন্তু যা' হয়ে গেছে, উপায় নেই,—এখনও তাকে ফেরান,—আপনি ইচ্ছা করলে তা' পারবেন।—চেষ্টা করুন।—আমার স্বামীর জলগণ্ডুষ বন্ধ করবেন না।"

অমৃতের মন আশার পুলকে নর্ত্তিত হইতে লাগিল, কিন্তু দর বাড়ানর হিসাবে সে একটু চিন্তিত ভাবেই জবাব দিল,—"আমি তাকে কি করে ফেবাবো? বল্লাম না, সে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তাব উপর দেখ,—তোমাব এই উইলের মকদ্দমা উঠ্‌লেই ত ওসব কথাও বার হয়ে পড়বার সম্ভাবনা। একটা—"

অধীব ও বিরক্ত হইয়া ইন্দ্রাণী কহিয়া উঠিল, "আপনি কি মনে করেছেন আমি দুটো টাকার জন্যে আমার বিমুর সঙ্গে মকদ্দমা লড়বো? এ কথা আপনি ভাবলেন কি করে?"

অমৃত কহিল, "এ ভিন্ন এক পয়সাও তো সে তোমাকে দেবে না। কি তাব কাছ থেকে তুমি পেয়েছ, যার জন্যে নিজেব পেটের সন্তানকে বঞ্চিত করবে?"

ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে কৃপাপূর্ণ ঈষৎ হাস্য ঝিক্‌মিক্ করিযা জলিয়া উঠিল, কহিল, "অমৃতদা! বেটাছেলে বলেই এ কথা আপনি মনে করতে পারলেন! সন্তানকে পেটে না ধরলেই যে তার পরে স্নেহ কম হয়, তা' নয়। পেটে জন্মেছিল বলেই কি তারা আমার বিমুর চেয়ে বেশী? তা' ছাড়া বিমল বেঁচে থাকলে, ভাল থাকলে মানুষ হলে আমার স্বামীব নাম থাকবে। তারার বাবা তো তা' হবে না। সে হিসেবে যে বিমল তারার থেকে ঢের বড়। সংসারে সব জিনিষেরই দর তার উপকারিতা হিসেবে।"

অমৃত চুপ করিয়া রহিল। যেটা সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে কিছু যেন গলদ বাহির হইতেছে। তাহাকে নীরব দেখিয়া ইন্দ্রাণী ভয় পাইল। ব্যগ্র হইয়া কি বলিতে যাইতেছে, এমন সময় "মা"!—বলিয়া ডাকিয়া তারা দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"দাদুর খাবার সময় হয়েছে মা! তাঁকে কি আমিই খাইয়ে দেবো না তুমি যাবে?"—এই বলিয়া, অমৃতকে তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সে তখনি অন্তরালে সরিয়া গেল। মার কাছেও উত্তর পাইল,—"তুমিই যাও।"

একখানা আধছেঁড়া নীলাম্বরী পরা, সর্ব্বাঙ্গ ভেদিয়া যেন অফুরন্ত রূপের নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে! অমৃতের বুকের বাঁধনে গ্রন্থি পড়িল। কিছুক্ষণ গভীর অন্যমনস্কতায় চিত্ত তার তলাইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ চট্‌কা-ভাঙ্গা হইয়া শুনিতে পাইল, ইন্দ্রাণী বলিতেছে, "ও তুচ্ছ টাকাকড়ির কথা থাকগে', বিমল যাতে সত্যিকার কোন বিপদে না পড়ে সে আপনাকে ক'রতেই হবে। সেও তো আপনারই হাতে গড়া,—সে আপনারও।—তার অপরাধ ক্ষমা করে, তার সঙ্গে শত্রুতা ত্যাগ করুন। দেখুন, জগতে প্রতিশোধই কি সব?"

অমৃত একটা নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিল। তাঁর পর বলিল, "তা' হলে স্পষ্ট করে সব কথা কওয়াই ভাল! বিমলের ব্যবহারে নিজেকে আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি,—আমি তার জন্যে কি করিনি বলতে পারো? সে যে আজ দশের মধ্যে দাঁড়াতে পারছে, সে কার জন্যে? তোমার এত বিদ্যা বুদ্ধি ভালবাসা নিয়েও তো তুমি আমার পিসির দাপটে জুজু হয়েই বসেছিলে,—কিছুই তো করতে পেরে ওঠোনি। তার সাবালকত্ব গোপন রেখে কি ক্ষতিটা তার হয়েছিল? আমার অধীন জেনে নিজেকে অনেক সংযতই তো রাখতে হতো তাকে? তার জন্যে সে আমার যা' করেচে, আমিও তার শোধ না নিয়ে তাকে ছেড়ে দেব না। প্রথমতঃ—তোমার অর্দ্ধেক বিষয় তোমায় দেওয়াব।—দ্বিতীয়তঃ—পুলিশে চাকরী নে'ওয়া স্থির করে ফেলেছি। তা' আমাকেও তো একটা কিছু করে খেতে হবে।"

"অমৃতদা! এ—কি আপনি বল্‌চেন? ও যে আপনার ভাগ্‌নে,—আপনার ছাত্র,—আজ সাত বৎসর সবাইকে ছেড়ে শুধু আপনার উপরই যে ও সমস্ত

নির্ভর করে থেকেছে।"

"হ্যাঁ,—কিন্তু সেই সাত বৎসব আমার তো ও ভিন্ন আব কেউ ছিল না! স্ত্রী-পুত্র-সংসার—সব আশায জলাঞ্জলি দিযে ওই দুর্দ্দান্ত ছেলে বশে রেখে তাবে পাঠশালা থেকে কলেজে তুলে দিযেছি, সেটাও ভেবে দেখ। পারতে তুমি?"

ইন্দ্রাণীব গর্ভীব ভারাক্রান্ত বক্ষ গুরু নিঃশ্বাসেব ভারে ফুলিযা উঠিল অমৃতের বাক্যে তাব প্রতি দীর্ঘকালের অবিচাব যেন তাহাব নিকট নিজেবে অপবাধী কবিযা তুলিল। সে অত্যন্ত অনু৺প্ত কণ্ঠে কহিল, "তা' সতি অমৃতদাদা! বিমল আপনাব হাতে না পড়লে কখনই মানুষ হতে পাবতো না। আপনি তাব ঢেব কবেছেন-বই কি! নির্ব্বোধ ছেলে সে,—আমার মুখ চেয়ে তাকে ক্ষমা করুন এবাবেব মত।"

"তুমিই ব। আমায কি দিয়েছ! দিদি বলে তোমায় বড্ড ভক্তি করেছিলু তাই তুমি আমাব নামে অতি হেয কথা পিসিমাব কাছে বলে আমার মনবে কি তে'তোই না কবে দিযেছিলে! আমার পাওনা তোমাদের কাছ থেকে ভা কবেই তো আগাগোডা শোধ হচ্চে কি না।"

"আমি বলেছিলুম—তাঁব কাছে? না তিনি নিজেই আপনাকে নিযে অকথ্য কুৎসা আমাবই নামে—" বলিযাই ইন্দ্রাণী অকস্মাৎ চুপ করিয়া গেল। এ আলোচনার ইচ্ছা তাব ছিল না। কিন্তু অমৃতেব কিছু বুঝিতেও বাকি থাকিল না। এইটুকু জানিতে পারিযাই কৃতকর্ম্মেব অনুশোচনা একদিবে এবং আরব্ধ কর্ম্মের সফলতার আশা আর একদিকে তাব চিত্তে জাগিয়া উঠিয় তাহাকে অত্যন্ত প্রসন্ন কবিযা তুলিল। সে বলিল, "সে সব যে আমা পিসিমার কীর্ত্তি এ সন্দেহ হলে এত বড ভুল আমায কবতে হতো না! মনে বড্ড দুঃখ পেয়েই আমি তোমাব সঙ্গে কুব্যবহাব করেছিলাম। ভেবেছিলাম ভক্তি যদি নিলে না, তবে অভক্তিই নাও,—সেই যদি তোমার কাম্য হয়,—কিন্তু তার জন্যে মনে যে কষ্ট পেযেছি,—এই যে একটা বাউড়ের মত রয়েছি এ

থেও কি তুমি বুঝতে পারচো না ? স্থবিধে পেয়েও সংসারী হতে পারি নি,—স্থখী হই নি।"

ইন্দ্রাণীর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল ; সে আঁচল তুলিয়া মুছিয়া ফেলিল।

অমৃত কহিল, "একটা যদি কাজ করো, সমস্ত গোল চুকে যায় ! বিনা মামলায় তোমার বিষয়ও উদ্ধার হয়, আর বিমলকেও আমি ক্ষমা করতে পারি তার যতটুকু ভাল করা সম্ভব, তা'ও না হয় করবো,—এ কথাও দিচ্ছি করছি।"

সাগ্রহে ইন্দ্রাণী তার জলভরা বিষণ্ণ দৃষ্টি উঠাইয়া অমৃতের মুখে স্থাপিত করিল,—"কি ?"

অমৃত একটু ইতস্ততঃ করিল,—"তারাকে যদি আমায় দাও। তুমি বিমলের কাছেই খবর নিও,—অসচ্চরিত্র বা অন্য কিছু সে'ও আমায় বলবে না।" অমৃতের কণ্ঠস্বরে সন্দেহ মিনতি ও সুগভীর আবেগ যুগপৎ ধ্বনিত হইল।

ব্লটিং কাগজ দিয়া যেমন করিয়া কালি শুষিয়া লয়, তেমনি করিয়াই ইন্দ্রাণীর মুখের প্রত্যেকটি বিন্দু শোণিত কে' যেন শোষণ করিয়া লইয়াছে—এতই তাহা বিবর্ণ দেখাইল। সে মাথা নত করিয়া স্তব্ধ রহিল। বোধ করি বুকের মধ্যে আকস্মিক একটা ভয়াবহ দুশ্চিন্তার আঘাতে ভাল করিয়া তার শ্বাস-প্রশ্বাসও চলিতে ছিল না।

সংশয়সঙ্কুল, ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে অমৃত জিজ্ঞাসা করিল, "ওকে পেলে তোমাদের কাছে আমি কেনা হয়ে থাকবো। আমার যথাশক্তি বিমলের রক্ষা-চেষ্টায় নিশ্চেষ্ট থাকবো না, যা তুমি আমায় করতে বলবে,—দেবে না কি ?"

জজের মুখ দিয়া যেমন করিয়া ফাঁসির আসামীর বিচারের রায় বাহির হয়

তেম্‌নি করিয়াই ইন্দ্রাণীব মুখ দিয়া বাহিব হইযা গেল,—"না।—সেও যে আমাব সন্তান।"

অমৃত চমকিয়া উঠিল। এতখানি বিশ্লেষণেব পরেও এ উত্তব সে আশা কবে নাই। বিস্ময-উত্তেজিত উচ্চ কণ্ঠে কহিযা উঠিল,—"দেবে না? বিযে দেবে না? বিমলকে বাঁচাতে চাও না?"

ইন্দ্রাণী কহিল, "তাব জন্যে তাবাব প্রাণ দিতে পাবি,—তাকে বিক্রি কবতে পাবি না।"

"আমায শত্রু কবলে যা' হয, কতকটা জানা আছে, বাকিটাও কি এবাব জানতে চাও?"

ইন্দ্রাণী চুপ কবিযা বহিল।

"ভেবে চিন্তে জবাব দিও,—ববং কিছু সময নাও। কি বলো?"

ক্ষীণকণ্ঠে ইন্দ্রাণী কহিল,—"পাববো না"—সঙ্গে সঙ্গেই সে বাহিব হইযা গেল। নোটেব তাড়াটা সেইখানেই পড়িযা বহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিমলের জীবনেব বথচক্র আবাব এক পাক ঘুবিয়া আসিল। তাব আগাগোড়া সমস্ত জীবনটাতে শান্ত সংযত ভাব কোন দিনই ছিল না। বরাবরই যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অকল্যাণের মধ্য দিযাই এর গতি আজও আবার আর একটা জটিলতাপূর্ণ, কণ্টকময, বাঁকা পথেই তার প পড়িল।—অথবা তার চেয়েও কিছু বেশী,—প্রবল একটা ঘূর্ণীর মধ্যেই সে

আসিয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে সহজ, সরল জীবন-যাত্রার সোজা পথে আর বুঝি তার এ জীবনে ফিরিবার সাধ্য নাই! অথচ এমনই ভাবোন্মাদনার তরঙ্গে সে ভাসিতেছিল, যে মনে উৎসাহের জোয়ারে ভাঁটা পড়িবার সময় ছিল না।—আশঙ্কার ক্ষোভ এতটুকুও মনে জাগে নাই। নেশার ঘোরে মানুষ যেমন অনেক কাজ করে, যা সহজ অবস্থায় পারিত না, তেমনি কতকগুলি দুরাশার মত্ততাও জগতে আছে।—ভাবপ্রবণ ব্যক্তি, বিশেষতঃ যাদের সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অত্যন্ত অভাব থাকে এবং বিদ্যা থাকে শুধুই পুঁথিগত,—তখন কল্পনার চশমা পরিয়া সংসারের রং তারা এম্‌নি উল্টা দেখে ও সেই মত্ততার ঝোঁকে দুরাকাঙ্ক্ষার পায়ে এমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া দেয় যে, তখন আর জগতের সাধারণ নিয়মাবলী কারও সাধ্য নাই যে তাদের মাথায় প্রবিষ্ট করিতে পারে।

বিমল চিরদিনের পথভ্রষ্ট। কোনদিনই তো সে ন্যায়ের পথে প্রেমের পথে আশ্রয় পায় নাই। তার বাল্য-কৈশোরে প্রথম যৌবনেও তাহাকে মানুষ বলিয়া দেখা হয় নাই। সে যেন পাশার দান!—এই ভাবেই তাহাকে ধরিয়া খেলা চলিয়াছিল। তার মধ্যের কোন উচ্চ বৃত্তির স্ফুরণ, বিশেষতঃ ভালবাসার প্রসার—পাছে হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তার দুজন অভিভাবককেই তার উপর সতর্ক চৌকিদারী করিতে হইয়াছে। জগতে আসিয়া নিজের বাপকে পর্য্যন্ত সে ভালবাসিবার সুযোগ পায় নাই। একমাত্র যাহাকে কোন বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া ভালবাসিয়াছিল, তার সঙ্গই বা ক' দিনের? সেও তো আজ সাত বৎসর চক্ষের অন্তরাল হইয়া গিয়াছে! চোখের আড়ালেই যে প্রাণের আড়াল হইয়া যায় তা' অবশ্য নয়। তথাপি সে সমুজ্জ্বল স্মৃতির আলো কি আর ঠিক তেমনটি থাকিতে পারে? তারাকে বিমল ভুলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সে আজ শুধু একটা স্মৃতি মাত্র। সে আর নিশীথ রাত্রির অবিচল ধ্রুবতারার স্থির জ্যোতি নয়!—ভোর বেলা গগন সাগরে বিলীয়মানপ্রায়

অনুজ্জ্বল ডুবুডুবু তারকা-বিন্দু চোখে পড়ে তেম্‌নি।

বিমলের জীবনে আবার এই একটা নূতন অধ্যায় লিখিত হইতে চলিয়াছে। বরাবরের মতই পুরাতনের সঙ্গে এবারও এর কোন সংস্পর্শ নাই। এ নূতন—সম্পূর্ণই নূতন এবং তার পক্ষে কি আশ্চর্য্য অভিনবই এর প্রকাশ ভঙ্গিমা! বিমলের মনে হইতেছিল, জননী-ধরিত্রীর অঙ্কে এ যেন তার নূতন জন্মলাভ! এ নব জীবনে আশা অপরিসীম, উদ্যম অপর্য্যাপ্ত, আনন্দ অফুরন্ত। এর স্মরণে, মননে, শ্রবণে পদেপদেই স্বাধীনতার ভয়বন্ধনহীন বিপুল আনন্দের সংস্পর্শ! শরীরের মনের সর্ব্ববিধ জড়ত্ব নাশ করিয়া এ যেন তাহাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে উত্তোলন করিতেছে,—এমনি অপরিমেয় আবেগের মত্ততায় সে মাতাল হইয়া গেল।

প্রথম প্রথম সঞ্জীবনী-সভার কার্য্য প্রণালী তার অপরিণত চিত্তে সন্দেহ ভয় জাগ্রত না করিয়া পারিত না, এর উদ্দেশ্যকে ঝক্‌মকে খোলসে ঢাকা দিলেও উহার ভিতরকার একটা জিনিষ যেন বিষধর সর্পের মূর্ত্তি ধরিয়াই তার কানের কাছে ফুঁসিয়া উঠিত। বিবেক যেন মনের মধ্যে একটা বিপ্লবের ঝড় তুলিয়া বলিতে চাহিত,—দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য দেশের লোকের ধন আমরা যে লুঠ করিয়া লইতে চাহি, এটা কি সঙ্গত?—এরা ত দেশেরই লোক।"—একদিন এই দ্বিধার দ্বন্দ্ব অন্ধ অভিমানের অহঙ্কার ভাসাইয়া লইল। —মানুষ এমনি করিয়াই আত্মপ্রতারণা করে।

অসমঞ্জরা নামে যতটা জমিদার কাজে তেমন নয়। উহাদের জমিদারীর অংশ—প্রায় তিনভাগই উহার বড় ভাই শতঞ্জীব তাঁর সরিক-জমিদারদের কাছে বিক্রী করিয়া নগদ টাকা লইয়াছিলেন; এবং ঐ টাকারও বেশীর ভাগটা তিনি নিজের ভাগেই লইয়াছিলেন। এখন শতঞ্জীব বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার। বিবাহও তাঁর অত্যধিক বিলাতী ফ্যাসানের ধনী পরিবারের মধ্যে হইয়াছে। স্ত্রী, পুত্র লইয়া তিনি সাহেবী কেতায় বাস করেন,—সেও বঙ্গ

দেশের বাহিরে সুদূর পশ্চিমে। মা, ভাই, বোনেব, খোঁজ খবর তিনি বড একটা রাখেন না, এঁরাও দেওয়ার জন্য ব্যস্ত নন। দুই ভাই স্বতন্ত্র প্রকৃতিব দুই বিভিন্ন জীব। শৈশব হইতেই এদেব মতের অনৈক্য :—শুধু আজ বলিযা নয। অসমঞ্জর হাতে যে সম্পত্তি আছে, ইহার মধ্যে তিন অংশ। অসমঞ্জব অংশের টাকা প্রায় আদায় হয় না। সরিকরাই ভোগ করে। উহার অংশেব নগদ টাকা প্রায শেষ হইয়া আসিযাছে। থাকিবাব মধ্যে আছে এই প্রকাণ্ড বাড়ীখানা। অসমঞ্জব মা বুদ্ধি কবিযা পূর্ব্ব হইতেই এখানা মোটা টাকা ঢালিয়া কিনিযা ফেলিযাছিলেন। সংসার চলে মাযের টাকার সুদে, এবং তা'তে না কুলাইলে নগদ টাকা ভাঙ্গিয়া। মাযেব নামেও কিছু টাকা আছে। অসমঞ্জর ইচ্ছা.মা অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা তাদেব সমিতিকে দান করেন। এজন্য অনেক 'ভজন-ভাজন'ও চলিতেছে, কিন্তু মা মানুষটি নাকি বেশ শক্ত এবং মোটেই বোকা নন, সেইখানেই গোল বাধিয়াছে! আবও এক মুস্কিল হইযাছিল উৎপলাব সম্বন্ধে। অসমঞ্জদের পিতা প্রিযকুমাব বায় উৎপলাকে দানপত্র করিযা একটা ছোটখাট সম্পত্তি দিযা গিযাছিলেন,—কিন্তু উৎপলাব একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও সেটাকে স্পর্শ করিবাব কোন অধিকাবই তার ছিল না। ব্যবস্থা ছিল, বিবাহের যৌতুক স্বরূপে উৎপলা ওই জমিদারীটুকু লাভ করিবে—অনূঢ়া-বস্থায় নয। এটাকে আদায় কবিবাব জন্য অসমঞ্জ এবং উৎপলা নিজেও পরিচিত উকিল-ব্যারিষ্টারেব কাছে আসা যাওয়া করিতেছিল ; কিন্তু উঁহাবাও তাদের ভরসা দিতে পারেন নাই।

বিমলেন্দুব টাকা কাজে লাগিতে লাগিল, কিন্তু সে টাকারও নগদ অংশটা মোটা মোটা অঙ্ক লিখিয়া অমৃতের ব্যাঙ্ক বইয়ে জমা পড়িয়াছে, খুব বেশী বাকি ছিল না। বাড়ী ভাড়ার টাকা কখন সিকি পয়সার জমা হয় নাই। খাতাব মধ্যে খান-দুই বাড়ীই পড়িয়া আছে। বিমল ঝোঁকের মাথায় রোখ করিয়া বলিল, "বাড়ী বেচে সব টাকাই আমি সমিতিকে দান করবো, খন্দের দেখ।"

অসমঞ্জ বলিল, "খদ্দের একনি দেখবার দরকার নেই, স্থাবর সম্পত্তি যতটা হাতে থাকে, ততই ভাল। এখন আমাদের অন্য রকমে কতকটা টাকার জোগাড করে নিতে হবে।"

বিমল জিজ্ঞাসা কবিল, "কি রকমে?"

অসমঞ্জ অসঙ্কোচে বলিযা ফেলিল, "ডাকাতি করে।"

শুনিযা বিমলেন্দুব বুকটা ধক্ করিযা উঠিয়াই সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গুটাইযা এতটুকু ছোট্ট হইযা গেল। মুখে বলায় আব কাজে করায আসমান-জমিনেব ফাবাক থাকে। অনেক বড বড কল্পনা বা বহু নিকৃষ্ট চিন্তা সময় বিশেষে মানুষের অন্তঃকেন্দ্রে চক্রাকাবে আবর্ত্তিত হয়, কিন্তু বহিস্ফূর্ত্তি হইতে পাবে কযটিব? মুখে লোকে যখন তখনই তো বাজা-উজির মারিতেছে; অথচ হাতে মারিযা বসে কদাচ কখন দৈবাৎ একজন। তেমনি পুলিশ-মারা, লুট কবিযা অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতিব আলোচনায় এই দলভুক্ত ছেলেগুলির মগজকে যতখানি গবম কবিযা তুলিত কার্য্যক্ষেত্রে হাতে হাতিযাবে নামিয়া পড়ার জন্য ততটা ব্যস্ত কবিত না। এখন সেই ভীষণ কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত কবার সঙ্কল্প অসমঞ্জকে দৃঢ ভাবে করিতে দেখিযা বিমলের চিত্ত অশান্তিতে পীড়িত হইযা উঠিল। কিছুক্ষণ মতামত প্রকাশের শক্তিও তার থাকিল না। মনের সেই অতর্কিত বিস্ময় সংশয়ের সংঘাত সামলাইয়া লইতে লইতে যেমন মুখ তুলিযাছে, অমনি তাহাবই মুখে নির্নিমেষে স্থাপিত একজোড়া চোখের সহিত তাব সঙ্কুচিত দৃষ্টির সম্মিলন ঘটিয়া বুকখানা প্রতিঘাতের লজ্জা স্পন্দনে কাঁপিয়া উঠিল। সেই বৈদ্যুতিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তার অন্তঃস্তলের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত উলটিয়া দেখিতেছিল,—সে তার আপন চিন্তায় বিভোর রহিযা ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই। মুহূর্ত্তে বিমলেন্দুর বর্ণহীন মুখটা ঘন রক্তের উচ্ছ্বাসে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলার ভিতর দিয়া সেই দুইটা কালো চোখের গোপন অগ্নি দহনের প্রচণ্ড শিখা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল। যে কথাটা

তার জিহ্বাগ্রে আসিযাছিল, সভয লজ্জায নিমেষে সে মূক হইয়া গেল।

উৎপলা তাব মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া উদাস কণ্ঠে ভাইকে বলিল, "তা'বলে তোমরা তোমাদের ডাকাতির মধ্যে বিমলেন্দুবাবুকে যেন টেনে নিযোনা।"

নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত অসমঞ্জ এ কথায একবার করিযা দু'জনকাব মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া সংশয় সঙ্কীর্ণ হাস্যেব সহিত কহিল, "এ কথা কেন মিষ্টার পল? বিমলেন্দু কি সাহসে বা সমিতিব প্রতি শ্রদ্ধায আমাদেব কারু চেয়ে কম?"

বিমলেন্দুব মনের কোণেব গোপন দ্বিধা নিজের কাছে বিদিত থাকায এবং সেই দুর্ব্বলতাটুকু তাব চাইতে বহুগুণ সাহসিকা নাবীব চক্ষে ধরা পডায বিমলেব গর্ব্বিত অন্তঃকবণ পবাভবেব লজ্জায মবিবাব পথ খুঁজিযা পাইতেছিল না। তাব উপর বন্ধু এবং দলপতি স্বযং যখন তাব শক্তির 'পবে অখণ্ড বিশ্বাস প্রকাশ কবিলেন, তখন বিমলেব মনেব সমস্ত ভয সঙ্কোচ এবং দৈন্য কর্পূরেব মত উবিযা গেল। বন্যার বেগে উৎসাহের তবঙ্গ ছুটিযা আসিযা তাব সন্দেহ-দোলাযিত চিত্তকে প্লাবিত কবিযা দিল। নির্ভীক দৃষ্টি উৎপলাব চোখেব উপর স্থির রাখিযা তাব অধবপ্রান্তেব ব্যঙ্গ-মিশ্র করুণ হাস্যবেখাকে উপেক্ষায অবহেলা করিযা, অসমঞ্জকে লক্ষ্য কবিযা বলিল,—"নতুন লোক বলে উনি বোধ হয় সময় সময আমার সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থিব রাখতে পাবেন না। যাক্,—কথায কাজ কি? কার্য্যক্ষেত্রে নিজেব নিজেব কৃতিত্ব প্রমাণ কবতে পারলেই হোল।"

উৎপলাব ঠোঁটের পরিহাসেব বাঁকা হাসি পবিতোষের স্নিগ্ধ হাস্যে তাঁব চোখের অস্বাভাবিক দীপ্ত শিখা দীপালোকেব স্নিগ্ধ ছটায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে হাসি সে প্রীতিব মধ্যের সবটুকুতেই বিজয়িনীর বিজয়-গর্ব্ব প্রচণ্ড অহঙ্কারে মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল,—বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, "এই অস্ত্রে

তোমাব জডতা কাটাইব,—এই মন্ত্রে তোমায জাগাইযা তুলিব, এবং আমাদের হাতে তুমি এমনি করিযাই খেলাব পুতুল হইযা থাকিবে, আমাদেব অস্তিত্বে অস্তিত্ব মিশাইবে,—তোমাব ব্যক্তিত্ব বলিতে কিছুই বাকি থাকিতে দিব না। —এই আমাব প্রতিজ্ঞা। এই মন্ত্রে আমি আবও অনেককেই বশে বাখিযাছি ; তুমিও থাকিবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিমলেব জীবন-তবণী এমন কবিয়া খেযাঘাটের দূবে দূবে বিপথের অভিমুখে পাডি দিতে দিতে অকূলে ভাসিয়া চলিল। খেয়ালের ঝোঁকে যে জীবন পথ সে নির্ব্বাচন করিল, এব মধ্যের জগৎ তাব নিতান্ত সঙ্কীর্ণ।—মণ্ডূকের কূপের চাইতে খুব বেশী বড নয। কলেজ পূর্ব্বেই ছাডিযাছিল, অমৃতকে দূর কবিযাছে। রামদযাল পূর্ব্বে কদাচ ··দেখা কবিতে আসিতেন, ইদানীং তাঁর বোগ শয্যায স্থাযিত্ব সে জ্বালায অব্যাহতি দিয়াছে। তাবাব স্থান হয ত উৎপলাই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আর বাকিটা—বোধ কবি বড একটা আর বাকিও নাই! এই সর্ব্বাপদ-শান্তিব মাঝখানে একটা আপদ এখনও চুকিতে বাকি,—সেটা তাব দিদিমা। কিন্তু এম্‌নি অদ্ভুত ভাবেই বিমলেন্দু সেই পবিত্যক্ত জীবনটিকে ভুলিয়া বসিযাছে যে, তাঁব কথা হঠাৎ কচ্চিৎ যখন পাঁচ কথার সঙ্গে জড়াইয়া মনে আসে, তখন একটা সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কারের মতই বিস্ময বোধ করে। দিদিমা বলিয়া একটা জিনিষ এ সংসারের কোনখানে এখনও আছে বটে!

কারণটা এই—উৎপলার সখ ঘোড়ায় চড়িয়া তারা সদলবলে কোন একটা

পল্লী-ভবনে পৌঁছিয়া একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করিবে। স্থান নির্ণয় হইয়া উঠে না! অবশেষে উৎপলাই এক সময় বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বিমলেন্দু বাবুদের বাড়ী তো কল্‌কাতা থেকে বেশি দূরে নয়,—সেখানে যাওয়াতে ওঁর আপত্তি আছে?"

বিমল প্রথম মুহূর্ত্তে চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল, নিমেষ মধ্যে সে ভাব ঢাকিয়া ফেলিয়া সহজ ভাবেই জবাব দিল, "আপত্তি?—কিসের?"

উৎপলা কহিল, "নেই তো? তা'হলে তাই যাওয়া যাক না?"

বিমল সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "সে তো আমার সৌভাগ্য।"

এমন করিয়া কথা বলিতেও এখন বিমলের বাধে না। অসমঞ্জ এখন তার কাছে অসমঞ্জবাবু নয়,—এতই সে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।—অসমঞ্জ হৃষ্ট হইয়া কহিল, "বেশ তো—রথ দেখা এবং কলা বেচা দুইই একসঙ্গে হবে, এই উপলক্ষে আমাদেরও বিমলের বাড়ীটা দেখা হয়ে যাবে। কে' বলতে পারে, সুদূর অতীতের কোন একটি দিনে সেই যে ঘরখানিতে বিমলেন্দু-প্রকাশের জন্ম হয়েছিল, তারই এতটুকু মৃত্তিকাকণা মাথায় ছোঁয়াবার জন্যে সহস্র সহস্র ভক্ত বীরের মহামেলা সেখানে হবেই না? সেই ক্ষুদ্র গ্রাম যে একদিন ইতিহাসের শীর্ষ-স্থানীয় হয়ে উঠবে না, তারও তো কোন প্রমাণ নেই!"

অনাগত মহাকালের মহা রহস্যজাল-জড়িত অদৃশ্য বিরাট জঠরে কি সঞ্চিত আছে সে কথা কে' বলিবে? তবে বর্ত্তমানে বিমলেন্দুর বহুদিন পরিত্যক্ত গৃহের অবস্থাটা এই সব মাননীয় এবং বিশেষ বান্ধব-বান্ধবীবর্গের অভ্যর্থনার উপযুক্ত আছে কি না সেইটাই এ ক্ষেত্রে চিন্তনীয় হইয়াছে। উভয় সঙ্কটের এই দোটানায় পড়িয়া বিমলেন্দুকে ঈষৎ বিমর্ষ করিয়া তুলিল। সেখানের সম্বন্ধে কোন কথাই সে বহুকাল যাবৎ ভাবিবার পর্য্যন্ত আবশ্যকতা বোধ করে নাই। সেখানে এখন কে' আছে? দিদিমা এতকালের পর তাহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন? সেই তো মানুষ! ইহাদের সাম্‌নে—বিশেষতঃ

এই উৎপলার সাক্ষাতে হয় ত বা কান্নায় ফাটাইয়া 'তুখে' বলিয়াই বা তাহাকে টানাটানি বাধাইয়া বসেন! উৎপলার একে তো পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা হিন্দুনারী সম্বন্ধে যেরূপ কঠোর ধারণা আছে, তর্ক করিয়াও অনেকেই যে তাহা আজ পর্য্যন্ত ঘুচাইতে পারে নাই। আজ কি উহারই যুক্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেই সে তার নিজের ঘরের ছিদ্র উহারই চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে সঙ্গে করিয়া উহাকে লইয়া চলিল? উৎপলার বিশ্বাস ইংরাজী লেখাপড়া শেখা জনকয়েক কলিকাতার মেয়ে ছাড়া আর সমস্ত বঙ্গনারীর চিত্ত একান্ত সঙ্কীর্ণ,— কোন্দল-শাস্ত্রে উহারা দিগ্বিজয়িনী; সভ্যতা, ভব্যতা, নম্রতা, এমন কি, শীলতারও কোন ধার তারা কস্মিন্‌কালে ধারে না। কথা কহে হাত নাড়িয়া; গলার আওয়াজ হুগলী হইতে বর্দ্ধমানে না ছুটাইয়া ভাল কথাটাও কহে না, শরীরে ওদের অসুরের বল, আর সেটা মধ্যে মধ্যে পরিজনবর্গের উপরেও প্রয়োগ করিতে ছাড়ে না,—ইত্যাদি। এই বর্ণনীয় মূর্ত্তির সঙ্গে নিজের ঘরের মানুষটিকে তুলনা করিয়া সখের ভ্রমণের সকল আনন্দই বিমলের পক্ষে নিরানন্দে পরিণত হইল।

কয়েকটা তেজী ঘোড়া আসিল। ভাড়া বা ধার করা। সখের অশ্বারোহীরা সাজসাজ রব তুলিয়া যাত্রার উদ্যোগে হল্লা জুড়িল। সকলেরই উৎসাহ, কেবল বিমলেন্দুই বিমর্ষ ম্লান মুখে যেন শ্মশান-যাত্রীর মত নিরুদ্যম ভাবে কোনমতে আড়ষ্ট হইয়া ঘোড়ায় চড়িল। ইতঃপূর্ব্বে ঘোড়ায় চড়া লইয়াও সে উৎপলার কাছে খোঁচা খাইয়াছে। ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নাই বলিয়া অসমঞ্জ এই দু দিনে বহু যত্নে উহাকে অশ্বারোহণ বিদ্যা শিক্ষা দিতেছিল। বিমলও বিশেষ আগ্রহ ভরে সে বিদ্যাটাকে স্বল্পাবসরেই যথাসম্ভব আয়ত্ত করিয়াছিল। তথাপি মনে তার ভয় ছিল না, সে কথা বলা যায় না। সে ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া অসমঞ্জ চিন্তিত হইয়া কহিল, "পারবে তো? পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে কাণ্ড না হয়!"—

বিমলের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে না হইতে উৎপলা বলিয়া উঠিল, "কুচ পবোয়া নেই। হাত-পা ভেঙ্গে যায় আমরা ওঁকে নার্স করবো!—আমার ঘোড়াব পাশে পাশে আসুন, আমি আপনাকে 'থরোলি' হেল্প করে নি'যে যাব।"

অসমঞ্জ বোনের পিঠ ঠুকিযা সগর্ব্বে হাসিযা কহিল, "তা' আমাদেব সেণ্টপল পারে। ওর মতন ঘোড়সওযার কসাকদের মধ্যেও আছে কি না সন্দেহ!"

বিমলেন্দুব মুখখানা অবমানিত লজ্জায রক্ত-জবাব মত লোহিতাভ হইল।

সারা পথ বিমলেন্দুব ক্ষুব্ধ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত অন্তর একান্ত ভাবে কামনা করিতে করিতে আসিয়াছে, যেন পৌছিযা সে তার বহুদিনেব পবিত্যাক্ত নিজ গৃহে তাবাকে দেখিতে পায। আবও একজনকে দেখিতে বা দেখাইতে পাবিবার জন্যও তাহাব পরাভূত পীডিত অন্তব ভিতবে ভিতবে যে কতখানি ব্যাকুল হইযাছিল, সে কথা সে জানিতে পাবিল, যে মুহূর্ত্তে তাব পার্শ্ববর্ত্তিনী তাদেব গ্রাম প্রান্তে পৌছিয়া এক গ্রাম্য নাবীর নব-অভ্যাগতগণের প্রতি ভয-চকিত উগ্র কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ও অর্দ্ধাববিত বেশভূযাব সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য শুনিযা—"এই পাড়াগেঁযে মাগীগুলোই আমাদেব সর্ব্বনাশ করচে! এদের ছেলেপিলেবা কতই বা শিক্ষিত হতে পারে,—মানুষ হযে জন্মানই এদেব বিডম্বনা।"

তখনই বিমলের মনোদর্পণে ফুটিয়া উঠিল তাব বিমাতা ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি। তাব মুখ দিযা বাহির হইয়া পড়িল,—"পাড়াগাঁয়ের সব মেযেরাই অমন নয, ওদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে আছেন এবং বইএব বিদ্যা বেশী না শিখেও যে শিক্ষিতা হতে পাবে, তা'ও এই পাডাগাঁয়ে দেখেছি। তাঁরা নব্য শিক্ষিতা না হতে পারেন, অশিক্ষিতা ন'ন।" উৎপলার নবীনোদ্গত বসন্ত-পত্র-মঞ্জরীর মত ঢলঢল তরুণ মুখ পরিহাস ও অবিশ্বাসের মিশ্র-হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল। বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হুল বিঁধাইয়া সে কহিয়া উঠিল, "তাই না কি! সে বিদুষীটি কে, শুন্‌তে পাই না বিমলবাবু? বোধ করি তিনি আপনার সেই অতুলনীয়া বোন তারা?"

উৎপলার দুই চোখে একটা অস্বাভাবিক জ্বালাময়ী দীপ্তি মুখখানা যেন আভ্যন্তরিক ঈর্ষার বর্ণে কালো দেখাইল। গলার স্বরেও মনের উষ্মা প্রকাশ পাওয়ায় বিমলেন্দু সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। উহার এই অহেতুক অসন্তোষের মূল তত্ত্বানুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া অথচ কিছু অপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল, "হ্যাঁ, তারা ও তার—তার মার কথাই আমি বলছি।"

উৎপলার কালিমাখা মুখ পাংশু হইয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরব ঔদাস্যে চলিতে চলিতে যেন আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া নিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "চলুন তো, আপনার সেই রূপসী আর বিদুষী ভগ্নীকে আজ চর্ম্মচক্ষে দেখেই আসা যাবে। আপনার বোধ করি মনে মনে খুবই বিশ্বাস আছে যে, তেমন আর কেউ হয় না, না?"

বিমলেন্দু মুখ ফিরাইয়া বিস্ফারিত চক্ষে সমভিব্যাহারিণীর মুখের পানে চাহিয়া ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিল। এটা সে নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই করিয়া থাকিবে! স্থান কাল কিছুই অনুকূল নয়; অথচ কি করিয়া যে কি হইয়া গেল সে কেবল সেই অঘটনঘটনপটীয়সী ভাগ্যদেবীই জানেন! অন্তরের নিভৃত বিজনে অত্যন্ত সন্তর্পণে যে একটা অতি গোপন বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল,—বুঝি তখনও সম্পূর্ণ রূপে জাগে নাই,—আধ স্বপ্নে, আধ ঘুমঘোরে বিজড়িত হইয়া অন্তরের কোন্ নিভৃত নিরালায় ফোটো-ফোটো হইয়া কিসের প্রতীক্ষায় ছিল, যেন—সহসা সেই এতটুকু তীক্ষ্ণস্বরের স্পর্শে, নারীজনোচিত অভিমানভরে আধ-ফেরানো মুখের আভাসে অথবা সব জড়াইয়া আজ যেন মলয়ানিলের মত সর্ব্ব দেহ-মনকে অননুভূতপূর্ব্ব পুলকে শিহরিত করিয়া অর্দ্ধ নিমেষে বিমলের মুদিত চিত্তে আনন্দের শতদলরূপে বিকশিত হইয়া

উঠিল। এক মুহূর্ত্তে তার মুখখানা উদয়াচলের মত লালে-লাল হইয়া গিযা তাব দৃষ্টিতে নব অনুবাগের অমৃত ধারা ঢালিযা দিল। এক হাতে ঘোড়ার রাশ টানিযা অপর হস্ত অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী উৎপলার জানুর উপর স্থাপন করিয়া সে মুগ্ধ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "উৎপলা!"

অশ্বারোহীব দল অগ্রসব হইযা গিয়াছিল, নিকটে বা পশ্চাতে কেহ কোথাও নাই। পাশেই বিমলেব আশৈশব-জীবনেব চিবপবিচিত দত্ত-পুকুব এখনও বিগত বর্ষণেব জলভাব বক্ষে বহিয়া নিথব হইযা আছে। তাব সবুজ বক্ষে বিস্তৃত শৈবালদলোপবি ফুটন্ত এবং অস্ফুট কহ্লাব পুষ্প কৌতুক-নর্ত্তনে নাচিয়া নাচিযা যেন কি বলিযা হাসিতেছে। মাথাব উপব শরতেব স্বচ্ছ আকাশ নীলিমা বিস্তার কবিযা বাখিযাছে। চাবি পাশে বর্ষাজলধৌত শ্যামলতাব অপূর্ব্ব সম্ভার। রাজধানীর কর্ম্মকোলাহলেব বাহিবে, শান্ত বিজনে, স্নিগ্ধ বাতাসে, সর্ব্বত্র ভবিযা মোহের পুলক বহিযা চলিযাছিল। প্রকৃতি-বাণী যেন সেই পবশে পুলকাঞ্চিত শবীবে আবেশে অলস নেত্রে চাহিযা এই দুটি নিঃসঙ্গ তরুণ-তকণীব বিস্মৃত যৌবনকে জাগ্রত কবিতে মাযাজাল বিস্তাব করিতে চাহিতেছিলেন। তাব সহাযতাকল্পে স্নিগ্ধ শেফালি-গন্ধ বহিযা আনম্র ধনুঃশর পুষ্পধন্বা জানু পাতিযা উহাবই একটি শব সন্ধান কবিলেন।

ফুলধনুব ফুলবাণটা গিযা বিঁধিযাছিল বুঝি বিমলেন্দুবই বুকে? তাব নিসুপ্ত যৌবন সহসা এই শাবদপ্রাতে সেই শবাহত হইযা জাগিযা উঠিল, গভীব আবেগ ব্যাকুল চক্ষে চাহিযা, সে আবাব তখনই কম্পিত স্ববে ডাকিল, "পলা!"

বিমলেব পিছনে ঘোডার পশ্চাতে শপাং করিযা একটা চাবুকেব ঘা পড়িল। তীক্ষ্ণ উচ্চহাস্যের সহিত উৎপলা কহিল, "বিমলেন্দুবাবু। ঘোড়াব বাশ টেনে ধরুন,—মবণকে আপনি যথেষ্টই ভয কবেন। সাবধান!"

কশা-লাঞ্ছিত অশ্ব তড়বড করিয়া ছুট দিল। পড়িতে পড়িতে বিমলেন্দু নিজেকে সামলাইয়া লইল।

এই তো বিমলেন্দুর বাড়ী! অসমঞ্জ নিজে এক লাফে নামিয়া বিমলকে নামিবার সাহায্য করিতে আসিতেই তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িয়া উৎপলা ত্রস্তে-ব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "ছোড়দা! ও হবে না! বিমলেন্দুবাবুকে নাম্‌বার সাহায্য যে আমি করবো।—তুমি মাঝে থেকে আমার কাজে হাত দিতে এস কেন বলো তো?"—কাছে আসিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবেই বিমলেন্দুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। দেখিয়া একদিকে যেমন ঘোর বিস্ময়ে, অপর পক্ষে তেমনি অবর্ণনীয় আনন্দে বিমলেন্দুর লজ্জা-ক্ষুব্ধ এবং সভয় চিত্ত যেন মুক্তি লাভ করিল। মনে মনে এই ক্ষমাকে সে মাথায় তুলিয়া লইল, এবং আপনার কাছেই পুনঃপুনঃ শপথ করিল, 'অতঃপর আর কখন তার মধ্যে এমন দুর্ব্বলতা কোনমতেই প্রশ্রয় পাইবে না।'—জীবনের এই প্রথমোদ্গত প্রেমকে সে পায়ের তলায় ফেলিয়া পিষিয়া ফেলিল।—অথচ নারীর মধ্যে এতটাই নারীত্ব-হীনতায় সে যেন অনেকখানি আহতও হইল। এ' কি চিত্ত? পাথর দিয়া গড়া,—না, কি?

বাড়ীটা কত কাল মেরামত হয় নাই। ছাদে অশ্বত্থ-বট জন্মিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ হইতে চুণ বালি খসিয়া পড়িয়া ভিতরের জীর্ণ কঙ্কালটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর পাশেই গৃহস্থদের নিত্য ব্যবহার্য্য পুষ্করিণীটা মজিয়া গিয়া পানফলের গাছে বোঝাই হইয়া আছে। ইহার দ্বিতল গৃহের দুএকটা জানালার কপাট ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে এবং সেই ভাঙ্গা জানালার মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছিল একটা ছেঁড়া চটের পর্দ্দা ঝুলিতেছে, বোধ করি জানালার কবাটের বদলেই ইহাকে বাহাল করা হইয়াছিল।

বিমলেন্দু বিমনা এবং সলজ্জ ভাবে নিজের অবজ্ঞাত সুদীর্ঘকালপরিত্যক্ত গৃহদ্বারে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। দ্বার ঠেলিতে বা কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিতে তার যেন সাহসে কুলাইল না, ভয় হইল ডাকিতে গেলে হয় ত মুহূর্ত্তে ওই রুদ্ধদ্বার খুলিয়া কি একটা লাঞ্ছনার

বিরাট্ ঝড় বাহির হইয়া ভীমবলে তাহার উপর আপতিত হইবে! এই সকল মার্জ্জিতরুচি, শিক্ষিত সৌখীন সঙ্গীদলের মধ্যে বিশেষতঃ উৎপলার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টির উপরে সেই একান্ত লজ্জাকর আবির্ভাব কল্পনায় তার শরীর মন যেন কাঠ হইয়া গেল। রসহীন জিহ্বা শব্দ উচ্চারণে সমর্থ হইল না।

কিন্তু সঙ্কোচ যাহাকে তারই এ অবস্থাটা চোখে পড়িল। অসমঞ্জস দল তখন ঘোড়া বাঁধিবার উপায় ঠাহরিতে ব্যস্ত। রাধিকা নিজের ঘোড়ার পিঠ ঠুকিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করিতেছিল। উৎপলা তাহাকে হাঁক দিয়া কহিল "রাধিকা দা! আমার ঘোড়াটা তুমি ধরো তো ভাই!"

পরম আপ্যায়িত হইয়া রাধিকাচরণ এক হাতে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আর হাতে উৎপলার বাহনটার জিম্মা লইল। তখন নিজের হন্টিং বুটের খটাখট শব্দ তুলিয়া হাতের চাবুক শূন্যে আস্ফালন করিতে করিতে লঘুগতি বালকের মত উৎপলা যেখানে বিপন্ন গৃহস্বামী বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে সেখানে ছুটিয়া গেল, কল-ঝঙ্কারী উচ্চহাস্য করিয়া তার সন্দিগ্ধ চিন্তাকে কৌতুকের ধাক্কায় ছিন্ন করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "দোর খোলাবার জন্যে ভাবনায় পড়েছেন দেখছি। দোর তো আমাদের খোলবার দরকার নেই, আসুন, আমরা আজ পাঁচিল চড়াও করে আপনার এই 'কাস্‌লটাকে' দখল করে নিই!—কি বলেন?" —বলিয়াই সে শিশুর মত মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বিমলের কাঁধের উপর হাত দিয়া একটুখানি ঠেলা দিল,—"চলুন, চলুন, আজ একটা বড় কাজের মহলা দেওয়া যাক্।—ভয় পাচ্চেন নাকি?—আপনারই তো বাড়ী!—কিন্তু আমি ভাবছি, আমরা ওই পাঁচিল দিয়ে ধপাস্ করে লাফিয়ে পড়লে আপনার দিদিমা আর আপনার তারা না জানি কি রকম ভয়ে পেয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠবে! আমি শুনেছি পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা ভারি ভূতের ভয় করে।"—বলিয়া আবার এক চোট হাসিয়া লইয়া সে বিমলেন্দুকে একরকম টানিয়া ভাঙ্গা পাঁচিলের তলায় দাঁড় করাইল।

পাঁচিলের ওঠা বিমলেন্দুর ছেলেবেলায় অভ্যাস ছিল। সে অনায়াসেই উঠিয়া পড়িল এবং এবার এ কার্য্যে সে সঙ্গিনীর সাহায্যকারী হইতে পারায় কিছু গৌরব বোধও করে নাই তা' নয়, তথাপি এই হাসি খেলার তলায় তলায় তার অপরাধ-পীড়িত চিত্ত সকল দিক দিয়াই যেন অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল। কোন মতেই উহাকে সে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না।

পাঁচিলে উঠিতেই ভিতরের দিকে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে দৃষ্টি পড়িল। বিমলেন্দু দেখিল সদর দ্বার বন্ধ থাকিলেও খিড়কিদ্বার খোলাই ছিল, শুধু তাই নয়;— সেই দ্বারপথে এই বাটীর মধ্যে জনসমাগমও হইয়াছে নেহাৎ কম নয়! ভিতরের অঙ্গনে তুলসীতলায় মলিন শয্যায় কেহ একজন চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, আর তার মুখের সাম্‌নে বসিয়া একটি অল্পবয়সী মেয়ে—খোলা চুলের রাশিতে নত মুখখানি প্রায় ঢাকা,—সে উচ্চকণ্ঠে গীতা পাঠ করিতেছে। বিমলের কানে ঢুকিল।—

> "যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম।
> তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাব ভাবিতঃ।"

ইহাদের দুজনকে বেষ্টন করিয়া জন-পাঁচসাত লোকের অল্প কিছুখানি ভিড় জমিয়াছে।

উৎপলা এমন দৃশ্য জীবনে দেখে নাই। সে ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া হাসি মুখে বিদ্রূপের টঙ্কার দিয়া নির্ব্বাক্ নিথর বিমলকে খোঁচা দিবার ইচ্ছায় কহিয়া উঠিল, "এ হচ্ছে কি, বিমলেন্দুবাবু? কারুকে ভূতে পেয়েছে বুঝি,— তাই ঝাড়ানো হচ্ছে?"

কোন কথা না বলিয়া যেমন পাঁচিল বাহিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি করিয়া নামিয়া খিড়কির দরজা দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইতে বিমলেন্দু ডাকিল, "দিদা!"

গীতা-পাঠ থামিয়া গেল। ঝুলিয়া-পড়া চুলের চামর হাত দিয়া ঠেলিয়া

তরুণী-পাঠিকা ত্রস্তে মুখ তুলিল, ডাকিয়া উঠিল, "দাদা!"

মুমূর্ষুর নির্ব্বাক ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়াও যেন একটা অস্ফুট ধ্বনি বহু কষ্টে নির্গত হইয়া আসিল, "দুখে।" তাঁর প্রায় নিশ্চল শরীরে একটা প্রবল ঝঞ্ঝন বাজাইয়া স্নায়ুতন্ত্রীতে তড়িৎ স্পর্শের মত বারেকের জন্য একটা আকুল চঞ্চলতা জাগাইতে সমর্থ হইল। অর্দ্ধ-মুদিত চোখ দুটাকে পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া তিনি শব্দানুসরণে ব্যাকুল ভাবে চাহিতে বিমলেন্দুকে দেখিতে পাইয়া, আবার একটা অর্দ্ধস্ফুট হর্ষধ্বনি করিয়া অবসন্ন হাতখানি উঠাইতে চেষ্টা করিলেন। দেখিয়া, তারা সযত্নে তাহা উঠাইয়া ধরিল। মর্ম্ম বুঝিয়াই বিমলেন্দুকে ইসারায় সেই হাতের স্পর্শের কাছে সরিয়া আসিতে ইঙ্গিতও করিল। বিমলেন্দু কতকটা সম্মোহিত ভাবেই অগ্রসর হইয়া মুমূর্ষু দিদিমার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া নত মস্তকে তাঁহার থর-কম্পিত শীর্ণ হস্তের উপর ঠেকাইতেই দণ্ডাহতবৎ চমকিয়া উঠিল। তার সেই আজন্মের পরিচিত, আবার বহুকাল যে হাতের স্পর্শ হইতে সে বহু দূরে সরিয়া আছে, আজ তাহা শবহস্তের মতই শীতল! আর ওই মুখ? —যে মুখ তার প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইতেই সে দেখিয়াছে, আবার বহুদিনই দেখে নাই,—দেখিবার স্পৃহাও তো কই ছিল না,—সেই এ জগতের একমাত্র আত্মজনের মুখ,—কি বিবর্ণ, বিকৃত এ মুখ!

মঙ্গলাদেবীর বাক্ রোধ হইয়াছিল, কিন্তু অন্তঃসলিলা নদীধারার মত ভিতরে ভিতরে জ্ঞানের সঞ্চার ছিল। শক্তি-সামর্থ্যহীন হাতখানা অন্যের সহায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া নির্জীব ভাবে এলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তারা সযত্নে নির্জীব হাতখানি নিজের উষ্ণ ও কোমল হস্তে তুলিয়া লইতেই আবার একবার তাহা বহু কষ্টে তার মস্তক স্পর্শ করিল। মুখে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হইল, 'সুখী হয়ো।'—'সুখী হয়ো।'—দেখিতে দেখিতে সে[illegible] আবারও অবশ হইয়া পড়িয়া গেল।

ঠোঁটে মুখে জল দিয়া তারা ডাকিল, "দিদিমা!"

কোন সাড়া নাই! বিমলেন্দু ডাকিল, "দিদা!—দিদা!"

কে উত্তর দিবে? মঙ্গলাদেবীর সেই শানিত ক্ষুরধার-তুল্য তীক্ষ্ণ রসনা তৎক্ষণে চিরনীরব হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইহার এক মাস পূর্ব্বের কথা। ইন্দ্রাণী বিধবা ভ্রাতৃজায়া সাবিত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌদি! খুড়িমা লিখেচেন, ...পুরের মায়ের অসুখ বড্ড বেশী, আমি তাবাকে নিয়ে একবার যদি দেখতে যাই, তুমি কি ক'দিন বাবার সেবা করতে একলাটি পেরে উঠবে?"

সাবিত্রী সম্মতি জানাইল।

অনেক দিন পরে ইন্দ্রাণী নিজ গৃহে ফিরিল। প্রথম আসার দিনেও যে অতবড় অনাদরে গৃহীত হইয়াছিল, সে-ই আজ এখানে যেরূপ স্নেহ-সূচিত সমাদর লাভ করিল, ইহাতে তার মনটা কাঁদিতে লাগিল। দুঃখে ও রোগে কি মানুষটা কি হইয়া গিয়াছে! এ কয় বৎসর মঙ্গলাদেবীর পক্ষে বড়ই দুর্বৎসর। প্রথম তিন বৎসর তিনি যা-হোক অন্নবস্ত্রের দুঃখটা পান নাই, মধ্যে মধ্যে দু'দশ দিন বাদ ইন্দ্রাণীর হাতের ঠাকুরসেবাও তাঁর বজায় ছিল। স্বভাবগুণেই তাহাকে তখনও তিনি মন্দ কথা বলিয়া গিয়াছেন; তথাপি সে কটুকাটব্যের মধ্যের তীব্র ঝাঁজটা অনেকখানিই কমিয়া গিয়াছিল। কে' শত্রু, আর কে যে মিত্র, সে চিনিতে তো আর তখন বাকি ছিল না। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ইন্দ্রাণী যখন বারিৎপুরে গিয়া বাস করিল এবং ক্রমশঃ অমৃত নিজের অংশটাকে ভারি

করিয়া তুলিতে গিয়া এঁদের অংশকে খণ্ডিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতে এই অসহায়া বৃদ্ধার অশনবসনেরও অভাব ঘটিল। অবশ্য নিজের কাছে সঞ্চয় মন্দ ছিল না, কিন্তু যে স্বভাবকৃপণ, সেগুলি খসাইয়া নিজের কাজে লাগাইতে মমতা হয়, সে সব পড়সীর বাড়ী মোটা সুদে খাটিতেছে। সুহাসিনীর অনেকগুলি অলঙ্কার আছে। সে তাঁর 'দুখের বউ' আসিয়া পরিবে। কাজেই যক্ষের মত সমস্ত আগলাইয়া লইয়া দারিদ্র্যে ডুবিয়া থাকিলেন। আর অবিশ্রান্ত চোখের জলে,—যে ভাইপো দুগ্ধপোষিত কালসর্পবৎ তাঁহাকে ছোবল মারিল, তাহার উদ্দেশ্যে অজস্র গালি ও অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে কোন মতে দিন পাত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাণীর এক জ্বালা হইল! সে ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চায়, ইনি রাজী হ'ন না। মুখ বাঁকাইয়া বলেন, "বলো কি বউ! দুখের এই ঘরদোর, দুখের আমার গয়নাগাটি, বাসনকোশন, এসব আমি ক'ার কাছে রেখে যাই? বাপ্‌রে, সে আমি প্রাণ থাকতে পারবো না! তুমি আমায় মাসে মাসে গোটা কতক টাকা পাঠিও, অসুখ হলে খবর দেবো, এসে সেবা টেবা করে যেও, থাক্‌তে আমায় এখানেই হবে। যদি কখন দুখে আসে,—তার মুখটি দেখে, তাকে একটি টুকটুকে বউ এনে দিয়ে, তাদের নিয়ে ঘর সংসার পাতবো। তদ্দিন এম্‌নি করেই কাটুক আমার।"

অগত্যা ইন্দ্রাণীকে সেই ব্যবস্থাই করিতে হইল। এবার এখানে আসার স্বল্পকাল পরেই ওখানে রামদয়ালের রোগবৃদ্ধির সংবাদে তাহাকে বাপের কাছে ছুটিতে হইল, বহুদিনের বিতাড়িত সেই ক্ষ্যান্তি ঝির কাছে তারাকে সঁপিয়া দিয়া, তাহারই সেবার উপর ইঁহাকে রাখিয়া বারিৎপুরে ফিরিয়া গেল। মঙ্গলার যদিও ক্ষ্যান্তির প্রতি কোন দিনই সুদৃষ্টি ছিল না, তথাপি তাঁহাকে নিতান্ত অসহায় ও অক্ষম দেখিয়া সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বৎসরাধিক কাল হইতে তাঁর যত্ন-সেবা করিতেছিল। চাকরী সে অন্যত্র করিত এবং রাত্রে ও প্রাতে ইঁহার সমস্ত কাজ করিয়া দিয়া আগলাইয়া থাকিত। বিনিময়ে অবশ্য কিছুই ফিরিয়া

পাইত না—মঙ্গলা বলিতেন,—"বামুনের সেবা করচে পরকালে ত'বে'যাবে, সেই লোভেই ত এসেচে ঘুষিযে ঘুষিযে নযতো এলো কেন ?"

একদিন মঙ্গলা বলিলেন, "চার পাঁচখানা চিঠি দিলি তারি ! দুখে তো একখানারও জবাব দিল না। তবে কি তাব কোন ভাল-মন্দ হলো না কি ? কে' জানে মা, কি যে কপালেব লেখনে আছে !"

তারা চমকিয়া উঠিযা জিব্ কাটিল, "ও কি কথা ! না—না, হয় ত দাদা সে বাসায নেই। অমৃতমামাকে না কি সে ঝগডা কবে সরিযে দিযেছে, না কি করেছে।—মা দাদুকে কি যেন ঐবকম কি সব একদিন বলছিলেন।"

শুনিযা মঙ্গলা ঈষৎ একটুখানি সান্ত্বনাপূর্ণ এবং অনেকখানি হতাশাসূচিত গভীব দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক কহিযা উঠিলেন, "পুঁটে সর্ব্বনেশেকে কেউ বেড়া আগুনে পুডিযে মেবেচে,—এই খববটা আমায় দেবাব জন্যে কি আমার কেউ কোথাও নেই বে !"

আব একদিন বলিলেন, "দেখ্ তাবি। আমাব শবীবটে কেন যেন দিন দিন খাবাপ হচ্চে,—এ ত ভাল না ! তোব মাকে আসতে লেখ্। আর দেখ্, যদিই ভগবান্ না করুন, আমার ভাল-মন্দই হঠাৎ কিছু ঘটে যায, তাহলে—এই আমার চাবি-কাটিটা দেখে রাখ্, দুখে এলে এতে যা' আছে সব তাকেই বুঝিয়ে দিস,—বুঝলি ? লক্ষ্মী মেযে তুই যেন ওর থেকে কিচ্ছুটী হাত করিসনে ভাই দেখিস ! ওসব দুখেব মার। তোব মাযেবও তো ঢের সোনা দানা ছিল। তোর বাপ নিজে সাধ কবে কিবে গডনের পালিশ-পাতার বালা, মুক্তার সীতাহার গড়িযে দে'ছলো—দেখে আমি আবও বুক করকর করে মরি ! বলি, ও মা ! আমার সুখিব বেলায় ত অমনটি হয নি !—আর তোব মাতামো—সে মিনষেও তো গা মুড়ে সোনা দিছিলো,—তা' বাছা মা তোর জন্যে যে একখানিও ফেলে রাখতে পারেনি, সে আর কা'র দোষ ? তোরই কপালে নেই, আমি কি করবো বল্ ? তা' তুই যেন আমার অনেক সেবাযত্নই করলি,—তোকেও আমি কিছু

যে না দে'ব তা ভাবিসনে, বেঁচে থাকি তো তোর বিয়ের সময় আমার নিজের কানের কানবালা দুখানি তোকে যৌতুক কর্ব্বো বলে রেখেছি। আমি কোন জিনিষটি কখন নষ্ট তো করিনি। না, তেমন আক্ষুটে মেয়েমানুষ আমায় পাওনি! আমার নিজের বিয়ের চেলীখানি শুদ্ধু আমার ওই বড় সিন্দুকে জিরে-কর্পূর দেওয়া কাপড়ে করে বাঁধা আছে। বরঞ্চ সেইখানা তুমি পূজোর কাজ করবার সময় পরো,—দিদিমাকে তবু মনে পড়বে।"

এমন করিয়া নিজের স্মৃতি-রক্ষার সুলভ চেষ্টায় এবং বিস্মৃতের স্মৃতি স্মরণে জীবনের একঘেয়ে দিনগুলাকে আযত্তে আনিয়া একদিন মঙ্গলা দেবী সবিশেষ অনিচ্ছার সহিত কোন্ এক অজানা পথে যাত্রা করিলেন। আশ্চর্য্য যে সেই শেষ ক্ষণেই প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষিতের দুর্লভ দর্শনও তাঁর অকস্মাৎই ঘটিয়া গেল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ডাকাতি করা কাজটা বেশ মোলায়েম নয় দেখিয়া বিমলেন্দুর কলিকাতার একখানা বাড়ী বিক্রী করা সাব্যস্ত হইল। জনকয়েক নিষ্কর্ম্মা ছেলে অসমঞ্জদের ঘাড়ে চড়িয়া খায়, এরা সেকেণ্ড-ক্লাসে যায় আসে, পরে ভাল, বলে, নইলে পুলিশের চোখ পড়িবে। মধ্যে মধ্যে দেশের কাজের নামে এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বেড়ায়, খরচ যোগায় অসমঞ্জ। এখন তার হাত খালি হওয়ায় বিমলেন্দুর ঘাড়েই দায়টা পড়িল এবং ইহাকে 'দেশের কাজ' নাম দিয়া সেও শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করিল। বিমলের দিদিমার মৃত্যুতে একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা ও

গহনা হাতে পাইয়া বাড়ী-বিক্রীর চেষ্টা স্থগিত আছে। আপাততঃ সেইগুলা পোদ্দারের দোকানে গালানী-দরে ধরিয়া দিয়া যে টাকা পাওয়া গেল, সেও নেহাৎ কম নয়!

তারা চাবি খুলিয়া দাদাকে যখন দিদিমার ধনভাণ্ডার বুঝাইয়া দেয়, তখন তার নিজের প্রাপ্য কান-বালা দুটিও দিয়া দিল। গহনার বাক্সর চাবি খোলার সময় উৎপলাও উপস্থিত ছিল। এখানের কাণ্ড দেখিয়া অসমঞ্জ আর সকলকে লইয়া সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল, শুধু উৎপলা ও অপরেশ কয়টা দিন বিমলের সহিত এই বাড়ীতেই কাটাইতেছে। মস্ত লম্বা ও মোটা গার্ড-চেনের সহিত সংবদ্ধ পূর্ণেন্দুর দ্বিতীয় বিবাহের সোনার ঘড়ি,—যেটা সে দিদিমার শিক্ষামত ইন্দ্রাণীর নিকট পৈত্তার সময় আদায় করিয়াছিল, উৎপলা সেটা লইয়া হাসিতে হাসিতে গলায় পরিয়া নিজের ছোট্ট রূপার ঘড়ি বিমলের বাক্সে ফেলিয়া দিল। এর পর জিনিষ দুটার বদল করার কথা উঠিল না, অশ্বারোহিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী এই মেয়ে যখন কলিকাতা যাত্রা করিল, তখনও উহার গলায় তার পিতার গলার সেই মোটা চেন হারটা ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। বহু দূর পর্য্যন্ত চাহিয়া চাহিয়া অশ্বখুরোত্থিত ধূলির সহিত উহার আরোহীত্রয় দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেলে একটা হৃদয়-ভাবাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস তারার কোমল বক্ষ মথিত করিয়া উঠিয়া আসিল। বেদনাবিদ্ধ চিত্তে সে ভাবিল, —'ঐ মেয়েই হয়ত দাদার বউ হবে! মাগো!—ও কেমন বউ? কেল্লার গোরাকে বিয়ে করলেই চুকে যায়!"—বিমলেন্দু যে ইর্ষ্যাসত্ত্বেও ইহারই সান্নিধ্যহেতু তার দিকে চাহিয়া দেখিতেও অবকাশ পায় নাই, তারা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। তার অবহেলায় সে যত দুঃখ পাইল, তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট বোধ হইল, দাদার এই অদ্ভুত 'কনে' নির্ব্বাচনে! তথাপি সে যে বহুদিন পরে একটিবার দাদাকে চোখের দেখাও দেখিতে পাইল, সে জন্য সে পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিল।

দিনে 'দিনে বিমলের সহায়তা ও সাহসেব খ্যাতি বাড়িয়া চলিল।

ইহাবই কিছুদিন পবে পথ চলিতে চলিতে বার দুই পিছনে কোন শব্দ শুনিয়া অসমঞ্জ নিম্নস্বরে বিমলেন্দুকে বলিল, "আমাদের পিছনে নিশ্চয় কোন লোক লেগেছে!"

বিমলও খানিকটা স্থিব থাকিয়া নির্জ্জন নিরালা পল্লীর ঝিল্লীববমাত্র শুনিতে শুনিতে অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার ভুল।"

অসমঞ্জ আবার দাঁড়াইল। কান খাড়া করিয়া কোন সতর্ক ধ্বনি শ্রবণ চেষ্টায সতর্ক থাকিযা কহিল,—"কিন্তু আজ বারেবারেই বা এমন সন্দেহ হচ্চে কেন?"

বিমল এবাব পূর্ণ অবিশ্বাসে জবাব দিল,—"ও তোমাব মনেব সঙ্কোচ মাত্র। বৃথা সংশযে সময় নষ্ট কেন? যে সব বড কাজের 'আইডিযা' নিযে আমাদেব এ সভার সৃষ্টি,—আজ পর্য্যন্ত তাব কিছুই তো হলো না! এবাব একটা—কি?"

"পথে ওসব কথা নয়! কিন্তু বিমল! একটা কথা ক'দিন ধবে ভাবছি।"

"কি?"

"আমাব এখন মনে হচ্চে, আমরা উল্টো পথে চলেছে। দেশেব কাজ করবার জন্যে এ সুঁড়ি পথ ধরবার দরকাব ছিল না, এখনও আমবা সহজ ও সরল পথেই অগ্রসর হ'তে পাবি।"

ম্লান জ্যোৎস্নায বিমলেন্দুব চোখ নক্ষত্র-দীপ্ত দেখাইল,—"এ পথই বা অ-সরল কিসে? এই পথই বা বিপথ কেন? সহজ পথে দেশের কাজ করা কি আমাদের মতন অধীন জাতির পক্ষে সম্ভব?

অসমঞ্জ ঈষৎ সলজ্জ ঈষৎ অপরাধী ভাবে ধীবে ধীরে কহিল,—"আমরা যা' করতে চাইচি, তা' পাবা কতদূর সম্ভব,—ঈশ্বর জানেন! আমাদের সঞ্চয় নেই, সহায় নেই, কিছুই নেই; অথচ আমরা চাই এক বিরাট কাণ্ড ঘটাতে, তা'তে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা ঠেলতে হবে।—আমরা সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে পার হতে

চাইচি। ভীষণ তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ না হয় করলুম প্রাণপণে,—তবুও কি পার হতে পারবো? তার চেয়ে যদি তীর থেকে—"

বিমল অসহিষ্ণু হইয়া বাধা দিল,—"এসব ভাব-রাজ্যের কল্পনা-কুহক মঞ্জু!—তোমার মুখে সাজে না।"

অসমঞ্জ নীরব রহিল। তার মুখে যে সাজে না, সে কথা সে জানে,—কিন্তু—কিন্তু—হায়, কেন সাজিল না? যদি সে আজ কোন মতে সাধারণ সবারই মত এই কথাগুলাকে তার মুখে শোভন করিয়া তুলিতে পারিত,—যদি পারিত, তবে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তারও জীবনটা যে কতবড় সঙ্কটের মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সফল ও সার্থক হইতে পারিত, সে শুধু আজ সে-ই জানে। তার বুদ্ধি ছিল, শক্তি ছিল, দেশের যথার্থ মঙ্গলের দিকে সে যদি সত্যকার চেষ্টা করিত!

অসমঞ্জকে বিদায় দিয়া বিমল আবার সেই পথে নিজের বাসায় ফিরিয়া চলিল। রাত্রি গভীর, পথের দু' ধারের স্বল্প গৃহের অধিবাসীদের জাগরণ চিহ্ন মিলে না। স্বল্প জ্যোৎস্নায় পর্ণ গৃহগুলা বৃক্ষলতার মধ্যে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ পথ আঁকাবাঁকা, কোথাও বা অকস্মাৎ লুকাইয়া গিয়াছে। একটা বাঁকের মুখে ফিরিতে গিয়া অন্যমনস্ক বিমল সহসা দেখিল, তার পিছনে কেহ আসিতেছিল,—সে যেন তাহাকে থামিতে দেখিয়া পাশের দিকে সরিয়া গেল। সত্য? না ভ্রান্তি? বিমলের মনে হইল,—এ সেই অসমঞ্জর সন্দেহের ফল। অসমঞ্জর কথায় আবার সে গভীর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ভাবিল, সত্যই কি তার মধ্যে এই হেয় দুর্ব্বলতা জাগ্রত হচ্ছে? সেই মঞ্জু, সেই অটল ধৈর্য্য, অসীম সাহস,—সে সব কে' তার দিনে দিনে হরণ করে নিচ্চে? তার চোখের মধ্যে আর সেই বৈদ্যুতিক দ্যুতি নেই, কণ্ঠস্বরে আর তেমন করে সে সম্মোহিত করিতে পারে না, সেই অনবদ্য ঝঙ্কারী হাসিই বা তার গেল কোথায়? দেশ-সেবার সে সব বড় বড় 'প্ল্যানেরই' বা হলো কি?

এখন দেখছি যত রাজ্যের পচা ডোবা ছেঁচা, ভাঙ্গা রাস্তায় তালি জোড়া, পড়ো বাগান সাফ,—এই সব যত ইতুরে কাজকেই সে তার 'কার্য্যসিদ্ধির সোপান' করে তুলেছে। এই উদ্দেশ্যে পাড়াগাঁয়ে ঘুরে লাভের মত লাভ হোল—ম্যালেরিয়া জ্বর! বোধ করি তারই থেকে স্বাস্থ্যের সঙ্গে সাহসও ফুরিয়ে যাচ্ছে!

—"কে ?"

আবার একটা বাঁকের মুখে আসিয়া বড বড় গাছের ছায়ায় প্রায়-অন্ধকারে কোন পশ্চাদাগত ব্যক্তির সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়া গেল। লোকটা বোধ করি উহাকেই অনুসরণ করিতে করিতে অন্ধকারে অদৃশ্য ব্যক্তির অতি-নৈকট্য ঠিক রাখিতে পারে নাই। সে নিরুত্তরে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইতে গেলে সহসা উদিত সংশয়ে বিমলেন্দু তার একটা হাত সজোরে চাপিয়া ধরিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কে' তুমি ?"

ধৃত ব্যক্তি সবলে হস্ত মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে করিতে পকেট হইতে অপর হস্তে কি একটা শীতল-স্পর্শ বস্তু টানিয়া বাহির করিয়াছে, জানা গেল, মুখে সে শব্দোচ্চারণ করিল না। বিমলেন্দুর পা হইতে মাথা অবধি দারুণ শিহরণে শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ শিয়রে শমন লইয়া তার শরীর মন যেন অপরিজ্ঞাত সাহসে বলীয়ান হইয়া উঠিল, মরিয়া হইয়া অজ্ঞাত আততায়ীর হাত হইতে ভীষণ বস্তুটাকে প্রাণান্ত বলে ছিনাইয়া লইয়া—তাহারই বক্ষে কণ্ঠে বা কপালের কাছে নিয়াই লক্ষ্য করিল! একটি নিমেষ মাত্র! ইহারই ভিতর কখন কি ঘটিয়া গেল! একটা বড শব্দ, তার পর অর্দ্ধ-ব্যক্ত আর্ত্তনাদের সঙ্গে লোকটা পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তের আর্ত্তস্বর ভিন্ন আর কোন সাড়া তার পাওয়া গেল না।

একটি মুহূর্ত্ত! কতটুকুই বা সময়? কিন্তু ইহারই মধ্যে কি' না ঘটিতে পারে? একটা নিষ্কলুষিত জীবন এতটুকু একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে চিরদিনের মত নরহত্যার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া গেল! এই অভিশপ্ত মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের জীবনের

স্বাদ এ জন্মে এ' কি আর কখন ফিরিয়া পাইবে? যে জীবনটাকে এই অশুভ মুহূর্ত্ত গ্রাস কবিল, সে তো নিত্যই কত হয, কিন্তু এ যে নিজেরও অজ্ঞাতে নর-হত্যাপরাধে অপরাধী হইয়া বহিল,—আর কি মনের শান্তি সে ফিরিয়া পাইবে?

* * পবদিন সংবাদপত্রে বড় বড অক্ষরে বাহিব হইল:—"পুলিশ খুন! —শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্ত, সি আই-ডিব একজন ইন্‌সপেক্টব গত রাত্রে… বাস্তার উপব কোন গুপ্ত-হত্যাকাবীব হস্তে নিহত হইযাছে। লোকটি পুলিশ-বিভাগে অল্পকাল প্রবিষ্ট হইলেও ইতোমধ্যেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিল। এক নূতন এনার্কীষ্ট দলেব অনুসন্ধানে এইব্যক্তি নিবত ছিল, সম্ভবতঃ সেই দলেরই কোন ব্যক্তিব দ্বাবা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অসমঞ্জব মনে যে পরিবর্ত্তনেব হাওযা বহিতেছে, এ সংবাদ লোক মুখে বাষ্ট্র না হইলেও সকলেরই মনে এ সংবাদটা উহ্য ছিল না, যেহেতু সেটা সুস্পষ্ট! অসমঞ্জই ছিল তাদের দলপতি, তাদেব সঞ্জীবনী-সভার সঞ্জীবনশক্তি, অথচ ইদানীং সে যেন দলছাডা হইযা পডিয়াছে! কোথা যায, কোথা থাকে,—কি করে কিছুই তার জানা যায় না।—মধ্যে মধ্যে কাহাকেও খবর না দিযা নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ে,—দু'চার দিন বাড়ীব লোকের দুর্ভাবনাব অন্ত থাকে না। কখনও জ্বর লইয়া ফিরিয়া দিন পনর বিছানা লয। জিজ্ঞাসা করিলে কখনও হাসে,—কখনও কোন পাড়াগাঁয়ের পচা ডোবার পঙ্কোদ্ধারকার্য্যের ইতি-

হাস শুনায়। একদিন বড় বেশী রাগ করিয়া উৎপলা তাহাকে কঠিন কণ্ঠে কহিল, "যদি পচা ডোবাতেই লাভের আশাকে ডুবিয়ে মারবে, তবে এত আশা দিয়ে এ পথে অন্যদের টেনে এনেছিলে কেন?"

অসমঞ্জর মনে এর যে জবাব তৈরি ছিল, সে তার বিচার-কর্ত্রী নিজের হাতে গড়া ছোট বোনের মুখের উপর কোন মতেই সেকথা মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। বাস্তবিকই এ হিসাবে তার যে অপরাধের সীমা হয় না! নিজের পথে একদিন সে অপরকেও গভীর প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া টানিয়া আনিয়াছে। নিজের হাতে তাদের মুখে ফেনিল তাজা মাদকের পাত্র তুলিয়া ধরিয়াছে, আজ নিজের নেশা তার ছুটিতে পাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে সবারই ছুটিবে,—তেমন আশা করিবে কি করিয়া? একজন লোক—হয় ত বিভিন্ন মার্গে সমান অটল থাকিতে সমর্থ, কিন্তু সকলের মধ্যে সেই একই শক্তি তো বর্ত্তমান থাকে না, অসমঞ্জ দেশ-হিতের যে আদর্শকে এযাবৎ অন্তরের পূজা দিয়া আসিয়াছে,—কোন্ গৌরবান্বিত গুরু-মন্ত্রে সে আদর্শ আজ তার খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে,—দেশের প্রকৃত পূজা নাকি দরিদ্র-নারায়ণের সেবাতেই এইমত সে গ্রহণ করিয়াছে এবং এই মন্ত্র সে তার স্বহস্ত-নির্ম্মিত শিষ্য-বর্গের কর্ণেও ঢালিতে চায়, কিন্তু না,—নিজেকে এত দিন সে যাহা ভাবিত, বাস্তবিক ত'তো শক্তি তার মধ্যে নাই। এই সব তরুণ চিত্ত মন্থন পূর্ব্বক যে হলাহল সে তুলিয়াছে,—আজ তাহাকে অমৃতে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কোথা হইতে সে মৃত্যুঞ্জয় শক্তি আহরণ করিবে? যাহাতে—অ-নৃত ও অমৃতে পরিবর্ত্তিত হয়?—অসমঞ্জর সারা চিত্ত অনুতাপের অগ্নিতে পুড়িতে লাগিল। যে সংহারাস্ত্র সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছে, এখন তাহাকে সংহরণ করিবার সামর্থ্য তার কই?—তবে কি নিজের ভুল বুঝিয়াও সে গড্ডলিকা-প্রবাহের মত স্রোতের মুখে ভাসিয়া এবং ভাসাইয়াই যাইবে? অকূলে অনির্দ্দেশভাবে ভাসিয়াই কি তাদের জীবনের রাত্রি দেখা দিবে? এর কি বিশ্রাম ঘটিবে না?

অবকাশ জুটিবে না ? শুধু স্রোতের মুখে কুটার মতই ভাসিয়া চলাতেই শেষ ? তীরে উঠিবার, তীরে তুলিবার উপায় কি নাই ? সে চেষ্টা কি অনুচিত ?

একদিন তার এই সমস্যার কথা সে তার গুরুর নিকট উত্থাপন করিল। রুগ্ন ও বৃদ্ধ রামদয়াল বহুদিন যাবৎ শয্যাশ্রিত। অতি কষ্টে দু' একটা বালিশ ঠেশ দিয়া একটু একটু বসিতে পারেন। তিনি তাঁর এই সংশয়াচ্ছন্ন দুশ্চিন্তা-পীড়িত ভক্তটিকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"সে কি কথা !—দেখ অসমঞ্জ ! ভুল হওয়াটা মানুষের পক্ষে বিচিত্র নয় ; বরং নানা মত এবং নানা পথ থাকাতে ভুল না হওয়াটাই আশ্চর্য্য ! তা ভিন্ন,—ভুল কি, আর ঠিক কোন্‌টা,—তারই বা আমরা কতটুকু বুঝি ? তবে কথা হচ্চে এই, যে কাজটা আমরা করবো, সেটার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের যাচাই করে নে'বার নিক্তি এইটুকুই যে সে কাজটার ফলে আমার বিবেক, আমার বুদ্ধি কোথাও কোনও আঘাত পাচ্চে কি না, বিচার করে দেখা। মাথার উপর বসে যিনি সবই দেখচেন, তাঁর সঙ্গে আমার যখন চোখো-চোখি হবে, তখন আমায় চোখ নামাতে হবে না ত ?—এইটুকুই স্মরণ রাখা !—এর চেয়ে কঠিন সমস্যা আমার মতে আর কিছুই নয়। আর এককথা মতই বা তুমি বদলাচ্চো কই ? তোমার প্রতিজ্ঞা দেশের সেবা করা। সে প্রতিজ্ঞা তোমার ভাঙ্গছে না তো ! তখন কতকগুলো বড় বড় 'আইডিয়ার' পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে,—এ ছাড়া আর কি বলি বলো,—জার্ম্মাণরা তাদের অপরিসীম শক্তি, অর্থ, অমানুষিক উদ্যম ও অপরিমিত আয়োজন নিয়ে যেখানে ব্যর্থ হলো, সেইখানে তোমরা ক'টা ছেলেয় মিলে ওদের কাছে চুরি করা রিভলবার-কার্টিজের জোরে স্বাধীনতা আদায় করবে,—এ'ও কি হয় ? এখনই বরং তুমি দেশের প্রকৃত সেবা আরম্ভ করেছ। নিজের হাতে পাঁক ঘেঁটে চল্লিশজন ভদ্র-সন্তানে যে কুমোর-পাড়ার পচা পুকুরটা উদ্ধার করলে, নতুন তক্‌তকে জল পেয়ে অন্ততঃ হাজারো লোক তোমাদের এই যে মন খুলে আশীর্ব্বাদটা করচে, আজ এর সাড়া কি তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছোয় নি

মনে. করো? না,—বাবা!—যে কাজে মনুষ্যত্ব জাগে, ঈশ্বরও জেগে উঠেন তা'তেই। মানুষের অন্তরেই যে তিনি আছেন। মানুষকে যখন তাঁর থাকার গৌরব করতে দেখেন, তখনই প্রীত হ'ন। এই পথ—সরল—সত্য ও ন্যায়ের পথ। দৃঢ়তার, নিষ্ঠার, উদ্যমের পথ, এরই শেষে সাফল্য,—এরই পুরস্কারে স্বরাজ। দেশ-রক্ষা ভিন্ন, দেশ-সেবা ভিন্ন, দেশ উদ্ধার হয় না। দেশের রোগ দূর করো, দেশের হৃত-স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনো,—আর কিছু না পারো, এরই জন্য প্রাণপাত করে যাও।—এই মন্ত্রে দীক্ষা নাও, এই মন্ত্রে দীক্ষিত করো। 'অকাল-মৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনং'—এই বিষ্ণু-পাদোদক সকলকে প্রাণ খুলে পান করাও,—দেশের প্রকৃত সেবা করা হবে। রোগে, শোকে, মৃত্যুতে জর্জ্জরিত হয়ে রয়েছে যে দেশ, তার সঙ্গে কি প্রতারণা চলে,—না সে অপব্যয়ের অবসর আর আছে?"

অসমঞ্জ কহে,—"সে তো আমি নিজে এখন বুঝ্ছি, কিন্তু মনে করুন,—যাদের এই ভ্রমের মধ্যে আমিই একদা ভুল বুঝিয়ে টেনে এনেছি,—তারা যদি এ পথ থেকে ফিরতে না চায়?—এখন তো আর তাদের আমি ত্যাগ করতেও পারি নে'।"

রামদয়াল কহিলেন, "ত্যাগ বা গ্রহণের কথা এর মধ্যে নেই। ভ্রম জেনেও সেই ভ্রান্তির মধ্যে বিচরণ করা শুধু পাপ নয়,—মহাপাপ! ভুল বলে যখন বুঝতেই পেরেছ, তখন নিজে সেই ভুল পথ থেকে সরে এসে অপর পথিকদেরও ফেরবার জন্য যতটা সাধ্য চেষ্টা করতে ছাড়বে না। তা'তেও যদি না পারো নিরুপায়!—কিন্তু তাই বলে নিজেও তো আর তাদের সঙ্গে ভ্রান্তি-কুহকে ফিরে যেতে পার না, যখন তাকে মরীচিকা বলে টেরই পেয়েছ!"

অসমঞ্জ অপরিসীম আগ্রহভরে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "ফিরে যেতে পারি না?"

রামদয়াল কহিলেন—"না!"

অসমঞ্জ তাঁর পায়ের ধূলা লইল। তাব পর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন পূর্ব্বক পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু আমাদের যে শপথ আছে।"

রামদয়াল মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"কি শপথ আছে? কেউ বিশ্বাসঘাতক হবে না, বা দেশহিতৈষণা ত্যাগ করবে না—এই সব তো? না আরও কিছু? তাই যদি হয়, তবে গলদ কোথায? বিশ্বাসঘাতকতা কারু সম্বন্ধে তা' কি সভা-ভুক্ত, কি অ ভুক্ত—কোনদিনই কারু করে কাজ নেই। আর দেশের এবং দশের হিতৈষী কাযমনোবাক্যে হযে সেই শপথকে সার্থক করে যেন তুলতে পারো,—এই বলে আবাব একটা নূতন শপথ বরং কবে ফেল।—মিহি ধুতি ছেড়ে মোটা পবো, তুলাব চাষ, আখেব চাষ যাতে বাড়ে, ঘবে ঘরে মেয়েরা বিবিযানি ছেড়ে মোটা সাড়ী ধবে, তাঁতি-জোলাব ছেলেরা কেরাণীগিরি ফেলে তাঁত বোনে, বদ্দিব ছেলে জাত-ব্যবসা বজায রাখতে চেষ্টা করে,—মকরধ্বজে স্বর্ণ-ভস্ম দিতে শুধু-ভস্ম না ঢালে,—এই সব দিকে সজাগ দৃষ্টি ও সতেজ চিত্ত দাও এবং দেওযাতে চেষ্টা কবো, —দেশ ধন্যা এবং জননী কৃতার্থা হবেন।—ওমা ইন্দু! অনেক বেলা হযে গেছে যে মা!—অসমঞ্জকে একটু জলটল খেতে দিলে না?"

অসমঞ্জ মৃদু স্বরে কি বলিতে গিয়া থামিল। গবীবের ঘরের এই সাত্বিক দান তার যে বডই লোভনীয়।

খাবারের আসনেব কাছে বসিযা ইন্দ্রাণী সযত্নে তাহাকে পাখার বাতাস দিতে দিতে বলিল,—"এবার কিন্তু একদিন তোমার বোনটিকে নিযে এসো বাবা! এ তো তোমার নিজের দেশ,—মধ্যে মধ্যে এলে গেলেই তো হয়।"

অসমঞ্জ অন্তরের সহিত সায দিযা কহিল, "আমারও ইচ্ছা আছে। পল্লী-জীবনের আরাম কেনই যে আমরা ত্যাগ করেছি! আমার খুবই সাধ পলা আপনাদের সঙ্গে মিশতে সুযোগ পায়।"

কিন্তু সে সুযোগ মিলিল না। পাড়াগাঁয় যাইবার প্রস্তাবেই উৎপলা

শিহরিয়া মুখ ফিরাইল। "বাপ্‌স্‌! তোমাব মতন ম্যালেরিযা জর ঘাড়ে কবে এনে ঘাড ভেঙ্গে পড়ে থাকি আব কি। ছোড়দাব দিনকের দিন কি পছন্দরই শ্রী হচ্চে!"

অসমঞ্জ সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "সেখানে একজনবা আছেন, এত ভদ্র ও শিক্ষিত সেই পরিবারটি, সে তোকে কি বল্‌বো! আমার ইচ্ছা করে, তাদের তুই একবারও অন্ততঃ দেখিস্‌।"

উৎপলা সকোপ অবজ্ঞায় ঠোঁট ফুলাইযা জবাব দিল, "তারাই তোমার মাথা খাচ্চে, তা' আমি বুঝতে পেরেছি।—একজনেরই থাক্‌,—আমার শুদ্ধু আর খেয়ে কাজ নেই!"

ভাই বোনে এখন এম্‌নি করিযাই আলাপ চলে। একদিন—একদিন কেন, এত দিন উৎপলা ছিল অসমঞ্জর ছায়ার মত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

তারার বযস ষোড়শোত্তীর্ণ হইলেও তার যখন বিবাহ দিতে পাবা গেল না, ইন্দ্রাণী বিশেষ ভাবনায় পড়িল। পিতা বৃদ্ধ রোগজীর্ণ; কবে আছেন, কবে নাই,—বাড়ীতে দুটি বিধবা এবং একটি অনূঢা বয়স্থা কন্যা। ইন্দ্রাণী ভাবে, মেয়েটা যদি একটু কুৎসিত হইত, না হয় আইবুড়ই রাখিতাম।—এ মেযের দিকে যে বড় শীঘ্র নজর পড়ে,—এও যে এক বিষম জ্বালা! পুরুষ অভিভাবক নাই, বিমলের ঠিকানা অজানা। এব উপর অমৃতের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যু ঘটনায় ইন্দ্রাণীর মনে কি ভীষণ আতঙ্কই যে জমিয়া আছে সে শুধু সে-ই

জানে! সেই অবধি ভরসা করিয়া সে বিমলের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে পারে না,—পাছে কেহ একটা ভয়াবহ সংবাদ দিয়া ফেলে! খবরের কাগজ দেখিলেই তার বুকে যেন ঢেঁকীর ঘা পড়ে। এমন করিয়া দারুণ দুশ্চিন্তায় মাস কয়েক কাটাইয়া একদিন কা'র মুখে যেন শুনিল, বিমল এখন তার পৈতৃক-ভিটায় বাস করিতেছে। শুনিয়া অনেক দিন পরে ইন্দ্রাণীর দু'চোখ ভরিয়া আনন্দাশ্রু উথলিয়া উঠিল।

প্রতিবেশীর সাহায্যে তারার জন্য একটি পাত্র স্থির করিয়া ইন্দ্রাণী বিমলকে বিবাহের জন্য হাজার কয়েক টাকা চাহিয়া পত্র লিখিল। ক্রমে এক-খানার পর দুইখানা পত্র লিখিয়াও তার নিরুত্তরতা নষ্ট করিতে না পারায় একদিন নিজেই তার কাছে উপস্থিত হইল।

বাড়ীখানা ইতিপূর্ব্বে পতনোন্মুখ হইয়াছিল। ইন্দ্রাণী দেখিয়া প্রীত হইল সম্পূর্ণরূপে মেরামত না হইলেও আপাত রক্ষা করে বিমল কতকটা চেষ্টা করিয়াছে। অশত্থ-বটগুলা উৎপাটিত ও দেওয়ালে প্রাচীরে দাগরাজী, ভগ্ন-কবাটে জোড়া লাগান,—আজ যেন এই পরিত্যক্ত, অনাদৃত গৃহের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই বোধ হইল।

ক্ষ্যান্তি ঝি এ বাড়ীতে আজও পড়িয়া আছে। তার মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে, গলার স্বরও মৃদু হইয়াছে, তা' ভিন্ন সুর চড়াইবার প্রয়োজনও তো আর হয় না। এই অভাবটাই কিন্তু এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রাণীর যেন আশ্চর্য্য ঠেকিল। পূর্ব্বের কথা বাদই যাক, ইদানীংও যখনই সে এ বাড়ী ঢুকিয়াছে একলা বাড়ীতে বসিয়া মঙ্গলাদেবীকে বোধ করি কোন অলক্ষ্য গৃহ দেবতা বা অপদেবতাকে সাক্ষ্য রাখিয়া আপন মনে চড়া গলায় গালি দিতে শুনিতে শুনিতেই ঢুকিয়াছে,—"হে ঠাকুর! হে ঠাকুর! আমার বুকে শেল বিঁধে আমার দুখেকে যে বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে,—তার বুকে যেন সত্যি-কারের শেল বেঁধে! হে মা কালি!—যেদিন এই কান দুটো দে' শুনবো, যে,—

পুঁটে পোড়ারমুখো মুখে রক্ত উঠে মরেচে,—সেইদিন তোমায জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব মা।"—সেদিনেবই মত সর্ব্বাঙ্গে শিহরিযা উঠিয়া ইন্দ্রাণীর আজও সেই ভয়াবহ অভিশাপ বাণী গুলাই মনে পড়িল,—উঃ পিতৃস্বসার সেই নির্ম্মম অভিশাপই কি হতভাগ্যের জীবনে সফল হইল?! মা কালী পূজা পা'ন না' পা'ন,—বক্ষে ভগবানই জানেন কা'ব হাতেব অব্যর্থ-শেলাহত হইযা তার জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গেল!—অমৃতেব কথা স্মবণ করিতে ইন্দ্রাণীব চোখ দিযা অনেকবাব জল পডিযাছে। সে যাই হোক,—তবু সে তাদেব আত্মীয। এক দিন হয় ত তাহাকে সে শ্রদ্ধাও করিযাছিল। বিমলের অপকার করিলেও উপকারও তার সে নিতান্ত কম করে নাই!—তাবপব সেই তারাকে চাওযা, সে কথাও ইন্দ্রাণী ভুলিতে পাবে না। লোক সে যত মন্দ হোক, তবু তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির-চক্ষে সে দেখিয়াছিল। আব তা' না হলেও সে একটা মানুষ তো!—অমন কবিযা মরা,—এ যে একটা জন্তুব পক্ষেও শোচনীয।

ক্ষ্যান্তি বলিল "এইবাবে মহাপাতকেব তো শাস্তি হযেচে, বৌমা!—ছেলে-মেযের বে'থা দিযে এবাব নিজের ঘবে এসে ঘর করোসে' মা! তা' হ্যাগা, আমাব তারাদিদি আসে নি কেনে গা? তাঁকে যে দেখচি নে'?"

"তাকে বাবার কাছে রেখে আসতে হলো যে মাসি! বিমল কোথায় গা?"

ঝি বলিল, "বোধ করি ঘরেই আছেন। এসো বৌমা! হাতে মুখে একটু জল খাওসে'। তোমার হেঁসেল ঘরে ততক্ষণ বান্নাব উয্যগ করে' দিই,—তুমি চান করে রান্না চাপাও।"

ইন্দ্রাণী ক্লান্ত স্বরে কহিল, "রান্না এখন থাক্,—শরীরটা বিশেষ ভাল নেই,—আগে বিমলের কাছ থেকে আসি, তার পর যা' হয় হবে'খন।"—বলিয়া সে বিমলের ঘরের দিকে অভ্যাস প্রযুক্ত অগ্রসর হইতে গেলে ক্ষ্যান্তি বলিয়া উঠিল, "ও ঘবে নয বৌমা। দাদাবাবু এখন তোমার শোবার ঘরে বসে। তা' হ্যাগা মা! আমার তারাদিদির বে' কবে দেবে গা! এইখেনেই তো হবে?"

ইন্দ্রাণী এ প্রশ্নের উত্তর ঈষৎ মাত্র হাস্যে সমাধা করিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই ঘরে,—তার সেই চিরপরিচিত গৃহে—আজ আর চির-দিনের সেসব গৃহসজ্জা ছিল না। জোড়া খাটের পরিবর্ত্তে লিখিবার টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। কাঁচের আলমারিটা আছে কিন্তু ইন্দ্রাণীর সহস্র টুকিটাকি সৌখীন বস্তুর ভাণ্ডার তাহাতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে বৈদেশিক বিশেষ গ্রন্থাবলী নিজ নিজ আভ্যন্তরিক তীব্র-তাপ বর্ণাবরণে ঢাকিয়া সেখানে শোভা পাইতেছে। ইন্দ্রাণীর বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেই সযত্নে সে উহাকে নিরোধ পূর্ব্বক ডাকিল, "বিমল!"

ইন্দ্রাণী আসিয়াছেন, বিমল বোধ করি সংবাদ পাইয়াছিল এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহাও তার অপরিজ্ঞাত নয়। সে এই সাক্ষাতের জন্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই বসিয়াছিল। হাতে যে পুস্তক ছিল, তাহা হইতে দৃষ্টি না তুলিয়া উত্তর দিল, "উ?"

ইন্দ্রাণী মুহূর্ত্ত কাল বিস্মিত নেত্রে পাঠশীল স্থিরমূর্ত্তি তরুণের মুখের অপরি-বর্ত্তিত, অবিচলিত রেখা পর্য্যবেক্ষণ করিল। তারপর একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া তার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, "আজ আট বছর হয়ে গেল,—এখান থেকে একটি পয়সাও পাই নি বিমল! কোনমতে চালাচ্চি; কিন্তু তারার বিয়ে তো দিতেই হবে,—চার হাজার টাকা আমার চাই। অনেক চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু এর কমে কোথাও পেলুম না।"

পুস্তকের পঠিত পত্রখানা উল্টাইয়া নূতন পাতায় চোখ রাখিয়া বিমল কহিল, "চার হাজার টাকা তোমায় কোথা থেকে দেবো?"

ইন্দ্রাণী শান্ত স্বরে কহিল, "আমার অংশ থেকে।"

মুহূর্ত্ত কালের জন্য চোখের দৃষ্টি সেই অগ্নিগর্ভ পুস্তিকার উপর হইতে উঠাইয়া বিমলেন্দু ইন্দ্রাণীর মুখের উপর স্থাপন করিল; স্থির স্বরে কহিল, "তোমার অংশ? সে তো তুমি আমায় ছেড়ে দিয়ে গেছ।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে স্থিতধী ইন্দ্রাণীও যেন বিমূঢ় হইয়া গেল। বিহ্বলের ন্যায় ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া আত্মসংবৃত্ত হইয়া ধীর কণ্ঠে কহিল, "তা'হলে তোমার বোনটির বিয়ে তুমিই দিয়ে দাও।"

বিমলেন্দু কহিল, "আমার টাকা নেই।"

ইন্দ্রাণী কহিল, "তা'হলে—"

বিমলেন্দু অনায়াসে উত্তর দিল, "তা'হলে—নালিশ করা ভিন্ন উপায় দেখি না।"

দেশলাইয়ের এতটুকু কাঠি চাপিয়া ঘষিলে তাহা হইতে মুহূর্ত্তে যেমন আগুন ঠিক্‌রাইয়া উঠে, ইন্দ্রাণীর শান্ত নেত্র তেম্‌নি করিয়া নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল। বারেক সেই অগ্নিময় দৃষ্টি দিয়া সে সেই পাষাণ-প্রশান্ত মুখখানা দর্শন করিল, তার পর বেদনাপূর্ণ দৃঢ় স্বরে কহিল, "পয়সার জন্যে তোমার সঙ্গে মামলা আমি কর্ব্বো না। তা' করলে সঙ্গতিপন্নের স্ত্রী হয়েও এতকাল ধরে আমি পথের কাঙ্গাল হয়ে বেড়াতুম না! যা' করিনি, তা' কোন কিছুর জন্যেই করবো না,—কিন্তু বিমল, তোমার জন্যই ভাবছি!—আমি না হয় তোমায় আজও ক্ষমা করেই ফিরে যাব,—কিন্তু ভয় হয় ঈশ্বর এত বড় ভুল তোমার ক্ষমা করতে পারবেন তো? আজ তুমি যে কত বড় অন্যায় করলে ওই রাশি রাশি সোস্যালিজম্, এনার্কীজমের বইপড়া মাথায় সে তুমি ধারণা করতেও পারবে না!"

এই বলিয়া,—আর কিছু না বলিয়াই ইন্দ্রাণী দ্বারের কাছে আসিয়া আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।—অত্যন্ত ব্যথিত,—অতিশয় স্নেহপূর্ণ, একান্ত করুণা-শীতল কণ্ঠে কহিল, "যে দিন এ বাড়ীতে প্রথম এসেছিলুম,—বিমু! স্বামীকে চিনি নি, কিন্তু তখন থেকেই উদ্দেশ্য ছিল, তোমায় 'মা' হবো। তুমি কোন দিন আমায় মা বলে মনে করবার সুযোগ পাও নি সত্য; কিন্তু আমার সেই প্রথম দিনের স্নেহ চিরদিনই অফুরন্ত হয়ে তোমায় ঘিরে আছে,—

আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই তোমায় ক্ষমা করে যাচ্চি, বাবা!—তাই ভরসা হচ্চে ঈশ্বরও হয় ত তোমায় ক্ষমা কর্ব্বেন!—নিরাপদে দীর্ঘজীবী হয়ে আমার স্বামীর বংশ উজ্জ্বল করে থেকো।"

ইন্দ্রাণী চলিয়া গেলেও বিমলেন্দু বহুক্ষণ পুস্তক পাঠের ভান করিয়া রহিল, কিন্তু একবর্ণও সে আর পড়িতে পারিল না। ইন্দ্রাণীর সেই অগ্নিশিখার ন্যায় তপস্যা-দীপ্ত মূর্ত্তি,—তাঁর সেই কয়টি তেজঃ-পূর্ণ স্নেহ-গর্ভ বাণী ভ্রূকুটি করিয়া তাড়ান গেল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই আহত মাতৃহৃদয়-ফাটিয়া পড়া শোণিতবিন্দু কয়টা মানসনেত্রে রক্তের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। একবার মনে হইল, উঠিয়া গিয়া ইন্দ্রাণীকে ডাকিয়া আনে,—ডাকিয়া আনিয়া নিজের জটিল জীবনের গোপন কথা তাঁহাকে সমুদয় জানায়। তার এই বিপাক-গ্রস্ত দ্বন্দ্বময় জীবনই যে তাঁকে এতবড় অবমাননা করার অংশতঃ মূল, ইহা জানাইতে পারিলেও যেন অনেকখানি স্বস্তি পাইত,—এমনও দুর্ব্বলতা মনের মধ্যে উচ্চকিত হইয়া উঠিল।—কিন্তু না, কিসের দ্বিধা? বিমাতার স্বামীর ধনে কিসের অধিকার? 'পিণ্ডং দত্বা ধনং হরেৎ'—পুত্র পিণ্ডাধিকারী, সেই পিতৃধনের যথার্থ অধিকার পাইবে, পিণ্ড দিক না দিক, পুত্রই পিতৃ-ধন গ্রহণ করিবে। পুত্র বর্ত্তমানে পুনর্ব্বিবাহে পিতার কি অধিকার ছিল? শাস্ত্রে নাকি দ্বিতীয় বিবাহকে কামজ বিবাহ বলা হয়। আর বৈমাত্র ভগ্নির বিবাহ? সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বিবাহ একটা অনাবশ্যক ভারমাত্র! প্রথমতঃ বরপণ দ্বারা সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহায়ক বিপুল বিত্ত অর্থলোলুপ বরকর্ত্তার কোম্পানীর কাগজে নিবদ্ধ হইবে,—দ্বিতীয়তঃ—দেশের কাজের উপযোগী শিক্ষিত যুবক নিজের সুখ স্বার্থ সার করিয়া সংসারে জড়িত হইয়া পড়িবে এবং তার ফলে কতকগুলা অল্পজীবী, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সন্তান দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য বর্দ্ধনার্থ জগতে আসিবে! দেশের বর্ত্তমান দৈন্যের মধ্যে বংশবৃদ্ধি অনাবশ্যক। দেশ স্বাধীন হোক, খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাক্, দুর্ভিক্ষ দূর হউক তখন

বিবাহ করার কথা উঠিবে,—এখন কিছুতেই না। বিবাহ—বিশেষতঃ নবজাগ্রত শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে বিবাহের তৃষ্ণা বজায় থাকিলে দেশকে উদ্ধার করা সম্ভব হইবে? চারি সহস্র টাকা শুধু অপব্যয়ই নয়, স্বীয় জীবনাদর্শের প্রতিকূলতাচরণে ক্ষয় করা!

বিমলেন্দু উঠিল না, নড়িল না, যেমন তেমনি বই খুলিযা বইএব উপর চোখ ফেলিয়া বসিয়া থাকিল। যখন ইন্দ্রাণীর গাড়ীখানা ষ্টেশনেব প্রায অর্দ্ধেক পথ চলিয়া গিযাছে, তখনও তাব মনে কিসের যেন একটা অস্পষ্ট অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়া উহাকে ডাকিযা ফিবাইবার জন্য তাগিদ দিতেছিল। অথবা স্বপক্ষীয যুক্তির সঙ্গে একখানি ছোট্ট মুখের স্মৃতি যেন সহসাই কেমন করিযা জড়াইয়া গিয়াছিল! মেঘঢাকা পড়িলেও বুঝি ক্ষুদ্র তারা এতদিন ধরিযা সেই মেঘান্তবালে লুকাইযা বসিযা ছিল,—কোন দিনই যেন সে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। সেই তারার বিবাহ!—সে যে তার এতটুকু সেই তারাটি! না,—এ—কি সে ভাবিতেছে? দেশ সেবার জন্য উৎসর্গিত দত্ত-সম্পত্তিতে হাত দিবার কি অধিকার আছে তার? বিশেষতঃ যে বিবাহ তাদেব জীবন ব্রতের একান্ত পরিপন্থী! যা, অনুচিত, তা' কি তারার জন্যই অনুষ্ঠিত হইবে? না, না, না।—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অপরেশ, রাধিকা, বিমলেন্দু ও উৎপলা—ক'জনেই বিষম উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক স্বর্ণবণিক চোটাইযা তেজারতি কারবার করিতেছিল,—সুদের দায়ে অনেক অধমর্ণের ভিটা সে মাটী করাইতে ত্রুটি করে নাই, সংসারে তার আপন বলিতে বিশেষ কেহ ছিল না ; ছিল শুধু টাকা। একজনকে সেই বিপুল ধনভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিত্ব দান করা উচিত বোধে পঞ্চাশোর্দ্ধে—প্রায় ঘাটের কোটায় পৌছিয়া এক দ্বাদশ বর্ষস্কার পাণিপীডন সে করিয়া বসিল। এক্ষণে উক্ত ধনী মহাজনটির মৃত্যু ঘটিয়াছে। কৃপণ স্বভাবের জন্য আত্মীয় বিহীন এবং দাস দাসীর সংখ্যা অল্প। গৃহে ষোড়শী নব-বিধবা এবং তারই একাদশ বর্ষীয়া ভগ্নি ও তার পতিমাত্র। বাড়ীখানি পল্লীপ্রান্তে এবং প্রাচীরগুলি ভাঙাচোরা। এমন সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়া সুযুক্তি নহে—এই কথা অসমঞ্জের নাগাল পাইযা তাহাকে উহারা বুঝাইতে চাহিতেছিল। বিমলেন্দুর বাড়ী দুখানি ভিন্ন নগদ টাকা আর কাহারও কিছুই নাই। অসমঞ্জ এ প্রস্তাব প্রথমে হাসিযা উড়াইতে চাহিল। শেষে বলিল, "বিধবার স্ত্রী-ধনে হাত দেওয়া কাপুরুষতা।"

শুনিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল।

বিমল বলিল, "ছলে বলে কার্য্যসিদ্ধি করাতেই তো পৌরুষ! বালিকা বিধবা ওই অতুল ধনসম্পত্তি নিয়ে করবেই বা কি? দশজনে ওকে ঠকিয়ে খাবে। আর কি, ওই টাকার জন্যে ওর ইহ পর দুটি কালই ঝরঝরে হয়ে যেতে পারে! তার চাইতে দেশের কাজে দেশের লোকের রক্ত-শোষা অন্যায়-লব্ধ ধন লাগলে দেশেরও ভাল,—ওদেরও মঙ্গল।"

অসমঞ্জ কহিল, "সুদখোরের টাকাকে যদি অন্যায়-লব্ধ বলো, তা'হলে চুরির টাকাকে কোন্ পর্য্যায়ে দাঁড করাবে ?"

বিমল গরম হইয়া বলিল, "এ দেশের জন্যে নেওয়া,—এতে চুরি হয় না।"

অসমঞ্জ কহিল, "দেশের কাজ দেশবাসীকে রক্ষা করা,—তাদের বিপন্ন করা নয়।"

বিমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "মেয়েটিকে তার সবচেয়ে বড় বিপদ হ'তে উদ্ধার করবার জন্যেই এই পন্থা নে'ওয়া হচ্চে! এতে ধন লালসায় তার উপর কেউ নজর দেবে না।"

অসমঞ্জ হাসিয়া কহিল, "মহা ভুল! স্ত্রীলোকের ধনই একমাত্র তার আপদ নয়! তার রূপ-যৌবনকে তো চুরি করে নিতে পারবে না? তার চাইতে ওকে যদি রক্ষাই করতে চাও,—ওদের মতন দুর্ভাগিনীদের জন্যে একটি নারী-সম্প্রদায় গঠন করো,—তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে এই সব অরক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে সর্ব্বদা মিশবে,—ওদের ধর্ম্মশিক্ষা দেবে, যাদের ধন আছে সেই ধন ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে নিয়োগ করবার প্রবৃত্তি জাগ্রত করে তুলবে, যাদের নেই,—তাদের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ দেখিয়ে দেবে, অর্থাৎ নানাবিধ কার্য্যকরী বিদ্যা দান করবে, তবেই ওদের রক্ষার উপায় হবে।"

বিমল ও উৎপলা একসঙ্গে অসহিষ্ণু হইয়া প্রশ্ন করিল, "অত মেয়ে আমরা পাবো কোথায় ?"

অসমঞ্জ দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবেই জবাব দিল, "সবাই বিয়ে করে করে নিজের নিজের স্ত্রীকে এই কাজটা দিয়ে ফেল্লেই হ'তে পার্ব্বে।"

গৃহমধ্যে যেন অকস্মাৎ বাজ পড়িয়াছে, এম্‌নি স্তম্ভিত থাকিয়া সর্ব্বপ্রথম উৎপলার লজ্জা-ক্ষুব্ধ ও রোষ-কম্পিত বিস্মিত কণ্ঠ বজ্রধ্বনিতে ধ্বনিয়া উঠিল ;—"বিয়ে!—কি বলছ ছোড়্‌দা!"

তাদের বিস্ময় বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়া মুহূর্ত্তে অসমঞ্জের আকর্ণ ললাট রঞ্জিত

হইয়া উঠিল। কেন আজ এ বিস্ময়? আবহমান কালের এই চিরন্তন বিধি প্রতিপালনের কথা তার মুখে উচ্চারিত হইতেই এতগুলি নর-নারী এমন করিয়া যে চম্‌কাইয়া উঠিল,—এদের চিত্তে এ নিগূঢ় বিস্ময়-রসের সৃষ্টি কে' করিয়া রাখিয়াছিল? অসমঞ্জ বুঝিল বড় কঠিন নিগড়েই সে নিজেকে বাঁধিয়াছে! অপরিসীম লজ্জাক্ষোভ যথাসাধ্য দমনে রাখিয়া বাহ্যঔদাস্যে কথা কহিল,—বলিল; "বিয়ে না করলে কতকগুলো কমবয়সী ছেলের দলে কতকগুলো মেয়ে এনে জোটাবি কোথা থেকে বল্ তো? অথচ এ একটা খুব বড় কাজ করবার বলেছে।—কত বড় বড় রাণী মহারাণী কত ছোট বড় জমিদার ঘরানা,—বাংলা বেহার-উড়িষ্যার সর্ব্বদাই এই রকম একটা সাহায্যের অভাবে মন্দ লোকের প্রলোভন পড়ে, নিজেদের ও দু'টো বংশেরও সর্ব্বনাশ করে ফেলছে! বিমল এটা ধরেছে ঠিক, কিন্তু পথটা খুঁজে পায় নি!"

বিমল কহিয়া উঠিল,—"ভুল তুমিই করছো!—ধর্ম্মোপদেশের অভাবেই যে মানুষ বিগড়ে যায় তা' স্বপ্নেও ভেবো না। উপদেষ্টার অভাব সংসারে একটুও নেই,—অভাব উপদেশগুলো কাজে লাগবার। 'অধ্যয়ন অধ্যাপন নহে বে দুষ্কর,—দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত'—কোন্ ছোট বেলাই ত পড়ার বইয়ে পড়েছি।—ও সব মিথ্যা জল্পনা রেখে দাও মঞ্জু। ও মোষ্ট আন্‌প্র্যাকটিক্যাল,—ও'তে এক কড়ার কিছুই হবে না। অপরেশ ভাল করে জেনে এসেছে,—ওদের শোবার ঘরের আয়রণচেষ্টে নগদ সাতাশ হাজার টাকা মজুদ আছে।—তা' ভিন্ন বন্ধকী ও নিজস্ব গহনাপত্রও না কি দশ হাজারের কম হবে না। বাড়ীতে ঐ ভগ্নীপতি,—সেটাও টিংটিঙে পিলে রুগী, দু'টো ঝি, আর একটা মালি থাকে,—এমন সুযোগ পাবে কোথায়?"

অসমঞ্জ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিল। নিজের শেখানো মন্ত্রের বিরুদ্ধে তার স্বহস্ত গঠিত শিষ্যদের সঙ্গে তর্ক করিতে যত লজ্জা ততই অপমান বোধ হইতেছিল। এ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করা যায় না।—অথচ স্বহস্ত রোপিত বিষবৃক্ষ

তাকে নিজহস্তেই যে উৎপাটিত করিতে হইবে। মনে বল সংগ্রহ করিয়া পুনশ্চ কহিল, "অনেক ভেবে দেখেছি বিমু!—এ সব 'আইডিয়া'গুলো আমাদের পক্ষে ঠিক নয়! যে পথে আমরা চল্‌তে চেয়েছি সে পথ,—যেখানে আমরা যেতে চাই তার ঠিক উল্টো। দেশমাতাকে পূজা দিতে হ'লে দেশবাসীকে অর্চ্চনা করতেই হবে। তা' ভিন্ন দেশ-সেবক হ'বার অন্য পথ নেই!—সব্বার সঙ্গে মিশতে হবে,—গ্রামের স্বাস্থ্য, গ্রামের শ্রী ফিরিয়ে দিতে হবে, নিরক্ষর চাষা, ঘৃণ্য পশুর মত পরিত্যক্ত অনাচরণীয় ও আদিম জাতিদের অবস্থা ফিরাতে হবে, তাদের মনে দেশভক্তির স্রোত ব'হাতে হবে,—সে কি এরকম অত্যাচার দিয়ে হয়?—এই পথই মুক্তির পথ,—এই পথেই আমাদের চলতে হবে।"

বিমল আসন ছাড়িয়া উঠিয়া উচ্চ কম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "ছি! ছি!—অসমঞ্জ রায়! এই তোমার পৌরুষ?—অন্ধের মত এরই পূজো করে এসেছি আমরা। তুমি যে সব ছেলেভুলান ছড়া কাটছো, মার পেট থেকে পড়ে অবধি সব্বাই—না-হোক হাজারো বার শুনেছে! ওর নাম শুধু পর নয়,—আত্মপ্রতারণা। ক'জন বড় বড় বিদ্বান্ লোকে ভাল ভাল চাকরীর মায়া ত্যাগ করে, শেষ পর্য্যন্ত নাইটস্কুলে চাষা পড়ান, আর পল্লী-প্রীতি বজায় রেখে চল্‌তে পারলেন দৃষ্টান্ত দেখাও তো?"

অসমঞ্জ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আমরাই তো এর দৃষ্টান্ত হ'তে পারি। অনেকেই পারে নি বলেই তো সেই পথ ধরা উচিত আমাদের। উত্তর মেরু—দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকেই ফিরে এসেছে; তা'বলে কি আর কেউ যাবে না,—না যাচ্চে না?"

বিমল সরোষে কহিয়া উঠিল, "অসম্ভব! যে পথে চলেচি, এর থেকে এক পা'ও আমরা ফিরবো না! যখন এত দূরে এসে পড়েছি, তখন সোজা চলতে হবে—এ থেকে কেউ ফিরতে পাবে না। আপনি কি বলেন? আপনার কি মত? আমি জোর করে বল্‌চি, এই পথে অটল হয়ে থাকলে আমরা একদিন

এই থেকেই স্বাধীনতা লাভ করবো।—এ দিনের মতই সত্য!"

উৎপলা অসমঞ্জের নত মুখে কঠোর কটাক্ষ করিয়া সশ্রদ্ধ চক্ষে বিমলেন্দুর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত! ছোড়্দা!—তোমার যদি শরীর দুর্ব্বল হয়ে থাকে, দিনকতক কোথাও হাওয়া খেয়ে এস।"

অসমঞ্জর মনে হইল এর চেয়ে তার মাথাটা কাটিয়া লইলেও সহ্য হইত!

উদ্যোগ আয়োজনে দু'তিন দিন কাটিয়া গেল। যে রাত্রে সদ্য বিধবার টাকা লুট করিতে যাওয়ার কথা সে দিন অপরাহ্ণে মেঘ করিয়া তুমুল ঝড় উঠিল এবং সেই প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে অফুরন্ত জলের ধারা প্রকৃতির অফুরন্ত কান্নার মতই ধরণীবক্ষ প্লাবিত করিতে লাগিল। সে রাত্রে সেই চন্দ্রহীনা যামিনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার যেন কিসের একটা ভীষণ সম্ভাবনায় সারা জগতের মুখ লজ্জা-বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল। সেই অকথ্য ও অপরিসীম লজ্জা যেন বিশ্বের প্রাণতন্ত্রীতেও আঘাত জাগাইতে ছাড়ে নাই,—তাই যেন সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিই ক্ষণে ক্ষণে তড়িৎবিকাশে শিহরিয়া সুগভীর দীর্ঘশ্বাস হুহু শব্দে মোচন করিতেছিলেন।

সেই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া আসিয়া বিমল ডাকিল, "মঞ্জু!"

উৎপলা একাই তাদের বসিবার ঘরের ছোট টেবিলটার কাছে নিতান্ত অন্যমনে বসিয়াছিল। বিমলের অতর্কিত আহ্বানে সুস্পষ্ট চমকে চমকিয়া ফিরিয়া বলিল, "আপনি!—এই দুর্য্যোগে?"

বিমল নিজের সলিল-সিক্ততা এবং উৎপলার কণ্ঠের বিস্ময়ধ্বনি গ্রাহ্য না করিয়া মৃদু হাস্যে আবৃত্তি করিল;—

'খেলিতে হইবে মরণ খেলা—
রাত্রি বেলা।'

—কই! মঞ্জু—এরা সব কোথায়?"

অরুণবর্ণ মুখে উৎপলা কহিল, "কেউ আসে নি।"

"মঞ্জু?—মঞ্জু কোথায়?"

প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে পুনশ্চ উৎপলা কহিল, "বাড়ী নেই।"

"তবে?"—বিমল বসিয়া পড়িল। পরক্ষণে যেন ভিতর হইতে কঠিন ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "বেশ! আমি একাই যাবো। দেশের কাজে যা উৎসর্গ করেছি, তা' হস্তচ্যুত হ'তে দেবো না!" ফিরিতে গিয়া পিছনে ব্যগ্র আহ্বান শুনিল, "বিমলেন্দুবাবু!—আমাকেও নিয়ে যান!"

ফিরিয়া দাঁড়াইতে বিদ্যুতের আলোকে এই দুটি তরুণ তরুণীর চোখে চোখে পরিপূর্ণ মিলন ঘটিয়া গেল! হায়,—বিধিবিড়ম্বিত অপূর্ব্ব-সৃষ্ট নর-নারী! এ মিলনে কাহারও চক্ষে অনুরাগের গোলাপীরশ্মি ভাতিয়া উঠিল না,—জাগিল, বিমলেন্দুর দুটি নেত্র ভরিয়া একরাশি বিস্ময়-মিশ্র প্রশংসা,—আর উৎপলার চোখে অসীম উদ্বেগ। বিমলেন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "থাক, আপনার গিয়ে কাজ নেই।"

অচঞ্চল তড়িৎস্ফূর্ত্তির ন্যায় দীপ্ত চোখের তারা বিমলেন্দুর মুখে তুলিয়া ধরিয়া উৎপলা কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, - "হেতু?"

"হাজার হলেও আপনি স্ত্রীলোক।"

উত্তরে উৎপলার ক্ষুদ্র ওষ্ঠ স-ঘৃণ তাচ্ছল্যের হাস্যে ঈষৎমাত্র কুঞ্চিত হইল, "বিমলেন্দুবাবু যে দেখ্‌ছি আজকাল স্ত্রীলোকদের তুচ্ছ করতেও শিখেছেন!"

বিমলেন্দুরও ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, কিন্তু সে হাসিয়া উত্তর করিল, "কি জানি,—যেমন আপনারাই শেখাচ্ছেন।—দেশকেই যদি তুচ্ছ করা চলে, তো মানুষকে করা খুব বিচিত্র না হতেও পারে!"—বিমলেন্দু ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল,—অস্বস্তির প্রতি উৎপলার মনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বাতাস দিয়া জলন্ত করিয়া গেল। আজ যদি সে ভীরুর মত পলাইয়া না থাকিত, আজিকার সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করিয়া বিমল কি তাকে বিদ্রূপের কশাঘাত করিতে পারিত?—সেই তাদেরই হাতে গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা মুখচোরা বিমলেন্দু!—

সমস্ত প্রকৃতিও তখন রোষে ক্ষিপ্ত, অভিমানে আত্মহারা এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্দাম হইয়া উঠিয়া, সারা জগতকে লণ্ডভণ্ড করিতেছিল। বৃষ্টিধারা মূষল প্রহারের মতই প্রচণ্ড আঘাতে ধরণীবক্ষকে চূর্ণিত করিয়া রুদ্র তালে বাজাইতেছিল,—ঝমাঝম্, ঝমাঝম্।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সে রাতে ঝড় জল মাথায় লইয়া বিমলেন্দু মূর্ত্তিমান ঝঞ্ঝার মত তাদের ঈপ্সিত ধন-ভাণ্ডারের দ্বারদেশে অনেক বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া প্রায় মধ্যরাত্রে পৌঁছিয়া দেখিল, সে বাড়ীর সদর দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছে,—আর বাড়ীটার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া স্তব্ধতাপূর্ণ বিরাট অন্ধকার! সেদিন মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অধিবাসীরা যে এখানেই ছিল, তার প্রমাণ বিমলের নিজেরই চক্ষু। এর মধ্যে এই মেঘ ঝড় ও বৃষ্টির ভিতর এরা কোথায় এবং কি জন্য বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল? তবে কি ঐ তালা লাগান একটা ধাপ্পা মাত্র? নিজের চক্ষুকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিয়া বিমলেন্দু প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বাড়ীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল এবং একটা জীর্ণ দ্বারের কব্জা খসাইয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহবাসীদের প্রস্থান সম্বন্ধে একারে কৃতনিশ্চয় হইল। তার মনে আনন্দের তড়িৎ বাহিত হইয়া তাকে কল্পলোকে উন্নীত করিল। এতটুকু চেষ্টাতেই সে এখনই এক বিপুল সম্পত্তির অধিকার লাভ করিবে! এর জন্য কারও কোন ক্ষতি,—এমন কি, কোন প্রাণীর কেশাগ্রটিও স্পর্শ করিতে হইবে না,—ধরা পড়িবার ভয় তো নাইই. এর চেয়ে সহজে কে' কোথায় কোন্ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে? পকেট হইতে বাতি দেশলাই বাহির করিয়া আলো জ্বালিয়া

লইয়া সে দ্বিতলে উঠিয়া গেল। তারপর অপরেশ কর্তৃক বর্ণিত বাড়ীর প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যে ঘরে বিপুল ধন-সম্পদ গর্ভে ধরিয়া লোহার সিন্দুক বিরাজ করিতেছে, সহজেই সে ঘর সে খুঁজিয়া লইল। এইবার একটি মাত্র চিন্তা,—কি উপায়ে কঠিন লৌহগৃহ হইতে ওই বিপুল ধন-সম্ভার সে তার 'দেশের কাজে সঁপিয়া দিবে। অনির্ব্বচনীয় গৌরবানন্দে ও তাহার সহিত মিশ্রিত একটা প্রচ্ছন্ন শঙ্কায় বিমলেন্দুর বক্ষের মধ্যে দুরু দুরু, দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু কি বিস্ময়! গৃহের মধ্যে আলোক-জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইয়া সেই অন্ধকারাবৃত গৃহের যাবতীয় বস্তুজাতকে যেমনই দ্রষ্টার উৎকণ্ঠিত নেত্রে প্রতিভাত করিল, অমনি হতাশামিশ্র আশ্চর্য্যের একটা তীক্ষ্ণ অস্ফুট ধ্বনি তাহার কণ্ঠ চিরিয়া নির্গত হইয়াও পড়িল।—প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকটার ডালা উপরে তোলা, আর তার ঠিক সাম্নেই বিপুল-ভার পিত্তলের তালাটাও আধ হাত মাপের চাবি সমেত মেজের উপর পড়িয়া আছে।

বিমলেন্দুর বুঝিতে বাকি থাকিল না, বৈকাল সন্ধ্যার মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে গৃহবাসিগণ তাদের ভবিষ্য-অভিযান সংবাদ পাইয়া ধনরত্ন সমেত দুর্য্যোগের মধ্যেই বাড়ী ছাড়িয়াছে, সিন্দুকটা বন্ধ করিতেও অবকাশ পায় নাই!—জানিল কিরূপে?

ক্ষোভ ও বিরক্তির চরমে পৌছিয়া ফিরিয়া চলিল। তার এতবড় ও একান্ত নিজস্ব প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল! উৎপলা কি বিশ্বাস করিবে? এই নৈশ-অভিযানকে উপকথায় উপমিত করিয়া যে সে সম্পূর্ণ উপহাসের হাসি হাসিবেই ইহা প্রত্যক্ষ সত্য! অথচ লুকাইয়া রাখাই কি চলিবে?' প্রশ্ন সে এ বিষয়ে করিবে না! তেমন মেয়েই সে নয়!

সাদা রুমালে বাঁধা কি একটা কঠিন বস্তুর উপর পা পড়িল। পদাহত হইয়া শব্দ হইল টাকার আওয়াজের মত। বিমল সেটা কুড়াইয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিতেই প্রকাশ পাইল মাত্র কয়েকটা টাকা ও একখানা দোমড়ান চিঠির

কাগজ। কাগজটাকে নোট মনে করিয়া কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে সেখানার ভাঁজ খুলিতেই সেখান হইতে যেন দুইটা তীক্ষ্ণ তীরের ফলা আসিয়া বিমলের চোখে বিঁধিয়া গেল! বিস্ময়াবেগে হাত হইতে রুমাল শুদ্ধ টাকা ছড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারিল না। কতক্ষণ তেমনই অস্পন্দ থাকিবার পর চিঠিখানা মাত্র লইয়াই সে সেই জনহীন পুরী পরিত্যাগ করিল।

এরই পরদিন সকালে অনিদ্রা ও দুঃস্বপ্নপূর্ণ বাত্রি যাপনান্তে উৎপলা বাহিরে আসিতেই তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল অসমঞ্জেব। উৎপলাকে দেখিয়া অসমঞ্জ যেন একটু অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ঈষৎ একটু হাসি ফুটাইতে সমর্থ হইল। "তাব পর? মিঃ পল! কাল বাত্রের ঝড বৃষ্টিটা লাগলো কেমন?"

উৎপলা স্থির অনুসন্ধিৎসু চক্ষে চাহিয়া প্রতিপ্রশ্ন কবিল, "পবশু থেকে ছিলে কোথায?"

অসমঞ্জের শুষ্ক মুখ এ প্রশ্নে আরও একটু শুকাইযা আসিল। তথাপি সে সচেষ্ট হাসির অন্তবালে ভিতবের সঙ্কোচকে ঢাকা দিতে চাহিয়া বঙ্গ করিযা গাহিল;—"যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে—"

উৎপলাব কণ্ঠে বিরক্তি উথলিযা উঠিল,—"ছোড়দা! হাসি-ঠাট্টার কথা নয়! তোমার ব্যবহার আমরা বুঝতে পাবছি নে', একটু সহজ করে বুঝিয়ে দাও দেখি? কাল সেই যে কাজটায় সব্বার একত্র হ'বার কথা ছিল,—কেন তুমি এলে না?"

"কাল সেই দুর্য্যোগে? পাগল হয়েছিস্!"

"ছোড়দা! যেদিন বিমলেন্দুবাবুকে প্রথম আমাদের বাড়ীতে তুমিই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলে, সেদিনের কথা মনে করে দেখ দেখি?—আর কাল,—কাল তুমি তার পায়ের তলায় পড়ে রইলে,—আর—আর সে অবলীলাক্রমে তোমার মাথার উপরে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। সেই জল-ঝড় সম্পূর্ণ উপেক্ষা

করে অনায়াসেই সে—শুধু তাই নয়—একা অনন্য-সহায় দেশের সেবা করতে গেছে!—আর আজ আমরা কোথায় পড়ে রইলুম ছোড়দা!"

মুহূর্ত্তের জন্য অসমঞ্জের মুখ লজ্জারক্ত হইয়া উঠিয়া পরক্ষণে তাহা পাংশু হইয়া গেল। বড় ক্লান্ত স্বরে সে ধীরে ধীরে কহিল, "পলা! আমি যে আর গোপনতার আড়ালে থেকে দেশের লোকের ক্ষতি দিয়ে এই সফলতার আশাহীন সংশয়ের পথে চলতে পারচিনে ভাই! আমি স্থির করেছি জনসেবা করে এর প্রায়শ্চিত্ত করবো।—"

অসমঞ্জের এই অসমাপ্ত আত্ম-সমর্থনে কি যে সুগভীর বেদনার সকরুণ সুর ধ্বনিয়া উঠিল,—অথচ তা' শুনিয়াও কেমন করিয়াই যে উৎপলা,—তার আজন্মের সাথী তার একান্ত স্নেহের সহোদরা উৎপলা—আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নি-শিখার মতই গর্জ্জিয়া উঠিল, "ধিক্ ছোড়দা!—এ' দুর্গতি হ'বার আগে কেন তুমি মরে গেলে না!"

* * *

উৎপলার মা সারাদিনেও মেয়ের ঘরের দ্বার খোলাইয়া তাহাকে জলগ্রহণ করাইতে না পারিয়া তাঁর নিজ গর্ভের মহাশত্রু এই অনাসৃষ্টি মেয়ের জ্বালা একান্ত অসহ্য বোধ করিতে থাকিলেও এর এতটুকু সদুপায়ও খুঁজিয়া পাইলেন না। মনেমনেই পুড়িতে লাগিলেন। এমন সময় সশরীরে নিজে আসিয়া সেই তাঁকে ডাকিল,—"মা!"

মা মুখ না তুলিয়া ভারী গলায় জবাব দিলেন, "কি?"

"ছোড়দা কোথায়?"

মা চমকিয়া উঠিয়া হাতের কাজে একটু নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন,—মুখে কোন কথাই বলিলেন না। বুকের ভিতরটা তাঁর জোরে জোরে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া পড়িতে লাগিল।

মেযে আবাব ডাকিল, "মা!"

মা বিবক্ত হইয়া উঠিলেন,—"কি বলবে বলোই না ছাই!"

"ছোড়দা কি আজও বাড়ী থেকে চলে গেছে? ঠিক করে বলো মা, সে কোথায যায়? নিশ্চয়ই তুমি সব জানো। তা' নৈলে, বাতেব পর রাত সে বাইরে কাটায,—আব তুমি তাকে কিছু বলো না?"

অসমঞ্জব মা রুষ্ট হইযা বলিলেন, "দেখ্, পলা! ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতন থাক্,—সকল খববে তোব থাকা কেন?—ক্ষিধে পেযে থাকে তো খেতে বোস, খাবাব দিতে বলি।"

উৎপলা কঠিন হইযা থাকিযা কঠোব কণ্ঠে কহিল, "মা! ভাল করচো না। ছোড়দা এই যে চোবেব মতন লুকোচুবি কবে কোথায় কি করচে, আর তা'তে তুমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্চো, এব ফল কিন্তু ভাল হবে না,—তা' তোমায় আমি এই বলে দিচ্চি।"

মা এবাব প্রচণ্ড বোষে ফুঁষিযা উঠিলেন,—সক্রোধে মুখ তুলিযা কহিয়া উঠিলেন,—"সে আমি জানি! তাব ভাল কি আব তোমবা হ'তে দেবে?—যে তুমি তার পেছনে শনি জন্মেছ! মেযেমানুষ যদি তার নিজেব ধর্ম্ম ছাড়ে পলি, তা'হলে সে পুরুষের চেযেও বেযাড়া হয়, এ আমি তোমায় দেখেই হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি! তোমায় যে গর্ভে ধরেছিলুম, তা'তে আমার নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছে!"—

বলিতে বলিতে তাঁর বহু কষ্টে চাপিযা থাকা দুঃখ-সিন্ধু উত্তাল হইয়া উঠিল। অশ্রুজলে ভাসিযা গিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"মঞ্জুর মতন ছেলে কার আছে? তাকে পাঁচ জনে মিলেই না নষ্ট করতে বসেচে। তুই তার ছোট বোন,—কোথায় তাকে বুঝিযে সম্‌জিয়ে সোজা পথে নিয়ে আস্‌বি, তার ভালর চেষ্টা করবি,—তা' না উল্টে তার মার পেটের বোন হযে তুই-ই তাকে টেনে-হিঁচড়ে আরো কাঁটাবনের গভীরের মধ্যে ফেলে দিতে চাস? তুই

মেয়েমানুষ না রাক্ষসী? ধিঙ্গীপনার তো অন্ত রাখ নি,—আমি তো কখন সাতে-পাঁচে কথাই কই না,—কইলেও তো কোন দিন আমার কথা কেউ কানে তোল না,—বোকা মুখ্যু এক ধারে সরেই থাকি,—কিন্তু তার যদি আজ মতি ফেরে, তুই হতভাগী কোন্ মুখে তাকে সর্ব্বনাশের মধ্যে ফিরিয়ে আন্‌তে চাস্? তোর কি শরীরে এতটুকু আক্কেল নেই?—মনে কি মায়া মমতার লেশও নেই? তুই কি চাস তোর ভাই আন্দামানে না হয় ত ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দেয়?"

অশ্রু-সাগর কূল ছাপাইতে নিরুত্তরে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

অত কথা শুনিয়াও উৎপলার মুখের পাথর-কঠিন ভাবের কোন বৈলক্ষণ্যই দেখা গেল না। সে কিছুক্ষণ মাকে কাঁদিয়া শান্ত হইবার অবসর দিয়া একটু নরম স্বরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল—

"তা' ছোড়দা এখন গেছে কোথা?"

মা প্রথমে উত্তর দিলেন না। পরে কি যেন ভাবিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তার শরীর ভাল নেই—দিনকতকের জন্যে হাওয়া খেতে গেছে।"

নিরতিশয় বিস্ময়ের স্বরে উৎপলার মুখ হইতে ধ্বনিত হইল, "হাওয়া খেতে?"

মা কহিলেন, "হুঁ। তা'তেও কি তোমার আপত্তি আছে? কেন বাছা! সে কি তোমাদের জেলখানার কয়েদী, যে, তার কোথাও এক পা নড়বারও অধিকার নেই?"

উৎপলা মায়ের কঠিন অভিযোগে কর্ণপাত না করিয়া অনিশ্চিত সন্দেহে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, "সত্যি গেছে?"

মা ঝাঁঝিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ।"

"কোথায় গেছে?"

মা উত্তর দিলেন, "অত জানি নে'।"—

মেয়ে কহিল, "মা!, এটাও কি সত্যি?"

মা সে কথার জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া সেলাইএর কলের মধ্যে জামার প্রান্তটা চাপিয়া ধরিলেন,—শব্দ উঠিল ঘর্ ঘর্ ঘর্—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাগে দুঃখে অভিমানে এবং ততোধিক অপমানে আত্মহারা হইয়া উৎপলা কি যে করিবে কিছুই ঠিকানা করিতে না পারিয়া সোজা অসমঞ্জর ঘরের দিকে চলিল। তার জিনিসপত্র সবই পড়িয়া আছে,—শুধু হাত-ব্যাগটাই নাই, আর ছোট্ট একটা কানপুরী ড্রেসিং কেস্ সে নূতন কিনিয়াছিল, সেইটা দেখিতে পাইল না। ঘর হইতে বাহির হইতেছে—বাড়ীর বুড়ি ঝি—তার মাকে মানুষ করা পুরাতন দাসী—তাহাকে দেখিয়া কি যেন লুকাইয়া ফেলিল, এবং তার দিকে একটা সভয় কটাক্ষ করিয়া পলাইতে গেল।

"কি গা হরিমতিদি! আমি কি চিল যে তোমাকে ছোঁ মেরে নে'ব? কি লুকুলে দেখি।"

হরিমতি বাড়ীর এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটিকে তার শৈশবকাল হইতেই ভয় করে, আরও জানে, ইহার নিকট আর সকলের যদি বা ক্ষমা আছে,—মিথ্যা বলার নাই। ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া গেল।

উৎপলা আসিয়া তার কাপড়ে ঢাকা বস্তুটাকে টানিয়া বাহির করিতেই দেখা গেল, একখানা নতুন-ন্যাকড়া জড়ান চুণে-হলুদ রংয়ের বেনারসী শাড়ী।

"এমাঃ এ কি হবে?—তুমি পরবে নাকি?"—বলিয়াই সাড়ীখানা ফিরাইয়া দিয়া কৌতূহলের সঙ্গে হরিমতির মুখের দিকে চাহিতেই মনিবের পুনঃপুনঃ

সাবধানতাপূর্ণ নিষেধ স্মরণে এক গা ঘামিয়া উঠিয়া হরিমতি ভয়ে সঙ্কোচে জড়াইয়া বলিয়া ফেলিল, "মা আনিয়েছিল—ফেরৎ দিচ্চে।"

"আনালেই যদি—ফেরৎ দিলে যে?"

"কি জানি ভাই! একটা বুঝি নিয়েচে।"

"একটা নিযেচেন? কার জন্যে গো?"

"তা' কি জানি ভাই! দাদাবাবুর বাক্সে দিলে তো।"

"ছোড়দার বাক্সে?" নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত পুনশ্চ অসমঞ্জব কথা স্মরণে আসিতেই উৎপলার অভিমানটা এবার প্রচণ্ড হইয়া মাথা তুলিল। যে অসমঞ্জ জ্ঞানোন্মেষাবধি উৎপলাকে তার ছায়ার মতই কাছে রাখিয়া নিজ হস্তে গড়িয়া তুলিয়াছে,—মাত্র স্কুল-কলেজের সময় ভিন্ন যাদের ছাড়াছাড়ি ছিল না, রোগে, ভোগে, সুখে, সম্পদে, শাসনে, আদরে যারা নিজেদের পৃথক সত্ত্বানুভব করিতে পারে নাই।—যার নিয়ত সঙ্গ লাভের আশায় উৎপলা মেয়ে-জন্মে জন্মিয়াও মেয়ে-সজ্জা অঙ্গে লয় নাই। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহারই সঙ্গের লোভে সে পুরুষ-ছাঁদে চুল ছাঁটিয়া পুরুষের পোষাক পরিয়া ট্রামে বা পদব্রজে সর্ব্বত্র তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে,—দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের স্কুলে নাম ভাঁড়াইয়া পড়িয়াছে,—তার সেই ছোড়দা কি না আজ তাকে লুকাইয়া কোথায় কি কার্য্যে ফিরিতে থাকিল!—এক জন বাহিরের পরের নিকট তাহাকে মাথা নত করিতে বাধ্য করিল, আবার সেই দুঃখে আত্মহারা হইয়া কি না কি বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া একটা কথা পর্য্যন্ত না বলিয়াই দেশান্তরে চলিয়া গেল? এমন রূঢ় কথা তাহাকে কতই তো সে বলিয়াছে,—কখনও তো এমন নিঃশব্দে তাহাকে এতবড় কঠিন শাস্তি দিয়া সে সরিয়া যায় নাই,—তার ছোট বড় শত অত্যাচারও সে যে পরম স্নেহে হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইয়াছে! এ' কি তার সেই স্নেহময়, আনন্দময়, গৌরবময়, ছোড়দা? আজ এ' কি দুর্ব্বল, এ কি অসহিষ্ণু, এ কি নির্ম্মম হইয়া উঠিল সে?—কেমন করিয়া হইল? সে

কি আর উৎপলার স্নেহ, সঙ্গ, সেবা কিছুই চায় না? উৎপলা আজ তার কাছে এতই অবহেলার পাত্রী? উঃ! কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর!

নিজের ব্যবহারটাকে যতই অক্ষমণীয় বোধ হইতে লাগিল, ক্ষোভের সঙ্গে মিশিয়া কোপটা ততই উগ্র হইয়া উঠিল। কি এমন অন্যায় বলিয়াছে সে? সত্যইতো অমন লোকের জীবন-মরণে প্রভেদটাই বা কি,—যে নিজের অক্ষুণ্ণ যশোমাল্য চরণে মর্দ্দিত করিয়া পথের ধূলায় লুটাইয়া দিতে পারে?—তার রাজার মত ছোড়্দাকে সে অমন দীন ভিখারীর মূর্ত্তিতে দেখিতে পারিতেছে না, তাই না সে অত অসহিষ্ণু হইয়াছে।—এই সোজা কথাটাও কি সে বুঝিল না?

সে দিনের সন্ধ্যাটা যেন পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধ্যার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নম্রমধুর বেশে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। নীলপদ্মের মত চোখ জুড়ান অতি কোমল ও নির্ম্মল নীলে দিগ্বলয়ের শেষ প্রান্তটি পর্য্যন্ত ভরিয়া আছে। ইহার নীচে গাঢ় সবুজ বৃক্ষশ্রেণী ঠিক যেন সেই নীলবসনাচ্ছাদিত বরণডালা মাথায় লইয়া বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীর শয়ন-আরতির বরণ-প্রতীক্ষায় উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষিত। ইহাদের মধ্যভাগে বিচিত্র বর্ণের মণিখণ্ডবৎ হর্ম্ম্য-শীর্ষ, কত মন্দির-চূড়া, কতই না বিপণী-সজ্জিত অফুরন্ত পথিকের গমনাগমন-মুখরিত রাজপথ। বৃষ্টিজলে ধোয়া ছাদের উপর উৎপলা কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। সুখস্পর্শ সুমিষ্ট বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু উৎপলার উষ্ণ মস্তিষ্ক কিছুতেই সে স্নিগ্ধ করিতে পারিল না। গত রাত্রি হইতে একবার বিমলের উপর, একবার অসমঞ্জর প্রতি প্রায় ভাগাভাগি করিয়াই তার মনের মধ্যে অতি বিষাক্ত অপমানিত ক্রোধের জ্বালা জ্বলন্ত হইয়া রহিয়াছে। বিমল এখন মস্ত লোক হইয়াছে! সে এখন আর তাহাকে গ্রাহ্য করে না, উপরন্ত তাচ্ছিল্য করিয়াও চলিতে পারে, গত কল্যই তা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আর অসমঞ্জ? সে তো তাকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত অনায়াসে ত্যাগই করিয়া গেল! উৎপলার

প্রাণটা যেন তার চিন্তানলের দাহে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে—এমনি জ্বালা সে তার ভিতরে বাহিরে অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এমনও মনে হইল, এর চেয়ে এই বাড়ীটার সর্ব্বত্র আগুন জ্বালাইয়া দিয়া পুড়িয়া মরাই তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ। এমন অনাবশ্যক অপমানিত জীবন বহন করিয়া সে কি লাভ করিবে?

তার পর যখন ভৃত্য আসিয়া বিমলবাবুর আগমন বার্ত্তা জানাইল, তখন আবার আরও একটা নূতন ভয়ে লজ্জায় বুক তার প্রায় আধহাত ধ্বসিয়া পড়িল। আজ বিজয়ীর বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া সে তার প্রশ্নোত্তরে কেমন করিয়া জানাইবে, তার ভাই, তাদের দলপতি,—মন্ত্রদাতা—গুরু—কঠিন কার্য্যের সময় সমুপস্থিত দেখিয়া গোপন বিবরে লুক্কায়িত পলাতক! আর সে কোথায় তা' উৎপলাও জানে না। যদি এ কথা বিমল বিশ্বাস না করে? এখন হয় ত সে তা'ও পারে।

বিমলের মুখের ভাব স্বাভাবিক, কিন্তু সে যখন কথা কহিল, তা শুনিয়া উৎপলার দেহের প্রত্যেক রোমকূপটি পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। গলার স্বরে তার এমনই অশ্রুতপূর্ব্ব অস্বাভাবিক কোন কিছু ছিল।

বিমল বলিল, "কাল আমি অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসেছি।"

শুনিয়া একদিকে উৎপলার মনে কিছুটা দুঃখ বোধ হইলেও বিমলেন্দুর যে গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে ইহা ভাবিয়া সে অনেকটাই সান্ত্বনা বোধ করিল—এবং সেজন্য ভালমানুষ সাজিয়া অত্যন্ত চাপা পরিহাসে কহিল, "যে বৃষ্টি কাল গেছে!—অন্ধকারে পথ ভুলে গেছলেন বুঝি?"

বিমলেন্দু স্থির অচঞ্চল নেত্র-তারকা এক লহমার জন্য নিরুত্তরে উৎপলার গূঢ় ব্যঙ্গে সমুজ্জ্বল নেত্রের উপর স্থাপন করিয়াই তাহা অপসৃত করিয়া লইল, শান্ত উদাস কণ্ঠে উত্তর করিল,—"ভুল একটা হয়েছে বই কি!—যা'হোক, আপনি দয়া করে একবার 'সঞ্জীবনী-সভা'র খাতাখানা এনে একটা জিনিস

দেখে নিতে আমায় সাহায্য করবেন ?"

উৎপলার অন্তরের মধ্যটা বিমলেন্দুব এই স্থৈর্য্যপূর্ণ অথচ কেমন যেন একটা রহস্যময় ব্যবহারে চমকিয়া উঠিল। বিমলেন্দু এখন অবশ্য সেই মুখচোরা লাজুক বিমলেন্দু নাই, কিন্তু এমন অচঞ্চল স্থির কটাক্ষের আঘাত এমন অবিচল দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক আদেশপূর্ণ কণ্ঠও তো সে তাব নিকট হইতে কোন দিন প্রত্যাশা করে নাই।

চলিতে গিযা উৎপলাব পা একবার বাধিয়া গেল।

খাতার পাতা উল্টাইযা বিমলেন্দু আলোব সাম্‌নে ঝুঁকিযা পডিয়া দু'একটা লাইন একবাব দুইবার, বোধ করি বাবতিনেকই বা পডিযা গেল। উৎপলা তখন আর কৌতূহল দমন কবিতে না পাবিযা কাছে সবিযা আসিযা পড়িযা দেখিল সেই লাইনটা এই :—

"বিশ্বাসঘাতকতা বা শপথ-ভঙ্গের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।"

উৎপলার বুকের মধ্যের সহজ রক্তটা ছলাৎ ছলাৎ করিয়া বারকয়েক ধাক্কা মারিল।

বিমলেন্দু হঠাৎ খাতা দেখা বন্ধ করিয়া উঠিয়া উৎপলার মুখের দিকে চাহিল —"এ কা'র হাতেব লেখা ?"

উৎপলা কহিল, "আমার।"

বিমল পুনঃ প্রশ্ন করিল, "আপনিই তো সমিতির সেক্রেটারী ?"

উৎপলা জবাব দিল, "হ্যাঁ"—তার কণ্ঠে নিরতিশয় বিস্ময়ের রেশ বাজিয়া উঠিল, "এ সব হেঁযালির অর্থ কি বিমলেন্দুবাবু ?"

বিমল ধীরস্বরে উত্তর করিল, "বিষয়টা কঠিন, এক কথায় বলা যায় না। এই সব নিয়মগুলি,—এগুলি কে' তৈরি করেছিল ?"

উৎপলা তেমনি আশ্চর্য্য ভাবে জবাব দিল, "ছোড়দা আর আমি ! তা'ছাড়া আর কে' করবে ?"

"এ নিময়গুলিকে আপনারা এখনও কি মান্য করা আবশ্যক বোধ করেন? অথবা এসব একদিনের ছেলেখেলা বোধে প্রত্যাহার করে নিতে চান?"

"বিমলেন্দুবাবু!"

বিমল এতটুকু অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করিয়া মাত্র কথা বন্ধ করিল।

"বিমলেন্দুবাবু! এ সভা আপনি প্রতিষ্ঠা করেন নি, আমরাই করেছি। আপনি এখানের সবচেয়ে নূতন ভর্ত্তি সভ্য। কেমন করে জান্‌লেন আমরা এখন এর সমস্ত নিয়ম প্রত্যাহার করে নিয়েছি?"

বিমলেন্দু তেমনি নিঃশব্দে নিজের বুকপকেট হইতে একটা ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

উৎপলা দেখিল সভাপতি অসমঞ্জের অনুপস্থিতিকালের জন্য বিমলেন্দুকে সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ করা হইয়াছে। ইঁহার কার্য্যকালে সভাভুক্ত সকলেই নির্ব্বিচারে ইঁহারই আদেশ পালনে বাধ্য থাকিবে,—এই বাধ্য থাকা সম্বন্ধীয় কথাটার মূল সেই খাতাখানার মধ্যেই যে লিখিত আছে উৎপলার সেকথা ভালরূপেই জানা। যে কেহ কার্য্যাধ্যক্ষ হইবে সমিতির সকলেই তার অনুজ্ঞা পালনে বাধ্য। তলায় অসমঞ্জ ও উৎপলা ব্যতীত অপর সকলেরই নামের স্বাক্ষর আছে।

উৎপলার পড়া শেষ হইলে বিমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এ বিষয়ে কোন আপত্তি আছে?"

উৎপলা বিমলেন্দুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "আছে।"

"কি?"

"ছোড়দার বদলে আমি ভিন্ন আর কেউ কার্য্যাধ্যক্ষ হ'তে পারে না,—মূল কাগজের ৩২এর পাতায় নিয়মটা দেখে নি'ন।"

বিমল এ আজ্ঞা প্রতিপালন করিল এবং তৎক্ষণাৎ তার কার্য্যাধ্যক্ষ পদের

মঞ্জুরী-পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে আর একখানা কাগজে আর একখানা মঞ্জুরী-পত্র লিখিয়া আনিয়া উৎপলার সাম্‌নে ধরিয়া বলিল, "এই খাতায় লেখা নিয়মের সম্মান নিজের জীবন দিয়ে করবার প্রতিজ্ঞা আপনারাই একদিন আমায় করিয়ে নিয়েছেন। এ সম্বন্ধে চুলমাত্র তফাৎ আমার প্রাণ থাকতে হবে না। আজ থেকে আপনিই সভাপতি।—আর অনুমতি করেন তো, আমি আপনার সহকারী হ'তে পারি, তা'তে কেউ অমত করবে না।—এখন যে দুরূহ কার্য্য ভার আপনার ও আমার উপর পড়লো, তা'ও শুনে নি'ন।—সেদিন যে সেই সাতাশ হাজার টাকা আমাদের সমিতির হাত থেকে স্খলিত হ'য়ে গেল, সে আমার অক্ষমতায় নয়, আমাদেরই দলস্থ একজনের বিশ্বাসঘাতকতায়।"—

"অসম্ভব!"—বলিয়া উৎপলা উদ্ধত-ভাবে মাথা তুলিল।

"এই চিঠি আমি সেই বদ্ধ বাড়ীর সিঁড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছি।—পড়চি শুনুন, তা হলেই বুঝবেন, সম্ভব কি অসম্ভব।—

ম'শয়! আমি আপনাদের অপরিচিত হইলেও আপনাদের—অথবা সকলেরই হিতকামী। আপনাদের বাটীর দ্বিতলের উত্তর দিকের বড় ঘরের পূর্ব্বধারের লোহার সিন্ধুকে যে সাতাশ হাজার টাকা ও অলঙ্কারপত্রাদি রক্ষিত আছে, অদ্য রাত্রে সেই টাকা লুট করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সুহৃদের পরামর্শ যদি গ্রহণ করিতে চাহেন, যে কোন বাধা উপেক্ষা করিয়াও অর্থাদি সমেত অদ্য সন্ধ্যার মধ্যে বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যান,—নতুবা বিশেষরূপেই বিপন্ন হইবেন ইহা সুনিশ্চিত। হয়ত প্রাণও হারাইতে পারেন।—

বন্ধু।"

উৎপলার মুখ অরুণোদয় পূর্ব্বের পূর্ব্বাকাশের মতই আলোকিত হইয়া উঠিল। কম্পিত উচ্চকণ্ঠে সে উচ্চারণ করিল,—"বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাস-ঘাতক!"

"ঠিক তাই! সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার দণ্ড দিতে আমাদের প্রস্তুত হ'তে

হবে,—হ'তে আমরা বাধ্য নই কি ?"

উৎপলা প্রতিধ্বনির মতই উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিল, "নিঃসন্দেহ !—দণ্ড দিতে আমরা বাধ্য।"

পরক্ষণেই তার মুখ শুকাইয়া আসিল,—বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড যে মৃত্যু—তাহা আইন-সচিবের অজ্ঞাত নয় !

একখানা দণ্ডাদেশের পরোয়ানা লিখিত কাগজ উৎপলার সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া দিয়া ঠিক তেমনি অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চাহিয়া যেন কা'র কাছে ধার করা অভূতপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের সহিত বিমলেন্দু ধীরকণ্ঠে কহিল, "তাহলে নামটা সই করুন। সমিতি শুদ্ধ সকলকারই নামের সই এতে দেখতেই পাচ্চেন,—এ বিষয়ে সকলেই এক মত। আবও শুনুন—শুধু এই নয়,—আরও একটা মস্ত বড় অভিযোগ এর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হয়েছে,—আজ তিন দিন হ'লো এ ব্যক্তি বিবাহিত হয়েছে।"

খাতার পাতাখানা ক্ষিপ্রহস্তে উল্টাইয়া উৎপলা বিচারক-জজের মতই গম্ভীর স্বরে পাঠ করিল, "এই সমিতির কেহ জীবনে কখন বিবাহ করিতে পারিবে না,—করিলে তাহারও দণ্ড ঐ মৃত্যু !"

"বিবাহের প্রমাণ এই সরযূপ্রসাদের পত্র,—"...বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিছু পূর্ব্বেও যদি পাত্রীপক্ষের নিশানা পাইতাম,—এই অমূল্য জীবনরত্ন রক্ষায় সচেষ্ট হইতাম,—কিন্তু হতভাগ্য আমরা আজ এতটুকু অক্ষমতার জন্য কি হারাইতে বসিয়াছি ! উঃ—লেখনী চলে না যে !—সাক্ষাতে সকল কথা বলিব। বর কনেকে একত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

উৎপলা ত্বরিৎহস্তে কলম তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিজের নাম সই করিয়া দিল। দিতে দু'একবার হাত কাঁপিয়াছিল, পাছে বিমলেন্দু জানিতে পারে, পারিয়া তার দুর্ব্বলতায় মনে মনে হাসে,—তাই নারীত্বের এই বিকাশ-টুকুকে প্রচণ্ড অহঙ্কারের আগুনে আহুতি দিয়া মুখোসপরা মুখের মত ভাবশূন্য

মুখে অনায়াসেই সে সেই ভীষণ কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিল। সে যে স্বেচ্ছায় এই কঠিন ব্রত পুরুষের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে।

লেখা সমাধা হইবামাত্র বিমল কাগজখানা তুলিয়া লইতে গেলে,—আকস্মিক বিস্ময়ে বিস্মৃত একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা উৎপলার সহসাই স্মরণ হইল। তাড়াতাড়ি কাগজখানা টানিয়া লইয়া সে এই নিদারুণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর নামের জায়গায় চোখ বুলাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা মর্ম্মবিদারী তীব্র আর্ত্তনাদ তার কণ্ঠ চিরিয়া নির্গত হইয়া গেল।—একটিমাত্র নিমেষের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী তার পদতলে কম্পিত, সমস্ত আকাশ তাহার মাথার উপর হইতে অপসৃত, জগতের সমুদয় বায়ুলহরী তার নিকট হইতে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া সে সবেগে মাটিতে পড়িয়া গেল।

সে নাম—অসমঞ্জ রায়ের।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ভোরের আলো চোখে ঠেকিতেই শিহরিয়া উৎপলা দু'হাতে দু'চোখ ঢাকা দিল। মানুষের এতবড় কালরাত্রিরও অবসান হয়?—কিন্তু তা'ও তো হইল!

দিনের আলো সশস্ত্র প্রহরণে সজ্জিত দিগ্বিজয়ী বীরের মত অন্ধকারের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া বিজয় দর্পে দর্পিত রক্তনিশান শূন্যপথে উড়াইয়া দিল। উহার অগ্নিময় বৃহচ্চক্ষু যেন আততায়ীর ক্ষুধিত দৃষ্টির মত এই স্তব্ধ নির্জ্জন শোকাগারের বাতায়ন পথে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই "উঃ"—বলিয়া উৎপলা ছুটিয়া আসিয়া জানালাটা রুদ্ধ

করিয়া দিল। অন্ধকার তবু সহ্য হয়,—অন্তরের এই পুঞ্জীভূত অন্ধকার লইয়া আলো যে বড অসহ্য!—বড অসহ্য! তাব পর? সারারাত যা' করিয়াছে, তাহাবই পুনরাবর্ত্তন।—এই মাটিতে লুটাইয়া পডিয়া কান্না, এই পিঞ্জরাবদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত ক্ষিপ্ত রোষে ঘবেব মধ্যে দ্রুত পরিক্রমণ, একবাব বা অকথ্য যন্ত্রণাময় পরিতাপে সমস্ত শবীরেব স্নায়ুপেশী ও ইন্দ্রিযগ্রাম একান্তই হাল ছাডিযা দিলে সর্ব্বশরীর ঝিমঝিম ও হাত পা হিম হইযা আসিয়া স্খলিত পদে কম্পিত দেহে দেওয়াল বা খাটের দাণ্ডায মাথা ঠুকিযা মূর্চ্ছাবসন্ন ভাবে ঢলিযা পডা,—আব তাহাতেই সেই চিরসুস্থ সবল দেহের অবসাদেব চবমাবস্থায পৌছিযা সামান্য-ক্ষণের জন্য এতটুকু বিশ্রাম লাভ। এম্নি কবিযাই সাবাবাত্রি কাটিযাছে: আর এম্নি কবিয়াই দিনও কাটিতে আবম্ভ হইল।

এ'কি ভযাবহ জটিল জীবন-সংগ্রামেব ঠিক মাঝখানে সে আজ নিজেকে জোর কবিযা টানিযা আনিযাছে! এত দূবে পৌছিবাব এতটুকু পূর্ব্বেও কি নিজের এতবড় অক্ষমতা সে ঘুণাক্ষবেও জানিতে পারিল না?—দুর্দ্দশাব চবমে না পৌছিলে বুঝি তা' জানা যাযও না?—ওগো দর্পহাবি! এ'কি অমোঘ দণ্ডাঘাতে তোমাব দর্প চূর্ণ কবা? মনেব মধ্যে যতবড় গুমোব তা' ভঙ্গ করার দণ্ডও কি তেম্নি কঠোব?

মানুষ এ অবস্থায পডিলে ভাল কবিযা কোন কথা ভাবিতেও পারে কি না ঘোর সন্দেহ! তথাপি এম্নি একটা ব্যাকুল আবেদন যেন তার সমস্ত প্রাণশক্তিকে উদ্বেলিত করিয়া প্রত্যেক স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্য দিয়া বাজিতেছিল—'বেদ, কোরাণ, বাইবেল,—চির যুগ-যুগান্তরেব সমগ্র লোকমত সব্বাই যে তোমায় অপার করুণাসাগর বলে,—যদি অত না'ও হও,—ওর এক কণামাত্র করুণাও যদি তোমার মধ্যে থাকে, তবে এই ঘটনাটার আগাগোড়া তুমি একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত করে দাও। সে কি পারা যায় না?—সত্যিই কি তা' পারো না? ওগো সর্ব্বশক্তিমান! তোমার এই নাম কি শুধু ভিত্তিহীন কবিকল্পনা-

মাত্র? মিথ্যার শিকড় কি এমন সর্ব্বকাল ও সর্ব্বলোকব্যাপী হতে পারে? যে কখনও তোমার দোরে হাত পাতেনি, আজ বড় দুর্দ্দিনে তার এই সর্ব্ব প্রথম ভিক্ষার ঝুলিতে মুষ্টি ভিক্ষার দান দিতে কার্পণ্য করো না গো,—করো না।'—

ডাকাতির কল্পনা, সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বিমলেন্দুর বণিকগৃহে গমন, সেই নামহীন অথচ অসমঞ্জর চিরপরিচিত হস্তাক্ষরে লিখিত পত্র,—সে যেন সব স্বপ্ন হয়!—চিরস্নেহময় প্রাণাধিক ভাইএর প্রতি সেই,—ওরে,—সেই অতি কুক্ষণে উচ্চারিত কুবাক্য!—সে যেন সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন হয় রে!—ওঃ ভগবান্! ভগবান্! কেমন করে সে স্মৃতি সে সহ্য করবে? তার কালামুখের উচ্চারিত ভীষণ অভিসম্পাত যে দুদিন গেল না,—সঙ্গে সঙ্গেই কি ফলে উঠল। আর এর পরে? উঃ! তার পরে—তার পরে যে উৎপলা, না,—না, সর্ব্বনাশী উৎপলা ইচ্ছাসাধে—নিজে যাচিয়া নিজের সেই প্রাণাধিক প্রিয় অকলঙ্কচরিত্র ভাইএর মহাপাতকীর মতই নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা নিজের হাতে সই করিয়া দিয়াছে,—এ সত্য কি—আর—কোনমতেই এ পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাইতে পারে না?—উৎপলার যা' কিছু আছে সবই যদি গুঁড়া করিয়া পথের লোকের পায়ের তলায় ফেলিয়া দেওয়া যায় তবু না?—তবুও না?

অসমঞ্জর মা পূর্ব্বদিনই কালীঘাটে তাঁর বোনের বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। হরিমতি ঝিও সঙ্গে গিয়াছে। বলিয়া গিয়াছেন, ফিরিতে দিন চারেক তাঁর দেরী হইবে। আগামী কৃষ্ণাষ্টমীতে কি সব মানত-পূজা শোধ দেওয়ার নাকি বিশেষ প্রয়োজন।

উৎপলাকে খাওয়া দাওয়ার জন্য অনুরোধ করিবার একমাত্র লোক বামুন-ঠাকরুণ ভর্ৎসিত হইয়া ফিরিয়া গিয়া রান্নাঘরের ঝিকে ডাকিয়া শপথ লইয়া জানাইয়া দিল যে,—ঐ সর্ব্বনেশে মদ্দা-মেয়ে একদিন যদি না আগুন খেয়ে মরে, তো তার নাম সে বদলাইয়া ফেলিবে।—নেহাৎ যদি না-ই মরে, তা হইলে

হইয়া সে যে গির্জ্জেয় ঢুকিবে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিধাতাপুরুষ খুটিচক্কের মাথা খেযে বিবি না করে কেনই যে ওকে বাঙ্গালীর ঘরে পাঠিয়ে-ছিল, তা সেই বাহাত্তুরে বুড়োব্যাটাই জানে! কাল রাত থেকে এই যে উপোস দিয়ে পড়ে আছে,—এব মানে কি, তা 'ভগা'ই জানে বাছা!—নরলোকের বোঝবার সাধ্যি থাকলে তো বুঝবে।--

এক সময়ে ধনুকছাড়া তীরেব মত ছুটিযা বাহিব হইযা অধৈর্য্য আত্মহারাবৎ উৎপলা ডাকিল, "রামদীন! রামদীন!"

"জি, হুজুব!"—বলিয়া রামদীন দেখা দিল।

"এই চিট্‌ঠিঠো বিমলবাবুকা পাশ লে' যাও,—যাও—জল্‌দি যাও—দৌড়ো।"

মায়ের ঘরে প্রবেশ করিতেই সেখানেব একখানা বড় দাঁড়া-আরসীতে উৎপলার ছায়া পড়িল। স্কন্ধ-বিলম্বী খাটো করিযা কাটা চুল,—সে চুলের সাম্‌নের দিকে পুরুষের মত ডানদিকে বাঁকা সিঁথা কাটা,—পুরুষালি ঢংএর উঁচু কলার এবং হাতে বোতাম আঁটা কড়া কফওয়ালা বুকপকেট দেওয়া জ্যাকেট, সবশুদ্ধ জড়াইয়া এই চিরাভ্যস্ত মূর্ত্তিটার দিকে চোখ পডিতেই যেন গভীর ঘৃণায তার সর্ব্বশরীর রিবি কবিযা উঠিল। এই পুরুষ-পরুষ মূর্ত্তিটাকে সে যেন আর একদণ্ডও সহ্য করিতে না পারিযা অস্থির আবেগে মায়ের বাক্স আলমারি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। নিজেব কাছে নারীত্বেব ভূষার সঞ্চয় তো কিছুমাত্রও নাই।—বাহিরে আসিয়া ডাকিল, "সুকেশী!"

"কি দিদিমণি?"—বলিয়া বামুনঠাকরুণ ভয়ে ভয়ে কাছে আসিল।

"মা'র [illegible] জানো?"

"না দিদিমণি, সে তো মার আঁচলেই থাকে।"

"তবে কারুকে একটা ছুতোর ডাকতে বলো,—আমি গয়না পরবো।" বামুনদিদির নাম সুকেশী। সুকেশী অর্দ্ধ-সাহসে কহিল, "মা ফিরে এলেই না

পরতে।—তা' এখন কাঁচের চুড়িওলাকে ডাকতে বলবো কি ?"

"তোমায় কেউ গিন্নিপনা করতে ডাকেনি,—কাঁচের চুড়ি আমি ছোঁব ? ছোঃ—যাও,—ছুতোর ডাকতে বলো, ছুটে যাও—"

সুকেশী আদেশ পালন করিয়া আসিয়া রান্নাঘরের ঝিকে চুপি চুপি জানাইল,—"এদ্দিনে বুঝতে পেরেচি,—মা! বিবিও নয়, বাবাও নয়,—কিচ্ছুই নয় গো,—বদ্ধ পাগল! আহা মেয়েমানুষ,—শেষ পর্য্যন্ত কি দুর্গতিই যে ঘটবে—যদি গারদ-ফারদেই বা দিতে হয়,—আহা রে!"

রামদীনের হাতে চিঠি পাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিমলেন্দু আসিয়া আরও অনিচ্ছা মন্থর পদে উৎপলার দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডেকেছেন ?"

ঘরের মধ্য হইতে ক্ষীণ শব্দ আসিল, "ভিতরে আসুন।"

পর্দ্দা সরাইয়া ঘরের মধ্যে পা দিতেই বিমলেন্দুর পা বাধিয়া গেল। এ যে স্ত্রীলোকের শয়নকক্ষ। এখানে তা'কে কি প্রয়োজনে ডাকা হইল ? আবার তারও চেয়ে অধিকতর স্তম্ভিত হইয়া রহিল সে উৎপলার দিকে চোখ পড়িতে। উৎপলার সেই পূর্ব্বাপর পরিচিত মূর্ত্তি আজ তো তার চোখে পড়িলই না,—গলার স্বর না শুনিলে হয় ত ইহাকে সে উৎপলা বলিয়া চিনিতেও পারিত না। তার সেই পূর্ব্ব-পরিচিত সজ্জার বদলে আজ এই এতবড় অসময়ে তাহার অঙ্গে একখানা সাঁচ্চা-জরির কাজ করা টকটকে কমলা রংএর রেশমী সাড়ী। জ্যাকেটটা ঢিলা বলিয়া কয়েকটা সেপ্‌টিপিন আঁটিয়া সেটাকে গায়ে পরিতে হইয়াছে,—(সেটা অবশ্য বিমলের অজ্ঞাতেই রহিল)। হাতে, গলায়, কানে তার চওড়া মোটা চকচকে সোনার সব অলঙ্কার। শ্বশুরের সিন্ধুক বাক্স-ভাঙ্গাইয়া এর চেয়ে সোজা জিনিস সে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই এবং এ লইয়া বিচার করিতে বসার মত শক্তিও তার ছিল না। তাই বোধ করি বা অসমঞ্জর বধূকে দিবার পর যে চিক চৌদানি ও আটগাছা চওড়া পালিশপাতের চুড়ি

সিন্দুকে বাঁকি পড়িয়া ছিল, সেই ক'খানাকেই সে নিজের গায়ে গলাইয়া লইয়াছে। ইহার অসঙ্গতি তার রুদ্ধ-প্রায মনের দ্বারে পৌছিতেও পারে নাই। সে শুধু জানিয়াছে সে নারী, আর অপরকেও সে সেই কথাটাই তারস্বরে জানাইতে চাহিয়াছে। ইহাতেই বিমলেন্দুর মনে হইল, সেই পুরুষ-পৌরুষে ভরা দেহের মধ্যে এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এমন পরিপূর্ণতা এতদিন কেমন করিয়া লুকানো ছিল ?

সে ঈষৎ অপ্রতিভ মৃদুকণ্ঠে ধীরে ধীরে ফিরিয়া দাঁড়াইযা জিজ্ঞাসা করিল,—"আমায় ডেকেছিলেন ?"

"হ্যাঁ"—বলিযা উৎপলা বিমলেন্দুর কাছে আগাইযা আসিল এবং চক্ষের নিমেষে বিস্মব বিমূঢ় বিমলেন্দুর দুই পা সজোবে আঁকডাইযা ধবিযা আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল,—"ছোডদাকে তোমায় বাঁচাতে হবে। না হলে আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁডে মববো।"

বিমলেন্দু তদবস্থ থাকিয়াই কষ্টে উচ্চারণ করিল, "কেমন করে বাঁচাবো আমি ?"

উৎপলা তার পায়ের উপর তেমনি করিয়া পড়িয়া থাকিয়া রোদন-রুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "তুমি তার ঠিকানাটা আমায দাও,—আর তোমায় কিছু করতে হবে না।"

বন্যা উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণবক্ষ নদীর মতই তার সমস্ত শরীরটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সাবধানে পা সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে বিস্ময়াপ্লুত স্বরে বিমল কহিয়া উঠিল, "আপনি ?—আপনাকে—"

উৎপলা বিমলেন্দুর পা ছাড়িয়া দিয়া স্ফুরিত বিদ্যুতের মতই চকিত চমকে মুখ তুলিল, অশ্রু আবিলতাশূন্য তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"শুধু এই টুকু ? যদি এরও চেয়ে কোটীগুণ পাপ করলেও আমার এ মহাপাতকের

প্রায়শ্চিত্ত হয়,—আমার ছোড়দা বাঁচে,—আমি তা'ও কর্ব্বো।"

বলিতে বলিতে আবার অসম্বরণীয় অশ্রুবন্যায় বাঁধা বাঁধ মুহূর্ত্তে ধ্বসিয়া পড়িল, মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া এবার সে উর্দ্ধ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

"বিমলেন্দুবাবু! বিমলেন্দুবাবু!—সে কি আপনারও আত্মীয়ের চেয়েও ঢেব বেশী বড বন্ধু নয়?"

সম্রাজ্ঞীর ন্যায় আত্মমর্য্যাদায় অটুট মহিমান্বিতা এই নারীর এ দীন মূর্ত্তি ও ভিখারিণীর মত আর্ত্ত প্রার্থনায় বিমলেন্দুকে একান্তই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। একেই তো এ কযদিন ধবিযা প্রতিনিয়তই তার মন মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘাত বাধিযাই আছে, তার উপব এখন এ অবস্থায পড়িযা তার বুকের ভিতর দ্বিধার ঝঞ্ঝা কালবৈশাখীর প্রচণ্ড বেগেই বহিতে লাগিল। অনবরতই অন্তর্বিদ্ধ বেদনাব তীক্ষ্ণ তীরের ফলাটা তার ক্ষতস্থানকে কাটিয়া কাটিয়া এই নির্দ্দয প্রশ্নই তো তুলিয়াছে,—'অসমঞ্জ যে তোমাব একমাত্র বন্ধু,—জগতের মধ্যে তোমার সেই ত একমাত্র সর্ব্বপ্রধান বন্ধু!'—

আবাব বাহিরেও সেই একই মর্ম্মদাহী প্রশ্ন! "সে কি আপনার আত্মীয়ের চেয়েও বড় বন্ধু নয়?"—

অসমঞ্জ তার বন্ধু নহে তো আর কে' এ সংসাবে জীবনযাত্রা-পথের নিঃসম্বল পথিক বিমলেন্দুর বন্ধু?—আর কা'ব কাছে বিমলেন্দু এমন অচ্ছেদ্য স্নেহের ঋণে আবদ্ধ?—কিন্তু তাই বলিয়াই তো আর বিশ্বাসঘাতককে,—প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে ক্ষমা করাও চলে না!—এ তো আর বিমলেন্দুর নিজের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির খতিয়ান মাত্র নয়! যে মহাব্রত তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তার কাছে মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম, এ সবই যে তুচ্ছ! নিজের ক্ষতিই যখন ক্ষমা করিবার পথ নাই, তখন অপরকেই বা ক্ষমা করিবে সে কোথা হইতে? কেমন করিয়া? সে কি কখন সম্ভব?—

উৎপলা উৎসুক আকুল নেত্রে বিমলেন্দুর স্তব্ধ, গম্ভীর মুখের অবিচলিত

রেখা নিজের অশ্রু-অন্ধ-প্রায় দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া আবার চারিদিকে ঘনীভূত অন্ধকার দেখিল। রুদ্ধপ্রায় রুদ্যমান কণ্ঠে কহিল,—"চুপ করে থেকে না,—দেখচো না কি আমি যে প্রতিক্ষণে মরে যাচ্ছি!—দয়া মায়া বলে কি সংসারে সত্যিই কিছু নেই? খেয়ালটাই কি সবচেয়ে বড়?"

বিমলেন্দুর বক্ষে করুণা মমতার উৎস উথলাইয়া উঠিতে গেল। একান্ত অসহায় ও আশা নিরাশার প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে ক্ষণে রক্তাভ ক্ষণে বিবর্ণ মুখের পানে সে বারেক বিপুল হৃদয়োচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সকরুণ দৃষ্টিপাত করিল। তার পর নিজের সঙ্গীন জীবন কাহিনী স্মরণ করিয়া একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিল,—"দয়া-মায়ার পথ যে আমাদের নিজে হাতে কাঁটা দিয়েই বন্ধ করতে হয়েছে। আমি দয়া দেখালেও তো সমিতির হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারা যাবে না। অসমঞ্জব ঠিকানা সরযুপ্রসাদ জানে,—সে আমাকেও তা' বলে নি,—বলা যে নিয়মবিরুদ্ধ সেও তো তুমি জানো।"

"তোমায় তা' জান্‌তেই হবে,—যেমন করেই হোক তোমায় জান্‌তেই হ'বে। তুমি ভিন্ন আর তো আমার কেউ নেই।"—বিমলেন্দুর একটা হাত সে এবার সবলে চাপিয়া ধরিল।

বিমলেন্দুর বিস্ময় রুদ্ধ কণ্ঠ চিরিয়া কোনমতে উচ্চারিত হইল,—"আমি ভিন্ন তোমার কেউ নেই? এ কি বল্‌ছো তুমি? এ' কি বল্‌ছো?"

উৎপলার সারা মুখ তার শোকদীর্ণ অন্তরের প্রতিচ্ছায়া বিস্মিত পাণ্ডুতাকে পরাভূত করিয়া শারদ-সন্ধ্যার পশ্চিমাকাশের মতই আলোকিত হইয়া উঠিল। তার ললাটের ঘর্ম্মজড়িত চূর্ণ কুন্তল চোখের কাছে আসিয়া পড়িল। দীর্ঘ নেত্রপল্লব প্রস্ফুটিত গণ্ডের উপর নামিয়া আসিল। যে হাতে সে বিমলেন্দুর হাত ধরিয়াছিল সেখানা ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইয়া সেই বন্ধন হইতে খসিয়া পড়িল। বর্ষা তার শ্যামলতাকে যেমন পুষ্প বৃক্ষে তেমনি শুষ্ক দূর্ব্বাদলেও সঞ্চারিত করিতে ছাড়ে না! —এত বড় বিপদের বজ্র মাথায় লইয়া কে' জানে কোন্ অদৃশ্য যাদুকরের যাদু-যষ্টির

অজ্ঞাত স্পর্শে আজ সহসা উৎপলার নারী-জীবন আকস্মিকভাবেই জাগিয়া উঠিয়াছে। নতমুখে সে কহিল, "আমি—এই বিপদে পড়েই বুঝেছি, যে ছোড়দা ও তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নেই! আর কা'কে বল্‌বো আমি,—তুমি যদি না আমার মুখ চাও"—সে মুখ নত করিল।

বিমলেন্দু গভীর কৌতূহল মিশ্রিত পরিপূর্ণ বেদনায় অবাক দৃষ্টিতে তার মৌন নত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। একটা নূতন অন্তর্গূঢ় বেদনা তার আহত বিপর্য্যস্ত অন্তরের মধ্যে বর্শাফলকের মত খোঁচা মারিতে লাগিল। এ কি নব জাগরণ! আজ এই একান্ত অসময়ে,—এই চিরনিদ্রাগতা,—পাষাণী কোন্ সোনার কাটির স্পর্শে, কার চরণ-বেণু কণার আশীর্ব্বাদে জাগিয়া উঠিল?—কিন্তু হায়! এর চেয়ে যে তার না জাগাই ভাল ছিল!

তবু একটি মুহূর্ত্তের জন্য বিমলেন্দুর সমস্ত শরীর মন আচ্ছন্ন করিয়া রহিল কেবল এক লহমার সেই একটুখানি স্নিগ্ধ স্পর্শ,—বিপুল আগ্রহ মথিত সেই একটিমাত্র বাণী,—"তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নেই,"—আর ওই দুটি দীর্ঘপল্লবের ছায়াঘেরা গভীর অনুরাগের রাগে রঞ্জিত কোমল দৃষ্টিটুকু!

এই কয়টি ক্ষুদ্র অভিব্যক্তিতে মিলিয়া অব্যাহত আনন্দ-রাগিণীর স্বরে বাঁধা এসরাজের তারের মত যেন কা'র অদৃশ্য অঙ্গুলীস্পর্শে বিমলেন্দুর অন্তরের সব কয়টা তন্ত্রীতেই পুলকোচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে লাগিল। দেশ, ব্রত, প্রতিজ্ঞা, এ সমুদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া সহস্রদল পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল, শুধু যৌবনের মধুময় স্বপ্নঘেরা আশা এবং তার মাঝখানে ভাস্বর হইয়া রহিল শুধু উৎপলার মুখপদ্ম।

কিন্তু সে কতক্ষণ? ভৈরবের বিজয়ভেরীর রুদ্র তান,—সে যে দুয়ারের পার্শ্বেই ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিয়াছে,—সে তো আর বিয়ের সানাই নয়,—বিসর্জ্জনের ঢাকের বাদ্য!—সে বাজনা কান চাপিলেও কানে ঢুকিতে পথ পায়, হৃদয় কপাট রুদ্ধ করিলেও তার ভৈরব গর্জ্জন নিরুদ্ধ থাকে না।

কিন্তু বিমলেন্দুর নেশার ঘোর বুঝি তখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই, তাই সে স্মিত মুখে বলিয়াছিল,—"সত্যিই কি এতদিনে তোমার যথার্থ বন্ধুর খোঁজ আজ পেলে তুমি? সত্যি?—সত্যি তুমি আমায় আত্মীয় বলে, বন্ধু বলে মনে করতে বিশ্বাস করতে নির্ভর করতে পেরেছ? বলো বলো, বলো—আর একটিবার মুখ ফুটে বলো,—তোমাব জন্যে তা' হ'লে আমি অসাধ্য সাধন করবো। উৎপলা! শুধু বলো,—উঃ—না,—না,—এ' আমি কি করতে বসেছি!—এ আমি কি বলছি!—"

বিমলেন্দুর সকল নেশা যেন কোন্ অদৃশ্য হস্তের নির্মম কষাব আঘাত খাইয়া এক মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল। শর-বিদ্ধ আহত মৃগের ন্যায় সে ত্রস্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া,—"এমন করে দু'জনকেই মরণের পথে টেনো না উৎপলা! তুমি যা' ছিলে তাই থাক, তেমনি রহস্যময়ী, তেমনি পাষাণী!—মোহময়ি! তোমার ও মূর্ত্তি ঢাকা দাও,—ঢাকা দাও,—আমি যাই,—আমি যাই,—না—না—না আর না; আর আমায় ফিবে ডেকো না—ডেকো না,—ডেকোনা—"

বলিতে বলিতে ব্যাধ বিতাড়িত ভয়ার্ত্ত পশুর মতই সে প্রাণপণে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।—পিছনে আর একবার ফিরিয়াও চাহিল না; কিন্তু তথাপি তার পশ্চাতে যে অস্ফুট আর্ত্তধ্বনিটা সে শুনিতে পাইল, সেটাকে সে এড়াইয়া যাইতে পারিল না। তার দুই কর্ণে তপ্ত শলাকার মতই বিদ্ধ হইয়া সে শব্দটা এমনিই ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল,—যেন সেটা তারই স্বহস্ত-বিদ্ধ জন্তুর মরণার্ত্তনাদ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মের দিনে নদীর জল যখন তলায় পড়িয়া থাকে, তখন আকস্মিক বর্ষার প্লাবনে, সে যে কোন কালে কূল ছাপাইয়া উন্মত্ত প্রবাহে ছুটিয়া বাহির হইয়া তার চারিধারকে অকূলে টানিয়া লইবে এমন সম্ভাবনা কাহারও মনে থাকে না। তাই অকস্মাৎ তেমনটা ঘটিলে লোকে একান্তরূপেই দিশাহারা হয়। বিমলেন্দুরও অনেকটা এইরূপ হইয়াছিল। উৎপলাকে প্রথম দর্শনে তার মনে পূর্ব্বরাগ না জন্মিলেও যতদিন উহার সঙ্গ তার ভাল করিয়া সহিয়া যায় নাই, উৎপলার অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন নারীত্ব জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মনকে তার পলে পলে আকর্ষণ করিয়াছে। সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিমলেন্দু উৎপলাকে তার উদ্ভট জীবনের মধ্যেও বিশেষ অশোভন ভাবে দেখিতে পারে নাই,—তাই তার শক্তিমত্তা,—তার আত্মনির্ভরতা, তার ত্যাগশীলতা ভিতরে ভিতরে বিমলেন্দুর দৃঢ় সঙ্কল্পের একটা স্থানে একটুখানি ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিল, সেটা তখন সে যদিও জানিতেও পারে নাই,—অকস্মাৎ একদিন বর্ষাধারার ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়া তাহা সংযমের বাঁধ ভাসাইতেও গিয়াছিল। সেদিনের সেই সতর্ক প্রহরায় ভগ্নপ্রায় হইয়াও বাঁধের বাঁধন যদিও ধ্বসিতে পারে নাই, কিন্তু সেই দিনই সে সসংজ্ঞ হইয়া উঠিয়া দেখিতে পাইয়াছিল, তার সঙ্কল্পের মূল খুবই দৃঢ় নয়। উৎপলার প্রতি একটা তীব্র অনুরাগের স্রোত তার অন্তরে দুই কূল পরিপূর্ণ করিয়াই প্রবাহিত হইতেছে। ইহা অন্য সকল সংযম, সকল ত্যাগের মহিমাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাসাইয়া কোন অকূলের উদ্দেশ্যে গর্জ্জিয়া বাহির হইয়া পড়িতেও হয় ত অসমর্থ নয়! কশাহত চিত্তে বেদনার সঙ্গে সমপরিমাণে বিস্ময় ও লজ্জা-ক্ষোভে আকর্ণ ললাট রঞ্জিত করিয়া

সে তার অপরাধী চিত্তের চারিপাশে লোহার বাঁধন দৃঢ় হস্তে রচনা করিতে লাগিয়া গেল। ইহার পর হইতে হৃদয়-বৃত্তির আর কোন দৌরাত্ম্যের সংবাদ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই।

আজ আবার সেই সহসাগত প্রচণ্ড বন্যাধারা তার অন্তরের দৃঢ়ব্রত ঐরাবতকে প্রায় ভাসাইযা লইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া এত করিয়াও নিজ চিত্তের এই বিশ্বাসঘাতকতাকে যথাস্থানে বর্ত্তমান দেখিয়া রিমলেন্দু যতই বিস্মিত, ততোধিক ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

সে রাত্রে সেই দুর্দ্দমনীয় লোভের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া আসিযা সারা দীর্ঘ পথ বিমলেন্দু পাযে হাঁটিয়া বাসায় ফিরিল। সহবতলীর প্রায নির্জ্জন পথের দুধারে বড বড় বাগানগুলা ঘন শাখাপল্লবে জমাট অন্ধকারের জট পাকাইয়া মৌন মুখে চাহিয়া আছে। ঝিল্লির সকরুণ কণ্ঠে যেন তাদের আঁধার ভরা বুকের কান্না গুমরিয়া উঠিতেছে। পথিপার্শ্বের প্রকাণ্ড বাঁশঝাড় একবার আকস্মিক একটা দমকা হাওয়ায শ্বসিযা উঠিতেই বিমলেন্দুব সর্ব্ব শরীরে একটা তড়িৎ-প্রবাহ বেগে বহিয়া গেল। সেই অস্ফুট মর্ম্মরে আর একটা অর্দ্ধব্যক্ত আর্ত্ত গুঞ্জন সে যেন স্পষ্ট করিয়াই শুনিতে পাইল। এদের হাত হইতে মুক্তি লাভের আশায় সে দ্বিগুণ বেগে পা চালাইল, কিন্তু তবু সেই ছিন্ন-তন্ত্রী বীণায় শেষ সুরের রেশের মতই সেই মর্ম্মচ্ছেদী আর্ত্তস্বর যেন সারা বিশ্ব সংসার পরিপূর্ণ করিয়াই তার দুই কানের তারে নির্ম্মম সুরে ঘা দিয়া দিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া চলিল,—তাহাকে ছাড়ানো গেল না।

সুপ্তিমগ্ন মধ্যরাত্রের নিজের একটি বিচিত্র সুর আছে। উহা বিনিদ্র শ্রোতার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হৃদযতন্ত্রীতে স্পন্দিত হইতে থাকে,—এ একটা বিশেষ জানা কথা। সে সুর কোথা হইতে ভাসিয়া আসে, তার তান লয়ই বা কি,—সে সব কথা শ্রোতা কখন বিচার করিয়া দেখে না,—দেখিবার কথা তার মনে পড়ে না, নিজ নিজ মনোবৃত্তি অনুযায়ী কেহ উহার মধ্যে এক ও

অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি মাত্র, কেহ বা কাব্য-কলার বৈচিত্র্য-পূর্ণ শব্দজালের রচনা করিয়া-লয়, কেহ আর কিছু—কেহ আরও কিছু।—আজ এই সুপ্তিময় স্তব্ধ নিশীথিনীর মর্ম্মস্থানে বিশ্ব চরাচরের একমাত্র নিত্য-জাগ্রত অচ্ছেদ্য মহাসঙ্গীতের তালে তালে শুদ্ধমাত্র সেই একটা মর্ম্মন্তুদ অব্যক্ত যন্ত্রণাধ্বনিই যেন বিমলেন্দুর সমস্ত মনপ্রাণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম আচ্ছন্ন করিয়া করতালের মতই ঝমাঝম্ ঝমাঝম্ শব্দে বাজিয়া চলিল। তার কঠিন চিত্ত, তার দৃঢ়ব্রত, সমস্তই যেন সেই বুক ভাঙ্গা আর্ত্ত কণ্ঠ পলে পলে তিলে তিলে হাপরে ভরা সোনার তালের মতই গলাইয়া ফেলিতেছে,—এটা সর্ব্বান্তঃকরণেই অনুভব করিয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল। যে পথে সে এতদিন চলিয়া আসিয়াছে তার মন যে সে পথের সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত নয়, এই সত্যটা আজ সে ভাল করিয়াই জানিতে পাইল। বাসনা-কামনার গ্রন্থি যে তার সমগ্র অন্তরকে পাকে পাকে জড়াইয়া আছে,—সে ত এদের তাড়াইয়া দিতে পারে নাই। প্রাণটা আকুল হইয়া যেন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল,—কি দিয়া সে নিজের আজিকার এত বড় ক্ষতির অসহ্য ব্যথা চাপা দিবে?

কতক্ষণ বাহিরের মুক্ত বাতাসে পাইচারী করিয়া বেড়াইয়া যখন নিজেকে ক্লান্ত বোধ করিল,—তখন সামনের বারান্দায় ঢুকিয়া একখানা বেতের চৌকি যেটা রৌদ্র বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া জীর্ণাবস্থায় পড়িয়া ছিল, তাহারই মধ্যে ঝুপ্ করিয়া আপনাকে সে নিক্ষেপ করিল। সেখানেও কিন্তু সেই বিলাপ-ব্যক্ত কণ্ঠের সহিত সেই একটু সলজ্জ চাহনি, ফুলের মত এতটুকু ক্ষুদ্র সেই স্পর্শটুকু, ভোর বেলার শিশিরে ভেজা বাসি গোলাপ পাপড়ির মত তার কঠিন হাতের স্পর্শ পাইয়াই সে যেন ঝরিয়া পড়িয়া গেল!—অথচ সেই এতটুকু-হাতের ছোঁয়া!· আর,—আর,—"তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই"—এ কথাটা—এ কথাটা যে কোনমতেই মন হইতে যাইবার নয়। বিমলেন্দু অস্থির হইয়া উঠিল। শুইয়া থাকা তার দায় হইল। আবার উঠিয়া সে ধীরে ধীরে

অতি ধীরে দালানটার এ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কতবারই সে ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইল না। যদি অন্তরের আর্ত্ত স্বর বাহিরে শুনা যাইত, তবে সেই সুখ-সুপ্ত জ্যোৎস্নারাত্রি তার এই অফুরন্ত অন্তর্ব্যথার তীব্র-করুণ বিলাপে বোধ করি দীর্ণ হইয়া যাইতে পারিত,—কিন্তু তা' হইল না,—নিঃশব্দেই সে নিজের এই সর্ব্বস্বান্তকারী ক্ষতিটাকে বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া মাতালের মত পাগলের মত জড়িত স্খলিত অস্থির চরণে ঘুরিতে লাগিল। তার পর যত সময় কাটিতে লাগিল, একে একে একে সব কথা,—সেই প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে আজিকার এই শেষ বিদায়-দৃশ্য পর্য্যন্ত,—যতবারই সে ফিরিয়া ফিরিয়া মনে করিল, যতবারই তার মনের চোখে উৎপলার বিচিত্র মূর্ত্তি পুনঃ পুনঃ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকিয়া তার বুকে ব্যথার মোচড় দিয়া দিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল,—অশ্বারোহীর পোষাকেও যেমন, বিয়ের কনের বেশেও তেমনি,—সকল অবস্থাতেই বিচিত্ররূপিণী উৎপলা কি অদ্ভুত, কি মনোহারিণী। বিশ্ব প্রকৃতির ন্যায় নব নব শোভা সম্পদের তার যেন সীমা নাই! শৌর্য্যে, বীর্য্যে,—আবার স্নেহে প্রেমে, সমস্ত হৃদয়-বৃত্তির অধিকারই কি তার মধ্যে অপর্য্যাপ্ত?—এমন সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জীবনসঙ্গিনী কিসের মূল্যে সে আজ হেলায় হারাইল? বলিতে লজ্জা নাই,—সত্য স্বীকারে কিছুমাত্র লজ্জা নাই,—উৎপলাকে সে কি দেশের চেয়ে কম ভালবাসে?—উৎপলাকে পাইলে দেশের কাজ তার একার চেয়ে যে অনেক বেশী করিয়াই সার্থক হয়,—সেও কি সুনিশ্চিত নয়?—তবে কাহার অযথা অত্যাচার তার জীবনের উপর এতবড় একটা প্রকাণ্ড পাষাণ ভার চাপিয়া বসিয়া তাহাকে ক্রীতদাসের চেয়েও অধম জেলের কয়েদীর চেয়েও অক্ষম, একটা পাশবদ্ধ জানোয়ারে একটা পরহস্তচালিত যন্ত্রমাত্রে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, যে, আজ নিজের পরেও তার কিছুমাত্র অধিকার নাই? নিজের যাহা প্রেয়, তাহা লাভের অধিকার তো নাই-ই,—এমন কি,—শরণাগতকে রক্ষা করিবার

অধিকার পর্য্যন্ত নাই! অযাচিত পাওয়া চির আকাঙ্ক্ষিত সাধনার ফল মূঢ়ের মত তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজের এই বন্ধনহীন বান্ধবশূন্য জীবন-তরণী অনির্দ্দেশ্যের অভিমুখেই অসহায়ের মত ভাসাইয়া দিতে হইবে!—কেন? কেন?—কেন?

অন্তরের মধ্য হইতে আহত হৃদয় ক্ষুব্ধ রোষে গর্জ্জিয়া উঠিল। এর জন্য দায়ী যে, তার মত শত্রু তার আর কে? মানুষের জীবন লইয়া এ কি ছেলে-খেলা? অজ্ঞ কিশোর প্রাণ কি তার চির ভবিষ্যতের পূর্ব্বাপর সমস্ত ভাল-মন্দের বিচার করিতে সমর্থ? যে অসমাপ্ত মুকুল জীবন ভাল করিয়া তখনও ফোটে নাই, তাকে জোর করিয়া ছিঁড়িয়া যে লইতে চায়, নিষ্ঠুর দস্যু ভিন্ন সে' কি? বালক যখন প্রথম যৌবন প্রাপ্ত হয়, নূতন নামা বর্ষার জলের মত সর্ব্বদাই সে মনে প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে, সে সময়ে তাহাতে বাঁধা না দিয়া যে অদূরদর্শী শুধু খাল কাটিতে চায়, সে এটা ভাবে না যে, বর্ষাশেষে এই আকস্মিক প্রাপ্ত জলধারার কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে, সেটা না দেখিয়াই ইহাকে ভিন্নপথে গতি দিলে দুর্গতি ঘটাই এর পক্ষে সম্ভব। এতবড় একটা কঠিন সর্ত্তে একটা কিশোর জীবনকে বাঁধিয়া ফেলা, এর মত নিষ্ঠুরতা আর কোথায় আছে? যাদের অবিচারের প্রতি বিরাগে আজ এই ব্রত তাহারা লইয়াছে, আগাগোড়া খুঁজিলেও তো এতবড় অত্যাচার তাদের ইতিহাসেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! দেশহিতব্রত খুবই বড় কথা, কিন্তু সেটা পালন করিতে হইবে কি দেশের ছেলেদেরই গলায় ফাঁসের টান মারিয়া? মানুষ নিজের ইচ্ছামত নিজের শ্রেয়ের পথে চলিতে পাইবে না? দাসখত আর কাহার নাম?—না, অসমঞ্জের প্রতি ক্ষমা করিবার তার পক্ষে কিছুই নাই। অপ্রকৃতিস্থমতি অদূরদর্শী লঘুচিত্ত একটা বালক মাত্র সে,—এতবড় একটা দায়িত্বের ভার নিজের অপরিণত বুদ্ধির মিথ্যা গৌরবে অন্ধ হইয়া কিসের সাহসে সে গ্রহণ করিল? বৈচিত্র্যময় মানব চিত্তের কুটিল রহস্যলেখা পাঠ

করিতে কতটুকু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় তার আছে, যার নিজের চিত্তবল একান্তই অপরীক্ষিত? না—এই দাম্ভিক, তরলমতি, স্বার্থপর অসমঞ্জ কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য নয়!

বিমল এতক্ষণে যেন তাব অসীম চিন্তাসমুদ্রের কূল খুঁজিযা পাইল। অসমঞ্জের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস পাইলেও তাহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের উপদ্রবে এ কয়দিন তার অন্তরে অন্তরে নিযতই একটা তুমুল ঝটিকা বহিযা চলিযাছিল। তার কঠোর চিত্তের কর্ত্তব্যজ্ঞান পর্য্যন্ত সে বন্যায ভাসাইয়া লইযাছে, কিন্তু আজ সহসা তাহাকে বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া তার অপরাধের পরিমাণ মাপকাটিকে ছাপাইয়া গেল। তার অবিমৃষ্যকারিতা, তার হঠকারিতা, তার মানসিক দৌর্ব্বল্য তার মানবচরিত্রানভিজ্ঞতার অন্ধকার যেন তার পূর্ব্বেকার সমস্ত ঔজ্জ্বল্যকে আবরণ করিয়া দাঁড়াইল।

তখন বিমলেন্দু সবিস্ময়ে দেখিল,—সেই বুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, ত্যাগে মহীয়ান, গৌরবে সমুজ্জ্বল যে বীরচেতা অসমঞ্জকে পাইয়া সে নিজেকে একদা ধন্য বোধ করিয়াছিল, নিজের সর্ব্বস্ব,—বোধ কবি, ভূত ভবিষ্যতের ইহ পর সর্ব্বকালের, সকল লোকের সমস্তই তাব পাদপ্রান্তে সঁপিযা দিযা নিজের জন্ম মবণকে সফল মনে করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই, সে তাব সত্য রূপ নয়!—নাট্যশালার নট যেমন আসল মূর্ত্তিকে চাপা দিযা কৃত্রিম ভূষায় নিজেকে ভূষিত করে,—ভিখারীও সম্রাটের সাজ পরে, এ'ও তা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। আসলে অতি দৈন্যগ্রস্ত ভিক্ষুকই সে,—রাজা সে আদৌ নয!—মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা অকথ্য ঘৃণায় বিমলেন্দুর সমস্ত শরীর মন যেন গুটাইয়া এতটুকু হইয়া আসিল। শুধু দীনই নয়,—হীনতারও তার শেষ নাই। এই ছদ্মবেশী সাধু, এই ময়ূবপুচ্ছ-শোভিত দাঁড়কাক,—এই নীলবর্ণের শৃগাল—ইহাকেই সে এত দিন শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ ইহাবই নিকটে চিরদিনের জন্য সমর্পণ করিয়াছে, এজন্য তার সারা অন্তর ভরিয়াই ধিক্কার উঠিয়া আসিল।

যে পাষণ্ড এতবড় মিথ্যার ছলনায় ভুলাইয়া এতগুলা জীবন লইয়া সামান্ত ক্রীড়নকেরই মত স্বচ্ছন্দে ছেলেখেলা খেলিতে পারে, আবার সেগুলাকে ভাঙা খেলনার মত অনায়াসে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্রীড়ান্তরে ব্যাপৃত হইতেও যার বাধে না, তাহার 'পরে কিসের মায়া? মমতার যোগ্যপাত্র কি সে? ঐ কঠিন প্রতিজ্ঞা তার কাছে হয় ত আজ একটা খেয়াল মাত্র,—কিন্তু বিমলেন্দুর পক্ষে যে তা' অচ্ছেদ্য নাগপাশ। সবাই তো অসমঞ্জ রায় নয়!—না,—বিমলেন্দুর মনে ক্ষমা নাই! সে কবে কাহাকে ক্ষমা করিয়াছে? নিজের বাবাকে, দিদিমাকে, বিমাতাকে, অমৃত মামাকে—তার প্রতি অবিচারকারী কাহাকেও নয়। অসমঞ্জকেও করিবে না।

আর ক্ষমাই বা সে করিবে কেমন করিয়া? বিমল ক্ষমা করিলে অসমঞ্জকে দণ্ড দিতে যে দু'জন সমধিক উৎসুক,—তাহারা তাহাকে ছাড়িবে কেন? সরযূপ্রসাদের অসমঞ্জের প্রতি বিদ্বেষের বিশেষ কারণ আছে। সরযূর পিতা মধ্যবিত্ত লোক, কিন্তু খুব বড় ঘরাণা। পুত্রের বিবাহ কোন এক অপুত্রক রাজার কন্যার সহিত স্থির করিয়াছিলেন, ফলে সে বার্ষিক সত্তর হাজার টাকার মালিক হইত। বিবাহের জন্য অসমঞ্জর সম্মতি চাহিলে, সে মত দেয় নাই, এবং ফলে, রাজজামাতা তো নয়ই,—উপরন্তু বাপের ত্যাজ্যপুত্র হইয়া সরযূকে এযাবৎ অসমঞ্জরই গলগ্রহ হইতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম সেটাকে মহৎ ত্যাগের মুখে মহীয়ান করিয়া আর পাঁচজনের সঙ্গে সে নিজেও নিজেকে খুব বড় চোখে দেখিয়াছিল, কিন্তু আজকাল লোকের মুখের জয়ধ্বনি যতই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, নিজের নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধির ধিক্কারের সহিত অসমঞ্জের প্রতি বিরক্তি ও বিদ্বেষ ততই পুঞ্জীভূত হইতেছে। দুটি বছর না যাইতেই সেই অসমঞ্জ নিজেই বিবাহ করিয়া বসিল!

রাধিকার ক্রোধ, বিমলের প্রতি—অসমঞ্জর পক্ষপাত লইয়া, সেটা ততদূর মারাত্মকও নয়, তবে কথা এই অসমঞ্জ তাদের যে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবার

প্রতিশ্রুতি দিয়া দলে ভিড়াইয়াছিল, তার পরিবর্ত্তে একটা বড় কিছুই ত করিতে পারিল না? না একটা সাহেব খুন, একখান ট্রেনকে ডিরেল করা, একটা বড় রকম ডাকাতি, কিছুই না।

কিন্তু অসমঞ্জকে না বাঁচাইলে তার রক্ত বঞ্চিত হইয়া উৎপলার কাছে সে আর কোন্ মুখে মুখ দেখাইবে? তবে কি তাদের মধ্যে এই শেষ? উৎপলার সহিত আজ হইতে সকল সম্বন্ধই কি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আর কি এ জীবনে সে তাহাকে দেখিবে না? এত আকস্মিক, এমন অপ্রত্যাশিত রূপে প্রাপ্ত এই করতলায়ত্ত রত্ন—সত্যই কি তাহাকে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া চির অন্ধকার জীবনকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে? অথচ—অথচ সে অনায়াসেই এই সংসারে দুর্ল্লভা, আবার জাতি-ধর্ম্ম-সমাজ সর্ব্ব বিষয়েই তার একান্ত অনুকূল বিধায় পাওয়ার পক্ষে অত্যন্তই সুলভা উৎপলাকে পাইয়া চির জীবনের মতই ধন্য হইতে পারে।—কেন তবে তা' হইবে না? যাক্ তবে ভাঙ্গিয়াই যাক এই সঞ্জীবনী সভা!—দূরে যে সরিয়া যাইতে চায়, যাক্ সে,—বিমলও তার চিরদিনের ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনসংগ্রামে দীর্ঘচ্ছেদ ফেলিয়া নবজীবনে একটুখানি স্বস্তি যদি কুড়াইয়া পায়, কেন তা' সে ছাড়িয়া দিবে? এ জগতে কিই বা পাইয়াছে সে? উৎপলা শিক্ষিতা, শক্তিময়ী, রূপ তার প্রচুর নাই থাক,—নারীবেশে আজ তাহাকে কিছুই তো অশোভন বোধ হয় নাই? সেই জলভরা চোখ, সে কি কখনও ভোলা যায়? তাহাকে ছাড়িবার চিন্তায় জীবন যে একান্তই অবলম্বনহীন মনে হইতেছে!

বিমলেন্দু নিজের মনকে গড়িয়া পিটিয়া লইয়া—যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ ভাবে ঘরে ঢুকিল। অসমঞ্জ নির্ব্বিঘ্নে তার নববধূর সহিত মধু-বাসর সমাধা করুক, উৎপলা তার আদরের ছোড়দার জীবনমূল্যে নিশ্চয়ই বিমলেন্দুর নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে নিজেকে বাঁধিয়া দিবে। কেনই বা বিমলেন্দু এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিবে? কেনই বা সে নারীর প্রেম, সন্তানের পিতৃত্ব হইতে নিজেকে

এই স্নেহ প্রেম বুভুক্ষিত চির শুষ্ক চির বুভুক্ষিত হৃদয়টাকে চিরবঞ্চিত করিয়া রাখিবে? যা জগতের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তিও লাভ করিতে সমর্থ,—সেটুকুও সে পাইবে না,—এতবড়ই কি অপদার্থ সে? এই তো দেশসেবা!—দেশের জন্য একচিত্ত দম্পতির মিলনই দেশকে মুখ্য দান। অসমঞ্জ সেদিন যে বলিতেছিল, সেও তো মিথ্যা নয়! অসমঞ্জর একটা কথা মানিবে তো আর একটাই বা মানিবে না কেন?

ঘরে ঢুকিয়া প্রজ্বলিত আলোর সম্মুখে ক্ষিপ্রহস্তে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল।—লিখিল,—"উৎপলা! ভাবিয়া দেখিলাম, অসমঞ্জকে বাঁচাইবার চেষ্টা করাই আমার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপর না বুঝিয়া যে পথে আমরা চলিতেছি, এ পথে দেশের মুক্তি নাই।—এসো এখনও পথ পরিবর্ত্তন করি। আমার পাশে দাঁড়াইয়া অর্জ্জুন-সারথি ভদ্রার মত আমার রথের ঘোড়া তুমি চালাইবে কি? যদি ভরসা দাও, তবেই পথান্তরে দেশের সেবা আরম্ভ করি। নহিলে অজানা পথে আনাড়ি আমি, হয় ত আবার পথ হারাইব। মঞ্জুর জন্য ভাবিও না,—আমি তার সহায় থাকিলে যে কোন উপায়ে তাকে বাঁচাইব।"

বিমলেন্দুর কলম থামিয়া গেল।—অ্যাঁ,—এ' কি করিতেছে সে?—এ কি—করিতেছে?—এ'—কি করিতেছে? ন্যায়ের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাতিয়া নিজের অন্তর্যামীকে শুদ্ধ ফাঁকির মূল্য শোধ করিয়া সেও না কি নারী-প্রেমের কাঙ্গাল হইয়া উঠিল? দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজের স্বার্থ সুখকেই প্রাধান্য দিতে বসিয়া গেল? কোথায় তার চরিত্র-বল? কোথায় দৃঢ়তা? তবে কি সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাই অসমঞ্জ রায়?—নারী-মুখের এককণা মিষ্ট হাসিই কি তবে দেশ, প্রতিজ্ঞা, ন্যায়, নিষ্ঠা—স্বর্গের, মর্ত্ত্যের, সব কিছুর চাইতেই বড়?—না, না,—সবাই এ সংসারে অসমঞ্জ নয়, বাঙ্গালীর আদর্শ অত ছোট নয়! চরিত্রবলের এদেশে কিছুমাত্রও অভাব ঘটে নাই। কি তুচ্ছ নারীপ্রেমের মোহবিকার?—কিসের স্বার্থ,—কি তার ক্ষুদ্র

সুখ—? বিমলেন্দু একটা সুবিধাবাদী অপদার্থ নয়!

আর উৎপলা? সেই বা কি? চিরগর্ব্বিতা, পুরুষপ্রকৃতি, উদ্ধতস্বভাবী নারী,—কোথায় তার মনে ভালবাসা? স্বার্থ, স্বার্থ,—শুধুই স্বার্থ! যখন সে মৃত্যুদণ্ডে নিজ নামের স্বাক্ষর দিয়াছিল,—তখন দণ্ডিতকে পর মনে করিয়াই তা দিয়াছিল? কই তার জন্য তো তার নারীচিত্ত কাঁদিয়া উঠে নাই?—উঃ! এত বড় স্বার্থপর সে!—আর তার এই ঘৃণ্যতম প্রেমলীলা।—এ'ও যে তার কতবড় ছলনা, এই বা কে' বলিবে? অসমঞ্জকে বাঁচাইবার জন্য বিমলেন্দুকে ফাঁদে ফেলিবার কৌশল যে এই ছলা কলা নয়, তারই বা প্রমাণ কি?—নাঃ,—তা'ও কি সম্ভব—কিন্তু এমনই বা অসম্ভব কি?—এক রাত্রের মধ্যে অতবড় বিপদের সংবাদে সহসা চির-শুষ্ক চিত্তে যে তার এই আকস্মিক প্রেমের প্লাবন দেখা দিল, এ কি বিশ্বাস করার যোগ্য?—কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সে—কি?

নিজের স্বার্থের জন্য এত বড় ঘৃণিত পথও যাহার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব, তাদেরই খোলস-চাপা মহত্ত্বে বিমলেন্দু নিজেকে এত দিন প্রতারিত করিয়া রাখিয়াছিল? বঞ্চনা সে আজন্ম সবার কাছেই লাভ করিয়াছে, এবং তার কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়া আসিতেও সে কোন দিন ছাড়ে নাই,—আজই বা ছাড়িয়া দিবে কেন? না,—তার মনে দয়া নাই, মায়া নাই—কিছু নাই—কিছু নাই।—সে দেশের কাছে ঘোর অপরাধে অপরাধী অসমঞ্জকে, আর তার কাছে মিথ্যাচারিনী অপরাধিনী উৎপলাকে—কাহাকেও ক্ষমা করিতে পারে না,—পারিবে না।—

উদ্দাম গতিতে চালিত 'এঞ্জিনের' গতি অকস্মাৎ রোধ করিতে হইলে পরিচালককে যেমন প্রাণপণে 'ব্রেক' কষিতে হয়, তেমনি করিয়া বিমলেন্দু নিজের যৌবন-বাসনার উন্মত্ত আবেগকে কর্ত্তব্যের কঠিন বাঁধ দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলিয়া রাখিয়া, সেই নির্ঝর-ঝরা নদীর স্রোতের মত প্রেমানন্দে পরিপ্লুত প্রথম প্রণয়লিপি শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

চিরনিরানন্দ. ক্রন্দনশীল প্রাণটা তার সে কাজ করিতে যতই মরণ কান্না কাঁদিয়া উঠুক সে কান্না তার সে কানে তুলিবে না, শুনিবে না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁদ অস্ত গিযাছে, পাথরেব মত কঠিন কালো আকাশে ছোট-বড় তারাগুলা যেন কা'দেব অদ্ভুত রোষ কটাক্ষেব মতই জ্বলন্ত হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। গঙ্গাব দুধাবেব গাছপালা ঝোপঝাড সমস্তই শুদ্ধ কালো,—এর কোথাও একটা আলোর ছিদ্র পর্য্যন্ত নাই, সবটাই একটা ছেদশূন্য বিরাট অন্ধকাবেব প্রাচীর আর সে অন্ধকাবটাও কেমন একটা গভীর রহস্যে পরিপূর্ণ। ঐ অন্ধকাব দিগন্তে বিলীন তমসাবৃত নদীতীব, ঐ সংখ্যাহীন গগনবিহারী জ্যোতির্মণ্ডলী, এই প্রখর ঝিল্লীরব-বিমন্দ্রিত শুদ্ধ নিশীথিনী, এরা সকলে মিলিয়াই যেন কি একটা অভাবনীয কাণ্ডেব জন্য সভয় প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা কবিতেছে। এদেবই ঐ একাগ্রতা উৎকণ্ঠায় সারা বিশ্বেরই যেন আজ শ্বাসরোধ হইয়া গিয়াছে। উহারই ভীতি শিহবণ শব্দহীন নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে অতি মৃদু-রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইয়া আছে; তাহারই সাগ্রহ উন্মুখতায় জলের ধারে নদীতীরের বাঁশঝাড়ে পর্য্যন্ত এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। নদীতরঙ্গ পর্য্যন্ত যেন ভয়ে মূর্চ্ছিত।

নক্ষত্রের স্বল্পালোকে মধ্য নদীবক্ষ দিয়া একখানিমাত্র ছোট নৌকা চলিতে-ছিল। আরোহী তিনজন যুবকের মধ্যে একজন হাল ধরিয়াছে, দুজনের হাতে দাঁড়। দাঁড়ের উত্থান পতন প্রায় নিঃশব্দেই চলিতেছে, আর নৌকার তলায়

প্রহত সলিলের অতি-অস্ফুট বিলাপ মর্ম্মরটুকু মাত্র একজন আরোহীরই মর্ম্মের তারে ঘা দিয়া একটা মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার অসহ-রাগিণী নিঃশব্দেই বাজিতেছিল,—অপর দুজনের সেদিকে লক্ষ্যমাত্র নাই।

তিনজনেই নিস্তব্ধ, কথাবার্ত্তা এদের ভিতর কদাচিৎ এবং স্বল্পাক্ষরযুক্ত। বহুক্ষণ নীরবে কাটার পর একজন একবার চাপাসুরে কথা কহিয়া বলিল,—"তিনটেই তোমার কাছে না,—বিমল?"

যে হাল ধরিয়াছিল সে শুধু উচ্চারণ করিল, "হুঁ"—তারপর আবার তার সঙ্গীদের মধ্য হইতে তাহাকে কি যে একটা প্রশ্ন করা হইয়াছিল, সেটা সে নিজের চিন্তাস্রোতে ভাসিয়া গিয়া শুনিতে পাইল না।

বিমলের জীবনটা জটিলতার পাকে পাকে জড়াইয়া গিয়াছে। পাক খুলিতে সে চেষ্টা করিয়াও পারে নাই। জোট পাকান জীবনগ্রন্থিটাকে সরল করা তার পক্ষে সহজ হইল না। তার জীবন-বীণা কোনদিনই ঠিক সুরে বাজে নাই—আর যে কখনও বাজিবে, সে কথা মনে করিবার আজ আর কোথাও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! উপরন্তু—এই কালরাত্রির অবসানের পর বাঁচিয়া থাকাটাই তার পক্ষে হয়ত একান্ত দুর্ব্বিষহ হইয়াই উঠিবে, এমন আশঙ্কাই তার সারা চিত্ত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। মনের মধ্যে বিরাট-মূর্ত্তি আদর্শটাকে খুব উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তাহারই তলার একটি কোণে নিজেকে সে একেবারে গুটিসুটি পাকাইয়া ফেলিয়া ধরিল, কিন্তু তার সেই অন্ধকারের কোণের মধ্য হইতেই সে যে তীব্র ও তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিপ্লব ঘোষণা করিয়া আত্মপ্রচার করিতে ছাড়িল না! রোষে ক্ষোভে স্বার্থত্যাগের বেড়া-আগুন অন্তরের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া সে যখন তার ক্রন্দনশীল চিত্তটাকে পোড়াইয়া মারার ব্যবস্থায় সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে,—সে সময় কোথা হইতে—এ আবার কি?—এ' কি অভাবনীয় কাণ্ড? নিখিল অশ্রুসাগরের কূল বুঝি আজ ধ্বসিয়া পড়ে,—বরুণবাণে অগ্নিবাণ কাটার মত সকল আগুন উহারই প্লাবনে বুঝি বা ভাসিয়া যায়!

নদীর একটা বাঁক ঘুরিয়া নৌকাখানা আবার স্রোতের মুখে মুখে ভাসিয়া তেমনি নিঃশব্দেই চলিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমলেন্দুর চিন্তাস্রোতও নির্ব্বাধে বহিতে লাগিল। নিজের আগাগোড়া সমস্ত জীবনটা পটে আঁকা একখানা বিচিত্র ছবির মতই তার মানসচক্ষে আজ কেনই যে আবার নূতন করিয়া এমন সুস্পষ্ট-রূপে ভাসিয়া উঠিল কে' বলিবে?

তার জীবন,—বিধাতার সে যেন এক বিচিত্র সৃষ্টি! এমন অনাবশ্যক, এমন সর্ব্ববঞ্চিত, এমন কণ্টক-কণ্টকিত জীবন,—এ গড়িয়া পাঠাইবার সৃষ্টিকর্ত্তার কি যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সে কথা বুঝা দায়! আগাগোড়াই এ যেন একটা কূলহারা তরঙ্গ, তারছেঁড়া তানপুরা,—অকূলেই এর গতি,—বেসুরা-ই এর বাজনা। এ' কি সৃষ্টিছাড়া হইয়া তার জন্ম! বিমলেন্দুর মনে পড়িল নিজের শৈশবের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ। সে দিনের সকলটুকু স্মৃতির হাওয়ায় ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে, তার দিদিমায়ের কথা! কলহ-বিদ্যার লীলা-কলায় একান্তরূপেই পটিয়সী মাতামহীর ভীষণ কবলে অসহায়ভাবে নিপতিত নিজের শৈশব-বাল্যস্মৃতির নিরানন্দতায় এবং তার অর্দ্ধ-পরিচিত পিতার নির্লিপ্ত পরিচয়ে মন অভিমানের বিদ্বেষে আজও তার ভরিয়া উঠে। আজ আবার সেই চিরাভ্যস্ত রীতিতে সুপ্ত-বেদনাকে জাগাইয়া তুলিতে গিয়া কে' জানে কেন পিতাকে মনে পড়িতেই অনেক দিনের অব্যবহারে বিস্মৃত তাঁর শেষ কথা কয়টিও অকস্মাৎ তার মনে পড়িয়া গেল,—

"তারাকে আমি তোমায় দিয়ে গেলুম!—"

মধ্যে অকস্মাৎ যেন একটা মুগুরের ঘা খাইয়াছে,—এমনি করিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল। কই,—এ কথা যে বহুদিনই সে ভুলিয়া গিয়াছিল! সেই যে মৃত্যুশয্যার শেষ দান সে তার মুমূর্ষু জনকের হাত হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সে কি তার কোন,—কোন মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়াছে? কিছু না,—কিছু না!—বহুদিন হইতেই সে যে তাঁহাকে নিতান্ত অপরিচিত পরের চেয়েও

অনেকখানি দূরে সরাইয়া দিযাছে, তার এতটুকু খবর বার্ত্তাটিও লয নাই।—সে কি খায়, কি পবে, তার চলে কিসে,—এসব কথা কখনও সে ভাবিয়া দেখে নাই। দিদিমার মৃত্যুশয্যায় কত দিন পরে সেই অতর্কিত সাক্ষাৎ,—তা'তেও কি সে তার মুখের পানে একবার ভাল করিয়া তাকাইযা দেখিতেই সময় পাইয়াছিল? আব—আর সেই শেষ সংবাদ!—যে দিন সে নালিশ করিবাব কথা বলিযা ইন্দ্রাণীকে অপমানের সঙ্গে বিদায় কবিযা দেয,—সে কথা মনে কব্লিয়া আজ এতদিন পরে বিমলের বুকের মধ্যে কেমন যেন করিয়া উঠিল। যাঁকে সেদিন সে তেমন নির্ম্মম হইয়া কঠিন বাক্যেব আঘাতে দূর কবিয়া দিয়াছে, চিবদিনই অম্নি কবিযা অবিচাবেব তপ্তশেল যাঁর বুকে বিদ্ধ কবিতে এতটুকু মাত্র অনুতাপ বোধ কোনদিনই করে নাই,—সেই মানুষটি, সেই নিবভিমানিনী অথচ তেজোময়ী মনস্বিনী—যার জন্য সেদিন তাব কাছে ভিখাবিণীর বেশে আসিযা দাঁড়াইযাছিলেন, সেই বোনটি ছাড়া এজগতে আর কোথাও হইতে সে এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা লাভ করিতে পারিয়াছে কি?—বিমলের চিন্তাসূত্রে কিসেব এক্টা প্রচণ্ড টান পড়িল। সত্যিই কি তাই? ঐ তারা ভিন্ন আর কি কেহ, আর কি কখন তাহাকে সত্য কবিযা ভালবাসে নাই?—পিতা, তাঁব কথা ছাড়িয়া দাও,—যতই সে মনে করুক তাব বাপেব মনে সন্তানস্নেহ ছিল না, এমন কি ঘটিতে পাবে? তার দিদিমাই তাকে তাঁর কাছ ঘেঁষিতে দেন নাই, এ'কি সে দেখে নাই? দিদিমা অবশ্য তার যত ক্ষতিই করুক, সে সবই যে তাঁহাকে অত্যধিক ভালবাসিয়া,—তাহাতেও কি সন্দেহ আছে? শেষ দিনেও যে অনেক দুঃখ সহিয়াও তাহারই নাম লইয়া তিনি মরিয়াছেন। দিদিমাব মৃত্যুশয্যায় যাহা হয় নাই—আজ বিমলেন্দুর চোখে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া একবিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিতে চাহিল।

তারপর আবার সে তার সেই পুরাতন চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া গেল।—ভূমন্ত মামাও যে নিরবচ্ছিন্ন মন্দ লোকই ছিল,—সেকথাও বলা চলে না। উদ্দেশ্য

তার যাই থাক, মোটের উপর তার কাছেও বিমল ঋণী বই কি!—কিন্তু সে ঋণ সে তো ভাল করিয়াই শোধ করিয়া দিয়াছে!—অনারোগ্যকর একখানা গুপ্ত ক্ষতের মুখ অকস্মাৎ এই দুষ্ট-স্মৃতিতে টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

তারপর স্মরণ হইলে ইন্দ্রাণীর কথা।—একটা গভীর শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক সে ক্ষণকাল মুদিত নেত্রে সেই নির্ব্বাক বেদনাভরা অবিরত স্নেহ-সেবাপরায়ণা মাতৃ-মূর্ত্তি যেন মনশ্চক্ষে দর্শন করিতে লাগিল। সমুদয় মনটা যেন তার একটা অনাবশ্যক অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। বিস্ময়ে চিত্ত পূর্ণ হইয়া গেল। কেমন করিয়া সেই করুণাময়ী স্নেহময়ী মাকে সে অতবড় অবহেলার চক্ষে দেখিতে পারিয়াছিল, এ কথা মনে করিয়া সে আজ এতদিন পরে যেন আশ্চর্য্য বোধ করিল। সঙ্গেসঙ্গেই আরও একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত মনে পড়িল এর সবটুকু দায়িত্ব তার দিদিমার। যদি তাঁর বাহুগ্রাসে সে না পড়িত, তার মা যদি অকালে না মরিত,—অথবা তার পিতা যদি উঁহাকে তাঁর বাড়ীতে না রাখিতেন, তবে,—হয়ত তা'হলে বিমলেন্দুর জীবন-ইতিহাসের ধারাও ভিন্নমুখী হইয়া,—হয়ত বা খুবই সহজ, খুবই সরল হওয়াও এমন কিছুই বিচিত্র ছিল না। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?—অদৃষ্ট? না আর কিছু?—আর কেহ?—

তারপর আরও যাদের অজস্র অফুরন্ত স্মৃতির প্লাবন তার বিমথিত বক্ষের উপর বন্যার বেগে আছড়া পাছাড়ি করিতেছিল, সে দিকে যেন আজ চোখ ফিরাইতেও তার ভরসা ছিল না। মনের সমুদয় রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসমঞ্জের সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত আশ্চর্য্য দৃষ্টি,—আর উৎপলার সেই অর্দ্ধস্ফুট অভিব্যক্তি,—সেই মিনতির বেদনায় অতি করুণ, অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী আকুলতা,—সেইটুকুই যে চিত্তাকাশে অসহনীয় জ্বালায় জ্বলন্ত হইয়া আছে, সে যে অন্তরের সকল স্মৃতির সুধা সমস্ত গরল মন্থন করিয়া তুলিতেছে! হায়! কিসের অভাবে বিমলেন্দু চিরদিন এমন বুভুক্ষা কাতর ভিখারীর মত কাটাইল? এত যদি তার সঞ্চয়ই ছিল, তবে তার স্নেহের ভাণ্ডার এতদিন খালি পড়িয়া ছিল কেমন

করিয়া ? সে কি এমনই অন্ধ ? এত পাইয়াও আজ এত বড় নিঃসম্বল ! অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিতেও কি দুঃখে সব ছাড়িয়া সব কাড়িয়া সন্ন্যাসীর মত পথের 'পরে আসন বিছাইয়াছে ? ওরে ও অভাগা ! এত বড় সৃষ্টির মধ্যে তোর মত মূঢ় বুঝি দুটি নাই। কিসের দুঃখে তুই এমন করিয়া বিবাগী হইলি বল্ দেখি ?—শুধু ছায়ার পিছনে ছুটিয়া সত্যের পানে একবারও কি চোখ ফিরাইলি না ?

যে সব অমূল্য ভালবাসার ধনকে অবহেলা করিয়া মহাপাপে পাপী হইয়াছিল অবশিষ্ট কাল ধরিয়া প্রেমহীন, স্নেহহীন বন্ধুত্ববিহীন, নিরানন্দ, নিরালোক জীবন বহন করিয়া ইহারই প্রায়শ্চিত্ত কর্। এইটুকুই তো তোব জন্য এ পৃথিবীতে এখন বাকি রহিল। তুচ্ছ করিয়া যা' ঠেলিয়া ফেলিয়াছিস,—সে তো জন্মের মতই তোর হাতের নাগাল হইতে সরিয়া গিয়াছে। চোখের জলের বন্যা বহাইলেও আর সে সব হারানিধি কোন দিনই খুঁজিয়া পাইবি না ! তার সারা মনটা আগুন ধরানো চিতার মতই ব্যর্থ-ক্ষোভে জ্বলিতে লাগিল, ধু ধু ধু, —ধু ধু ধু, —

আকাশ স্তব্ধ, রাত্রি নীরব, বাতাস নিদ্রিত, শুধু তাহারই মধ্যে এই কয়টি নিশাচরবৃত্ত বিনিদ্র প্রাণী হিংস্র পশুর মতই সতর্ক গতিতে নিজেদের ভীষণ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য ধরিযা চারিধারের পুঞ্জপুঞ্জ অন্ধকারের কঠিন বাধা ঠেলিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছিল। বিমলের অশান্ত অপ্রকৃতিস্থ চিত্ত যতই স্রোতের বিপরীতে ভাসিয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে ততই সে নিজেব চিত্তে উৎসাহের তীব্র-দহন জ্বালাইয়া তাহাকে কঠোর কর্ম্ম-সমুদ্রে ঠেলিয়া পাঠাইতে চাহিল। অন্তরের বিষম ভারটাকে অশুচি বস্তুর মতই ঝাঁটাইয়া দিয়া উহার স্থলে উদ্যমের, আনন্দের, ন্যায়নিষ্ঠার গৌরবকে, আসন পাতিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে লড়িতে লাগিল, কিন্তু হায় রে ! যত কিছু শুচি-শুদ্ধ, সুপবিত্র আয়োজন, সে সবই যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনাভারে আচ্ছন্ন, মূর্চ্ছাতুরের মত হৃদয়প্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, আর সারা অন্তরটাই আর্ত্তনাদ করিয়া

বলিতেছে,—এর পর তোর জন্য আর কিছুই কোথাও বাকি থাকিল না!—অন্তরের সেই ছিন্ন তন্ত্রীতে বিদ্যুতের ঝঙ্কনায় বজ্র-কঠিন নূতন সুর চড়াইতে চেষ্টা করিয়া সে মনে মনে বলিল,—"না-ই থাক্, যে পথে চলেছি তারই সাধনায় বাকি দিন যথেষ্ট কাটাতে পারবো। এতদিন ভাল করে চেষ্টা করতে সুযোগ পাইনি, এবার এই রিক্ত মনপ্রাণ ঐতেই ঢেলে দেব,—এর চেয়ে আর বড় পাওয়া কে' পায়,—কোন্ কাজ এ কাজের কাছে বড়?"

না,—বড় নিশ্চয় নয়!—কিন্তু তবু মানুষ যে,—মানুষই, সে যে সামান্য,—সে অসামান্য হইতে চাহিলেই কি হইতে পারে?

নিকটস্থ তীরভূমির অল্পদূরে জোনাকি জ্বলার মতই দু'একটা ক্ষীণ দীপ-রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে সরযূপ্রসাদ কহিল,—"এইখানেই নৌকা বাঁধতে হবে, গ্রাম এখান থেকে বড় জোর মাইলটাক।"

ঝপ্‌ঝপ্ করিয়া দাঁড়ের শব্দ একটিবার মাত্র শোনা গেল, হালের মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল।—বিমল যখন তীরে উঠিল, সবার চেয়ে দৃঢ় ও অচঞ্চল পদেই সে উঠিয়া আসিল। তার কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে অর্জ্জুনের মতই সে জয় করিয়া লইয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সারা গ্রাম নিস্তব্ধ। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহরের অন্তর্বর্ত্তী। গ্রাম্যপথ বিজন। শুধু পথের কুকুরগুলা আগন্তুকদিগকে একটিবারের জন্য অনুযোগপূর্ণ, অভ্যর্থনার উপক্রম করিতেই সরযূপ্রসাদ পকেট হইতে কিছু খাবারের টুকরা

বাহির করিয়া তাদের বণ্টন করিয়া দিলে বিশিষ্ট ভদ্রলোক বোধে উহারা এদের পথ ছাড়িয়া দিয়া ভোজের সভায় অধিক লাভের চেষ্টায় মন সংযোগ করিল। জনহীন পল্লী-পথ,—পথের ধারে মধ্যে মধ্যে নিবিড় অন্ধকারে স্বল্প বাতাসে বাঁশের ঝাড় বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাসের মতই শ্বসিয়া উঠিল, দুধারে অধিকাংশই খোলার ঘর, কোথাও একখানা ভগ্ন বা অর্দ্ধ-ভগ্ন, কচ্চিৎ একখানা সুসংস্কৃত অনতিবৃহৎ পাকাবাড়ী দেশবাসীর ধনহীনতার পরিচয় দিতেছিল। অন্ধকার,—চারিদিকেই নিবিড় অন্ধকার! গাছের গায়ে গায়ে, ডোবার ধারে ধারে, বাড়ীগুলার আশে পাশে, আনাচে-কানাচে, সর্ব্বত্রই আজ যেন অন্ধকারেরই হোলী খেলা, তাহারই পরিপূর্ণ আধিপত্য। কদাচিৎ কোথাও একখানা ঘুমন্ত পুরীর একটা খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটুখানি ক্ষীণ প্রদীপের আলো বাহিরে আসিয়া যেন সেই প্রকাণ্ড অন্ধকার-জমান কৃষ্ণসর্পের বিরাট বপুকে ঈষৎ খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। সদ্য ঘুমভাঙ্গা কচি ছেলের তীক্ষ্ণ রোদনস্বর আচমকা সেই গভীর স্তব্ধতার তাল ভঙ্গ করিয়া নির্ভীক পথিকদের কর্ণে যেন সতর্ক প্রহরার মতই কোন্ অদৃশ্য প্রহরীর সুরে মৃদু সংশয়ে বাজিয়া উঠিল।

পথের ধারে একটা একতালা বাড়ীতে রাত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে গানের আখড়া বসে, এখন সব চুপচাপ।—কেবলমাত্র গায়কদলের একটি বিনিদ্র লোক, সামনের দালানে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া শুইয়া মৃদু গুঞ্জনে কীর্ত্তন গানের একটা মাথুর পদ গাহিয়া গাহিয়া উঠিতেছিল,—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর, দিনেক দুয়ের মত,
যদি মন লাগেতো থাকবে সেথায় নৈলে আস্‌বে দ্রুত।"

পথিক কয়জন কিছুদূর অতিক্রমের পর অন্ধকারে আবৃত একটা বেশ বড় বাড়ীর পিছনে আসিয়া পৌঁছিল; সেখানকার গাঢ়তর অন্ধকার যেন যুগলবাহু বিস্তৃত করিয়া প্রতিপদেই তাদের গমনপথে বাধা দিতে লাগিল; কিন্তু সেই সুহৃদ্ বাক্য কানে না তুলিয়াই এদিক ওদিক চাহিয়া দ্বার ও প্রাচীর পরীক্ষান্তে

সরযূপ্রসাদ বিমলেন্দুর কানে কানে কহিল, "এই বাড়ী"—

বিমল মৃদু-সন্দেহে তেমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ী কা'র ?"

"তা' তো জানি না। অসমঞ্জর পিছনে পিছনে এসে বাড়ীটাই শুধু দেখে গেছি। নাম নিয়ে আমাদের কি-ই বা হবে ?"

"ঠিক এই বাড়ীই তো ?"

"নিশ্চয় ! দু-দুবার দেখে গেছি, দোরে পাঁচটা পাঁচটা করে লোহার গুল বসান আছে। এই যে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ,—গুণে দেখ না।"

অন্ধকারে হাতড়াইয়া চিহ্নগুলা বিমল পরীক্ষা করিয়া দেখিল। পরে অর্দ্ধ-অবিশ্বাসে পুনঃ প্রশ্ন করিল, "কিন্তু এই বাড়ীতেই যে সে বিয়ে করেছে, কেমন করে তুমি জানলে ?"

সরযূপ্রসাদ ঈষৎ বিরক্তির সহিত উত্তরে কহিল, "আমি জানি। এই বাড়ীর কর্ত্তা একজন বুড়ো কবিরাজ, সব্বাই তাকে সেন মশাই বলে ডাকে,—অনেক দিনের রোগী ছিলেন, বিয়ের পরদিনের ভোরেই তিনি মারা গেছেন। সেই জন্যেই অসমঞ্জ তার বউকে নিয়ে এখনও পালাতে পারেনি। চতুর্থী শ্রাদ্ধ শেষে আজরাত্রে তাদের ফুলশয্যা, কাল সকালেই তারা বেরিয়ে পড়বে, এ সব খবর আমি ভাল করেই নিয়েছি। আর এ'ও জানি যে, এই সমস্ত বড় ভাঙ্গা বাড়ীটার দক্ষিণচকের সামনের ঘরে সে রাত্রে শোয়,—আর কি কি তুমি জানতে চাও ?"

বিমল আর কিছু জানিতে চাহিল না। স্ক্রু খুলিবার যন্ত্র দিয়া রাধিকা ক্ষিপ্র হস্তে ততক্ষণে দরজার কব্জাগুলা খুলিয়া ঢুকিবার পথ তৈরি করিয়া দিয়াছিল। সরযূপ্রসাদকে সেই খানে রাখিয়া তাহারা দুজনে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং পূর্ব্ব পরামর্শমত রাধিকাকে সিঁড়ির পথে রাখিয়া বিমল একা উপরে উঠিয়া গেল। লটারীতে তারই নাম উঠিয়াছিল।

দক্ষিণদ্বারী ঘরের সামনে ভাঙ্গাচোরা রেলিং-ঘেরা বারান্দায় পা দিতেই

বিমলেন্দুর পা টলিয়া গেল। ক্ষণকাল সে প্রাচীরে পিঠ দিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। একবার ঘন স্পন্দিত দুই নেত্র ঊর্দ্ধে তুলিয়া মৌন গম্ভীর কঠিন আকাশের অবিচলতা দেখিয়া লইল। কোনও অদৃশ্য ন্যায়-বিচারকেব অকম্পিত কণ্ঠ-নিঃসৃত অলঙ্ঘ্য বিচার-ফল জলন্ত অঙ্গারেব অক্ষরে আকাশের বিবাট পটে কঠোর ভাষায় লিখিত রহিয়াছে, না, কি ওসব? কি গম্ভীব, কি কঠিন, ওই অনুশাসনেব বাণী,—আর কি অসম্ভবই তাহা হইতে চোখ ফিরাইয়া লওয়া! বিমলের বক্ষের মধ্যে খর প্রবাহিত শোণিতস্রোতে আবাব যেন চকিতে ভঁাটাব স্পর্শ লাগিল। পদতল হইতে কেশাগ্র অবধি স্তব্ধ অসাড় হইয়া গেল। তারপর, বেশ একটু পবে, কোনমতে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষের দ্বাবে আসিযা অন্তরের সকল দ্বিধা, সকল সঙ্কোচ, জোর কবিয়া কাটাইয়া যথাসাধ্য স্থির কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল,—"অসমঞ্জ!"

নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে সে কঠোর হইয়া উঠিল। মনকে তীব্র শাসনে শাসিত করিয়া বলিল, "এখন আব তো পিছাইবার পথ নেই। যে কর্ত্তব্যের ভার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছ, সে তোমার পক্ষে যত বড়ই অসহ্য হোক, তোমায় বইতেই হবে।"

রুদ্ধদ্বার সেই ঘরের ভিতর পালঙ্ক-শয্যায় নিযম রক্ষা হিসাবে মাত্র দু'গাছা ফুলের মালা ও নব বস্ত্রে সজ্জিত নব দম্পতি তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। বাড়ীতে শুভ পরিণয়ের পাশাপাশি মৃত্যুব করাল ছায়া দেখা দিয়া আনন্দের ক্ষীণ শিখা ক্ষাতিটিই নির্ব্বাপিত করিযা দিযাছে, তথাপি বহুদিনের প্রতীক্ষিত মৃত্যুর বেদনা এই নব-সম্বন্ধে-সম্বদ্ধ সহৃদয় বন্ধুর স্নেহ সান্ত্বনায় এতটুকু সহনীয়ও যে হইতে পারিয়াছে, বিধাতার এও নিতান্ত অবজ্ঞার দান নয়, নহিলে তারা তার এত বড় ক্ষতি সহিত কি করিয়া? দাদু ছাড়া এ জগতে তার বন্ধু সাথী সুহৃদ কে' আছে?

ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নের আবেশের মত সুপরিচিত কণ্ঠে সে আহ্বান অসমঞ্জের

কর্ণ কুহরে যেন রণক্ষেত্রের কামান গর্জ্জনেব শব্দেই গর্জ্জিয়া উঠিল,—"অসমঞ্জ!"

চমকিয়া উঠিয়া বসিতেও তো সেই ধ্বনি! এ কি?—আবারও যে সেই আহ্বান পুনরুচ্চাবিত হইল,—"অসমঞ্জ!"

অসমঞ্জ ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিল। তারপব নিজেব পার্শ্বে সে তার চকিত দৃষ্টি ফিবাইল, সুপ্তিমগ্না নব বধূর শ্বাস প্রশ্বাসেব গতি সমতালেই বহিতেছে। মুখেব অর্দ্ধাবগুণ্ঠন তার সবিয়া গিযাছে; দীপালোকে তাহাকে নিদ্রাপুরীব কোন ঘুমন্ত রাজকন্যার মতই দেখাইতেছিল। সেই অদ্ভুত সুন্দর মুখখানা একবার সে পরিতৃপ্ত নেত্রে দর্শন করিয়া, তার চন্দ্রার্দ্ধবৎ সুগঠিত ও তেমনি বর্ণ জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় ললাটে অত্যন্ত সন্তর্পণে ও পরম স্নেহে একটা মৃদু চুম্বন করিযা নিঃশব্দ সতর্ক পদে অতিশয় সতর্কতার সহিত ধীরে ধীবে উঠিযা আসিয়া সাবধানে রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিল। পাছে সে উঠিয়া পড়ে, তাই বড় ভয়ে ভয়েই আবার সে তেমনই করিয়াই তার পিছনে দ্বার রুদ্ধ কবিয়া আসিল।

ঘরের বাহিরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। মনুষ্যের আকৃতি নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে অতি অস্পষ্ট দেখা যায, মুখ চেনা যায় না। দ্বার চাপিয়া দাঁড়াইযা সম্মুখস্থ সেই অন্ধকাবাবৃত জমাট আঁধার হইতে স্বল্প-দৃষ্ট মূর্ত্তিটাকে লক্ষ্য করিয়া অসমঞ্জ নির্ভীক প্রশ্ন করিল, "কে' তুমি? বিমল কি?"—

উত্তর পাইল—"হ্যাঁ।"

অসমঞ্জ একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিল,—"তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে?—না একা?"

বিমল কহিল—"আছে।"

অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল—"সরযূপ্রসাদ আর রাধিকা বোধ হয়?"

বিমল উত্তর করিল—"হুঁ।"

"ওঃ"—বলিয়া অসমঞ্জ দ্বারের সান্নিধ্য ছাড়িয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া গেল ;—"একেবারেই কি তৈরি হয়ে এসেছ তোমরা ? না কিছু বলবার আছে ?"

বিমল তাহার নির্ভীক ও সপ্রতিভ প্রশ্নে একটু বিপন্ন বোধ করিতেছিল। অপরাধীকে অপরাধীর মত দেখিবার আশা সকলেই করে এবং সেইরূপ ঘটিলেই কর্ত্তব্য পালনের পক্ষেও যেন অনেকখানি সুবিধা পাওয়া যায়, সেইজন্য অসমঞ্জর এই সাধুর মত নির্ব্বিকার ব্যবহার তার চক্ষে উহার প্রচ্ছন্ন ছলনা বলিয়াই ঠেকিল এবং ইহাতে সে ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়াই কহিল, "কেন যে আমাদের এ অসময়ে এতদূরে আসতে হয়েছে তা' কি তুমি বুঝতে পারো নি ?"

অসমঞ্জ এ তিরস্কারে ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত তো হইলই না, উপরন্তু তার সেই কল-ঝঙ্কারী হাসি হাসিয়াই তখনই এ প্রশ্নের উত্তর দিল,—"বিলক্ষণ। বুঝতে না পারবার কি আছে ? তবে জানতে চাইছি আমার মারবার জন্যে সমিতি থেকে যে পরোয়ানা বার হয়েছে,—সেটা সই করলে কে' ? অথবা সভাপতি হিসাবে সেটা আমাকেই সই করতে হবে ? কাছে সেই লণ্ঠনটা আছে ত ? দাও—তাহলে নয় সইটা আমি করেই দিই। কারণ সব কাজই দস্তুর-মত হওয়া উচিত।" বলিয়া আবার সে সেইরূপ মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

টর্চ্চের আলোয় দণ্ডনামায় উৎপলার স্বাক্ষর চোখে পড়িতেই অসমঞ্জর ঠোঁটের হাসি মুহূর্ত্তের জন্য মিলাইয়া গিয়া তার সমস্ত মুখটা মরা মুখের মত এক নিমেষের মধ্যে ধবধবে সাদা হইয়া গেল। সে আলোর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই অক্ষর কয়টা দুবার তিনবার করিয়া মনে মনে পড়িয়া গেল ও তারপর মুখ তুলিয়া একটুখানি বেগের সহিত কহিয়া উঠিল, "ঠিক আছে ! কিন্তু কোথায় সেটা হবে ?"

বিমল তাব মুখেব উপবকার সহসা বিস্তৃত গাম্ভীর্য্যটাকে মৃত্যুভয় ভুল করিযা সংশযেব মধ্যে দোলাইযা রাখা অনুচিত ভাবিযা ঈষৎ সহানুভূতির সহিত কহিল,—"এইখানেই—?"

"ক্ষতি নেই।—তবে তোমবা পালাতে পারবে তো? যদি শব্দ শুনে লোক জমে যায়? অবশ্য বাড়ীতে বা পাড়াযও জমা হ'বাব মত লোক বেশী নেই, কিন্তু পিস্তলটাব আওয়াজ তো নেহাৎ কম হবে না, বলাও তো যায না। তাব চেযে চল ববং নদীব ধাবে বা—"

"আমবা এখানে অপবিচিত, আমাদেব চিনবে কে? হাতে অস্ত্র থাকতে কাছে এগোতেও কেউ ভবসা কববে না,—অনাযাসেই পালাতে পাববো, নৌকো সঙ্গেই আছে।"

"তবে আর একটু দূবে এসো, এখনি আমাব স্ত্রী হযতো জেগে উঠবে।—উৎপলাকে বলো, তাব ছোড়দা তাব নিজেব হাতে দেওযা দণ্ড সানন্দে মাথা পেতে নিযেছে।—কিন্তু শোন বিমল! আজ আমাব যাবার সময় আমি তোমাদেব অনুনয় কবে বলে যাচ্চি, আজ থেকে তোমাদের সবাকাবই আমার দেওযা শপথ থেকে চিবদিনের মত মুক্তি দিযে গেলুম। মনে পড়ে বিমু! প্রথম যেদিন তুমি আমায তোমার নিজেব সর্ব্বস্ব দিতে চেযেছিলে? আমিই তা' ভুল কবে দেশেব অনিষ্টেব পথে লাগিযেছিলুম। সেতো তুমি তখন স্বপ্নেও জানতে না ভাই!—সেই পাপেরই আজ এই প্রাযশ্চিত্ত আমি আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করছি। আজ যাবাব দিনে আমাব দত্ত বস্তুকে বিপথ থেকে টেনে এনে সোজা রাস্তায পৌঁছে দিযে যাচ্চি, তোমবা দত্তাপহাবী হয়ো না! তোমবা সেদিন দেশকে ভালবাসোনি, ভাল বেসেছিলে আমাকে। সেই ভালবাসার দাবী দিযে যাবাব সময় তোমাদের সকলের কাছেই আমি আমার ভুলের জন্যে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা চেয়ে যাচ্চি। দেশের অজ্ঞতা দূর করবার ব্রত য, পতিত ও অর্দ্ধ-পতিত জাতিকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দিয়ে উন্নত

করতে সচেষ্ট হও। অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করবার ব্রত গ্রহণ করো। নিরস্ত্র জাতির মুক্তির ও পথ নয়। অহিংস অসহযোগই এ জাতির যোগ্য পথ। উৎপলাকে বলো, তাকে আমি তোমায় দিয়ে গেলুম। আমি জানি সে তোমায় ভালবাসে, একথা হয়ত সে নিজেও জানে না।"

"অসমঞ্জ! অসমঞ্জ! আমায় তুমি ও ভার দিযে যেও না। উৎপলাব সঙ্গে এজন্মে আমাব—আব কখনও দেখা না হওযাবই সম্ভাবনা।"

নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত অসমঞ্জ স্বল্পালোকে বিমলের বিষাদ-কালিমা-লিপ্ত শোক-গম্ভীব মুখেব দিকে চাহিল, "এ কথা কেন বিমল?"

"কেন? তাব এই হাতের সই দেখছো, এব পর যখন জানতে পারলে এ কা'র জন্যে,—তখনও কি তুমি আশা কবো মঞ্জু?—সে এতক্ষণ বেঁচে আছে কি নেই—তাই বা কে' জানে!

গুরুভারগ্রস্ত বক্ষ শিথিল করিয়া একটা দীর্ঘতব শ্বাস অতি ধীরে বাহির হইযা বহিয়া গেল। অসমঞ্জ ক্ষণকাল কথা কহিল না। তার পর সহসা মুখ তুলিযা বিমলের স্তব্ধ গম্ভীর মুখেব উপর দৃষ্টি বাখিযা কহিল, "যদিই বেঁচে থাকে,—বলো, আমি তাকে তোমাব হাতে দিযে গেছি।"

"অসমঞ্জ! এ কি বলচো তুমি?—না, না, আমাব যে এই পথ,—যত দিন আমি বাঁচবো, তুমি জানো না কি আমার এখান থেকে ফেরবার কোন উপায় নেই? এখন আব তার দবকারও হবে না। আমরণ এই বেঁচে থাকার শাস্তি আমায় মাথায করে বইতেই হবে। তোমার রক্ত যে আমাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য মহাসাগর হয়ে বইতে থাকবে, সে কথা তুমি হয ত ভুলে যাচ্চো, আমি ভুলবো কেমন করে? আর সেও তো তা ভুলতে পারবে না।"

"কই তোমার পিস্তল?"

বিমলেন্দু পকেট হইতে একটা দোনলা-ক্ষুদ্রাকার রিভলবার বাহির করিল। তার পর সেটা নীচু করিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাষ্প-সজল তরলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"সরযূপ্রসাদকেই বলি, না হয় তো রাধিকা—"

অসমঞ্জ মৃদু হাস্যে ঘাড় নাড়িয়া কহিল "উঁহুঁ, তারা নয়,—এখন শুধু তুমি আর আমি,—ভয় কি ভাই! প্রস্তুত?—"

"হুঁ" বলিয়া অস্বাভাবিক পাংশুমুখে বিমল দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিতে গেল,—"তোমার মাকে যদি কিছু বলতে চাও—"

একটা দ্রুত চঞ্চল পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই চুড়ি-বালা-চাবির চঞ্চলতর সিঞ্জন শ্রুত হইল। বিমল হাত ঠিক করিয়া লইতে না লইতেই তাদের মাঝখানে খসিয়া-পড়া তারার মত বিস্রস্ত-বসনা এক তন্বী তরুণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে অসমঞ্জকে জড়াইয়া ধরিল।—এতটুকু শব্দ তার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অসমঞ্জ তাহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত বারেক স্পর্শ করিয়াই তার দৃঢ়বদ্ধ বাহুপাশ হইতে নিজেকে ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টার সহিত সুগভীর স্নেহভরে কহিতে লাগিল,—"উঠে পড়লে! তুমি তো সব জেনেশুনেই আমার হয়েছিলে? একদিন যে এদিন তোমার আসতোই, সেও তো—তুমি জানো? তবে কেন বাধা দিচ্চো? মনে রেখ, আমার নষ্ট-ব্রত উদ্‌যাপনে তোমার সহায়তা করাই উচিত। কি জানি, হয়ত এ ভালই হচ্চে!—বিমল! আর তাহলে দেবি করো না—তারা! শেষ সময় আমায় শান্তিতে মরতে দাও, রাণি! তুমি বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মে তোমার অচলা নিষ্ঠা। তোমার জন্য ভাবি না—"

বিমলেন্দুর উর্দ্ধোত্তোলিত হস্ত তার অগোচরেই নামিয়া আসিয়া হাত হইতে রিভলবারটা সশব্দে মাটিতে পড়িল। তার সর্ব্ব শরীরে প্রবলবেগে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ ভেদ করিয়া গভীর বিস্ময়াতঙ্কে নির্গত হইল,—"বোনটি আমার!"

"দাদা!"—বলিয়া বংশীরবমুগ্ধা কুরঙ্গিনীর মত নিমেষ-মধ্যে তারা অসমঞ্জকে ছাড়িয়া বিমলেন্দুর কাছে ছুটিয়া আসিল।—

"দাদা! দাদা! তুমি?—তুমিই আমার এতবড় সর্ব্বনাশ করতে এসেছ?"—বলিতে বলিতে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া বিমলেন্দুর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

পাথরের পুতুলের মত কতক্ষণ স্তব্ধ অনড় থাকিয়া অসমঞ্জই প্রথম আত্মদমন করিল। বারেক ভূ-লুণ্ঠিতা, মূর্চ্ছাপহৃত-চেতনা তারার ভয়-পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া সে মুখ তুলিল;—"কি আশ্চর্য্য! তারা তোমার বোন? দাদুর মত মাতামহ আর তাঁর মেয়ের মত মা পেয়েও তুমি কিসের লোভে এ ভুল পথে এসেছিলে বিমল? কিন্তু সে কথা এখন থাক্,—কি করবে এখন? না যদি নেহাৎ পারো, না হয় আমাকেই ওটা দাও,—আর দেরি করা চলে না। না হয় এক কাজ করো,—এসো একটু আড়ালেই যাই।—" এই বলিয়া অসমঞ্জ যেন তার শ্যালকের হাত হইতে নব বিবাহের যৌতুক-উপহার চাহিয়া তার কাছে হাত পাতিল।

সেই অতোটুকু সময়ের মধ্যেই বিমলেন্দুর অন্তর্জগতে কত বড় যে বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, সে তার কিছুই জানে না। বর্ত্তমান ও অতীতের বহু মাস বর্ষ বর্ষের ধূলিজাল সরাইয়া তখন তার বিস্মৃত-প্রায় শৈশবের একটি মাত্র দিনের স্মৃতি,—পিতার অন্তিমশয্যা,—তার মানস নেত্রে যেন গত দিবসের মতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! সেদিনের সেই আট বছরের বিমলের হাতে চার বছরের তারার এতটুকু ছোট্ট হাতখানি তুলিয়া দিয়া মুমূর্ষু পিতার সেই সর্ব্ব শেষবাণী,—"ওকে তোমায় দিয়ে গেলুম"।—সেই কথাটাই যেন আজ সব চেয়ে স্পষ্ট সুরে বিমলেন্দুর কানে জীবনের সকল স্বরগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া ভৈরবনাদে বাজিয়া উঠিল। সেদিন সে স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে পিতার এই শেষ দানটি সাগ্রহেই তো গ্রহণ করিয়াছিল! যদি সঞ্জীবনী-সভার প্রতিজ্ঞা অখণ্ডনীয়রূপে মাথায় তুলিতে হয়, তবে তারও চেয়ে বড় প্রতিজ্ঞা,—নিজের মরা-বাপের কাছে জীবনের সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্বশেষ অঙ্গীকার সে ভঙ্গ করিবে কোন্ বিচারে?—না, না, না,—তারার বৈধব্য সে কিছুতেই ঘটাইতে পারিবে না।—ব্যাধি